অভীক সরকার

ডাইনিবুড়ি ও অন্যান্য



ডাইনিবুড়ি
ও অন্যান্য

অভীক সরকার

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

অগ্রজ সাহিত্যিক শ্রী সৈকত মুখোপাধ্যায়ের করকমলে।

কবে এবং কী ভাবে যে এই তন্ত্র সম্বন্ধীয় লেখালিখির জগতে প্রবেশ করলাম, সে আমার কাছেও রহস্যময়। বস্তুতপক্ষে কোনও একটি ওয়েবজিনের জনৈক সম্পাদিকা আমাকে দিয়ে প্রায় জোর করে 'শোধ' গল্পটি না লেখালে এই ধরনের লেখালিখির জগতে আমার আসাই হত না। কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা জগন্ময়ীর মনে কী ইচ্ছা ছিল কে জানে। আজ অবধি আমি রম্যরচনা, প্রবন্ধ, ইতিহাসাশ্রয়ী, গোয়েন্দা কাহিনী, সব ধরনের লেখাই লিখেছি। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে এদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় আমার তন্ত্র মন্ত্র সংক্রান্ত গল্প উপন্যাসগুলিই।

এই গল্পগুলি লেখার সময়েই আমি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের চরিত্রটিকে আমার গল্পে আনি। ইনি একজন ঐতিহাসিক চরিত্র, 'বৃহৎ তন্ত্রসার' গ্রন্থের প্রণেতা এবং বাংলার শাক্তসাধনার ইতিহাসে একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমি শুধু তাঁর নাম, এবং বাংলার তন্ত্রসাধনার ইতিহাসে তাঁর খ্যাতির অংশটুকু নিয়েছি। গল্প উপন্যাসের প্রয়োজনে তাঁর চরিত্রনির্মাণ একেবারেই আমার স্বকপোলকল্পিত।

আরেকটি চরিত্র আমাকে এই ধরনের গল্পের প্রয়োজনে সৃজন করতে হয়েছে। তিনি হচ্ছেন ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত সব গল্প বলিয়েরা আছেন, তারিণীখুড়ো, ঘনাদা থেকে শুরু করে বরদা অবধি। ভবতারণও তেমনই একজন গল্পবলিয়ে। তিনি ক্লাবে আসেন, ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা দেন, আর মাঝে মাঝে তাঁর ঝুলি থেকে আশ্চর্য সব গল্প শোনান।

এই তান্ত্রিক অ্যাডভেঞ্চার কাম হরর স্টোরি সংক্রান্ত লেখালিখির কারণেই আমার প্রবেশ তন্ত্র-মন্ত্র-ধর্মের ইতিহাসের জটিল এবং আকর্ষক

পরিসরে। এই বিষয়ে যত পড়েছি, তাতে আমার আগ্রহ বেড়েছে বই কমেনি। মা ভবতারিণীর কৃপা হলে দশমহাবিদ্যার প্রতিটি দেবীকে নিয়ে একটি সিরিজ লেখার আশা রাখি।

'ডাইনিবুড়ি ও অন্যান্য' বইটিতে দুটি উপন্যাস এবং দুটি গল্প রয়েছে। যে বড়গল্পটির নামে বইটির নাম, সেই 'ডাইনিবুড়ি' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল একটি বহুবিখ্যাত কিশোর পত্রিকায়। বাঁকুড়া জেলার টেরাকোটার মন্দির এবং অন্যান্য শিল্পকর্ম প্রভূত বিখ্যাত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রিয় ওখানকার জঙ্গল। সেই পটভূমিতেই ডাইনিপ্রথার কুসংস্কার এবং তার বিরুদ্ধে আদিম মাতৃস্নেহের জয়, এই হচ্ছে গল্পটির উপজীব্য।

এমনই আরেকটি গল্প 'দেওয়ানগঞ্জের রাস্তা'টা। এটিই এই বইয়ের সবচেয়ে ছোট গল্প। এখানে কোন তন্ত্রক্রিয়া নয়, প্রাধান্য পেয়েছে শুধুমাত্র ভয়ের আবহ।

'গৌরী' উপন্যাসটি লিখেছিলাম একটি কিশোর পত্রিকার জন্য। পাহাড়ি আরণ্যক পরিবেশ চিরকালই আমার মনে এক আশ্চর্য সম্ভ্রমমিশ্রিত ভালোবাসার উদ্রেক করে। মনে হয় ওই আদিম গহীন অন্ধকারের মধ্যে প্রকৃতি যেন এক অজানা রহস্য লুকিয়ে রেখেছে। তাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। সেখানেই এক নিষ্পাপ বালিকার দেহে মনে বাসা বাঁধে এক অতৃপ্ত প্রেতিনী। সেই কাহিনী নিয়েই 'গৌরী।'

শেষের উপন্যাসটির নাম 'দ্রোলমার খড়্গ।' এটি পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকেই ছাপা হচ্ছে। এমন কী এটিই আমার প্রথম উপন্যাস যেটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি বহুল প্রচারিত এবং বহু বিখ্যাত অডিও স্টোরি চ্যানেলে পঠিত হবে। আমি 'গপ্পোমীরের ঠেক', মীর আফসার আলি এবং গোধূলি শর্মার কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

'দ্রোলমার খড়্গা'র পটভূমি হচ্ছে মধ্যযুগের বাংলা। এবং এই প্রথমবারের জন্য আগমবাগীশ কোনও গল্পে তাঁর নিজের সমকালীন সময়েই উপস্থিত থাকবেন। এর আগে প্রতিটি গল্পে তিনি একজন টাইম ট্রাভেলার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। আর এই অভিযানে তাঁর সঙ্গী তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু

জাটিয়া জাদু। ইনিও ঐতিহাসিক চরিত্র, কৃষ্ণানন্দের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত শাক্তসাধক।

এই কাহিনীতে আমি একজন ডাকাতসর্দারের চরিত্রকে এঁকেছি গল্পের অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে। তন্ত্রশক্তিতে সে মহাবলী, অথচ পার্থিব কামনার বন্ধন জয় করতে পারেনি। এর সঙ্গে মিশেছে এক কন্যাস্নেহে অন্ধ পিতার অসহায়তা, ছায়াপিশাচের দল, এক মাতৃহীন শিশুর ভালোবাসার আকাঙ্খা, দুটি কিশোর প্রাণের সদ্যোস্ফূট প্রণয় আর সর্বোপরি অসমা মর্যাদাবতী মা দ্রোলমার রুদ্ররূপের অবতারণা। গল্পটি লিখে প্রভূত আনন্দ পেয়েছি বললে কম বলা হয়।

দ্রোলমার খড়্গ লেখার সময় ভগিনীসমা কোয়েল ভট্টাচার্য কিছু তথ্য দিয়ে অনেক সাহায্য করেছেন। বইটির মূল প্রচ্ছদচিত্রটি'র জন্য আমি কন্যাসমা আরাত্রিকা ঘোষের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। বইটির প্রতিটি অলঙ্করণও তারই করা। মা ভবতারিণীর কাছে কল্যাণীয়া আরাত্রিকার দীর্ঘ, নীরোগ, নিরুপদ্রব এবং সফল জীবন কামনা করি।

বইটির নামাঙ্কণ এবং প্রচ্ছদের সামগ্রিক বিন্যাস করেছেন অনুজপ্রতিম কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল। কৃষ্ণেন্দু এই নিয়ে আমার পাঁচটি বইয়ের প্রচ্ছদ প্রস্তুত করলেন। তাঁকে অশেষ ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

'ডাইনিবুড়ি ও অন্যান্য' এই সিরিজের আমার পঞ্চম বই। এর আগের চারটি বইই পাঠকের কাছে বহুল পরিমাণে সমাদৃত এবং সমালোচদের আশীর্বাদধন্য হয়েছে। আশা করি এই বইটিও আপনাদের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হবে না। মা ভবতারিণীর কাছে সবার সুস্থ ও নীরোগ জীবন প্রার্থনা করে এখানেই শেষ করছি। অলমিতি।

অভীক সরকার
২৯শে আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।
শারদ পূর্ণিমা। লক্ষ্মীপুজা।

সূ চি প ত্র

~~~
~~~

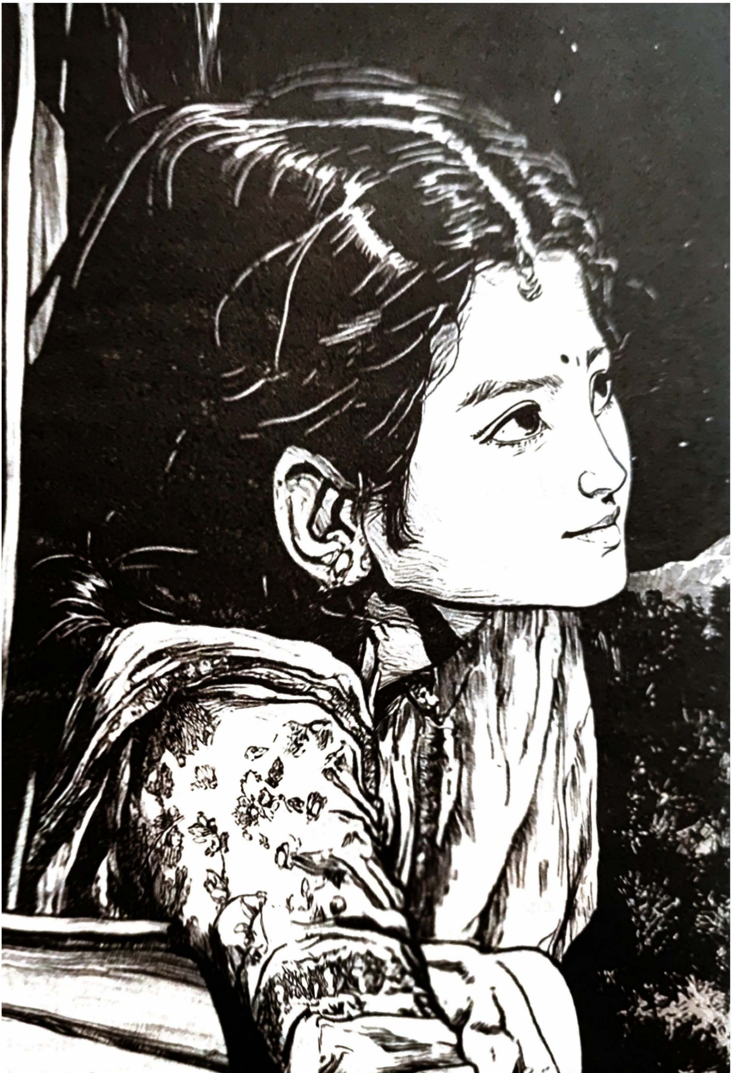
গৌরী

কে যেন জ্যোৎস্নার চাদর বিছিয়ে রেখেছিল ঘুমিয়ে থাকা গ্রামটির ওপর। একটু দুরে নগাধিরাজ হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সাগরমাতা, তার পাশে লোৎসে। ওদিকে মাকালু। উদ্ধত গম্ভীর পাহাড়চূড়াদের গা বেয়ে নেমে আসছিল রুপোরঙা আলোর স্রোত। শরতের কালচে নীল আকাশের আঁচল জুড়ে ফুটে উঠেছে তারাদের সলমা জরি। বাতাসে হেমন্তের উদাসী শৈত্য।

নেপালের এই দিকটা কাঠমান্ডু থেকে অনেক দূরে। আরও উত্তরে, হিমালয়ের কোল ঘেঁষে। শীতে সেখানে তাপমাত্রা শূন্যের নীচে নেমে যায়। চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়ের কোলে শুয়ে থাকা উপত্যকা জুড়ে পাইন, ফার, পপলার আর রডোডেনড্রনের বন। মাতাল হাওয়ার শিশুরা লুটোপুটি খায় তাদের শরীর জুড়ে।

এসব অঞ্চলে রাত আটটা মানে মাঝরাত। লোকে অনেক ভোর থাকতে ওঠে, আর সন্ধে হওয়ার মুখে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে। অবশ্য যদি খাবার জোটে, তবেই। পুরো গ্রামটার গায়েই দারিদ্র্য আর মালিন্যের ছাপ।

গ্রামের একদম শেষে একটা একতলা বাড়ি। বাড়িটা কাঠের তৈরি। এদিককার সব বাড়িই তাই। গ্রামের বুক চিরে যে রাস্তাটা এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের দিকে চলে গেছে, তার পাশেই এই ছোট্ট বাড়িটা। সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়ে বাড়ির পেছনে পাহাড়ের খাদ, আর তার ওপারে সাগরমাতার সগর্ব, সুগম্ভীর উপস্থিতি।





বাড়িটার আধখোলা জানলা থেকে অল্প আলো বেরিয়ে এসে কুয়াশায় মায়াবিভ্রম সৃষ্টি করেছে। বোঝা যাচ্ছে যে এদের রাতের খাওয়ার পালা এখনও শেষ হয়নি। খুব নীচু গলায় কথাবার্তা চলছে। কে যেন একবার খিলখিল করে হেসে উঠল। খুব মজার কথা হচ্ছে নিশ্চয়ই।

একটুপর একটি বাচ্চা মেয়ে বেরিয়ে এলো। দেখে মনে হয় বয়েস সাত-আট বছরের বেশি নয়। মেয়েটির হাতের থালায় এঁটোকাঁটার স্তূপ। দরজার কাছে একটা কুকুর শুয়েছিল। বোধহয় এরই প্রতীক্ষায়। মেয়েটিকে দেখে উঠে দাঁড়াল কুকুরটা, একবার আড়মোড়া ভাঙল, তারপর লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল মেয়েটির দিকে।

মেয়েটি থালাটা ওর মুখের সামনে ধরে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। চারিদিকে সব শুনশান। একটা বাড়িতেও আলো জ্বলছে না, ওদের বাড়িটা ছাড়া। একটা বোবা নিস্তব্ধতা ঘিরে আছে গোটা গ্রাম। শুধু পাহাড়ি হিমেল হাওয়ার স্রোত পাক খেয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের বুক জুড়ে।

রাত হয়ে গেল, বাবা এখনও ফিরল না। অথচ এত দেরি তো করে না বাবা। এবার বাবার সঙ্গে যে লোকগুলো এসেছে ইন্ডিয়া থেকে, ওরাই যত নষ্টের গোড়া। লোকদুটো লিম্বুকাকার বাড়িতে উঠেছে। সারাদিন কী করে কে জানে। বাবা সন্ধে হলেই ওখানে চলে যায়, আর ফেরে মাঝরাত পেরিয়ে, টলতে টলতে। একদম ভালো লাগে না ওর, একদম না। বছরে এই এক-দুবারই তো আসে বাবা। সারাদিন থাকতে পারে না ওদের সঙ্গে?

একটু পরেই একটা ছোট ট্রাক চলে যায় কাঠমান্ডু থেকে পাহাড়ের দিকে। নিশ্চয়ই কোনও পর্বতারোহীদের নিয়ে বেসক্যাম্পে যাচ্ছে। এইসব ট্রাক হামেশাই যায় এই রাস্তা ধরে। গাড়িটার হেডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় মেয়েটির।

ট্রাকটা চলে যাওয়ার পর মেয়েটি দেখল ওর ঠিক উল্টোদিকে রাস্তার ওপারে দুজন দাঁড়িয়ে। গায়ে লামাদের মতো পোশাক, কিন্তু নাক মুখ সব ঢাকা। শুধু চোখের জায়গাটা খোলা। আর মেয়েটির মনে হয় লোকদুটো যেন ওর দিকেই চেয়ে আছে।

ভয় লাগে মেয়েটির। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে সে। মা'কে কি বলবে

এই কথাটা? না থাক। ওর একটা ভাই হতে চলেছে। মা'র এখন ভয় পাওয়া বারণ। বাঙালিদাদু বলে গেছেন।

বাঙালিদাদু কবে আসবে আবার?

* * *

জঙ্গলের মধ্যে একটা কাঠের তৈরি এই দোতলা বাড়িটা কে করে কেন বানিয়েছিল কেউ জানে না। তবে দেখলেই বোঝা যায় যে বাড়িটার বয়েস অনেক। অবস্থা সঙ্গিন, সর্বাঙ্গে মস আর শ্যাওলার প্রলেপ। চিমনির চুড়ো ভেঙে পড়েছে। থাম, দরজা, জানালা, সব কিছু বেয়ে গজিয়ে উঠেছে আগাছা আর ফার্নের ঝোপ।

তবে খুব খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় সদ্য কিছু সারাই করা হয়েছে। যেমন নতুন দরজা, জানালায় নতুন কাচ। বারান্দায় ওঠবার সিঁড়িটাও নতুন। বাড়ির চৌহদ্দির চারিদিকের বেড়া ভেঙে পড়ে গেছিল। সেটাকেও সারাই করা হয়েছে।

আজ প্রবল ঝড় উঠেছে। দার্জিলিংয়ের এই পাহাড়ি এলাকায় এমন সময়ে ঝড় ওঠা খুবই অস্বাভাবিক। সারা শহর তাই দরজা জানালা বন্ধ করে ঝড় থামার অপেক্ষায় আছে। পাগল হাওয়ায় ক্ষেপে উঠেছে এই জঙ্গলের আদিম মহাদ্রুমের দল।

বাড়িটায় ঢুকেই একটা মস্তবড় হলঘর। এককালে নিশ্চয়ই সেখানে বলনাচের আসর বসত। কোনায় একটা অকেজো ভাঙা পিয়ানো তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মাথায় একটা ঝাড়বাতি ঝোলানোর আংটা। ঝাড়বাতি কে কবে খুলে নিয়ে গেছে কে জানে। ঘরের চারিদিকে প্রাচীন কিছু আসবাবপত্র। ঘুণ ধরে সবই জীর্ণ, ভগ্নপ্রায়, ঝুলের চাদরে ঢাকা। ঘরের কোনায় কোনায় কয়েকটা বাদুড় ঝুলে আছে। যেন প্রতীক্ষায় আছে এই উথালপাথাল প্রলয় শেষ হওয়ার। তার পরেই তারা ডানা মেলে উড়ে যাবে খাদ্যের সন্ধানে।

হলঘরের মাঝখানটা সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে ফাঁকা করা হয়েছে। মেঝের ওপর তেল আর সিঁদুর দিয়ে একটা বড় পঞ্চমুখী তারা আঁকা। তার মধ্যে দুটি চোখ। চোখ দুটির নীচে এবং তারার প্রতিটি শীর্ষবিন্দুতে





একটি করে অক্ষর লেখা। আর প্রতিটি তারার মাথার দিকে একটি করে প্রদীপ। প্রদীপের তেলে একটি করে রক্তজবা।

পঞ্চমুখী তারার মাথার দিকে একজন প্রৌঢ় পুরুষ বসে। বাকি চার তারার মাথায় দুইজন নারী এবং দুইজন পুরুষ বসে আছে। নারী দু'জনাকে দেখে বোঝা যায় না তাদের বয়স কত। তাদের উচ্চতা অল্প, গায়ের রং গৌর, নাক চাপা, আর সরু চোখ দুটি অল্প বোজা। দু'জন পুরুষই অত্যন্ত বলশালী। তাদের চুল ছোট করে ছাঁটা। চোখগুলি অভিব্যক্তিহীন। এই চারজনের পরনে স্থানীয় পোশাক, প্রৌঢ় মানুষটির পরনে গেরুয়া। বোঝা যায় ইনিই এদের প্রধান।

পাঁচজনেই বসে আছেন বজ্রাসনে। প্রত্যেকের কোলের কাছে মেঝেতে একটি করে করোটি রাখা, আর তার পাশে একটি হাড়ের টুকরো। প্রত্যেকের হাত একটি বিশেষ মুদ্রায় বদ্ধ।

একটু পর প্রৌঢ় মানুষটি গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'ওঁ হূং বজ্রচর্চিকায় স্বাহা।'

বাকিরা প্রতিধ্বনি করলেন।

এরপর প্রৌঢ় গম্ভীরস্বরে মন্ত্র আবৃত্তি করতে থাকলেন। তার ভাষাও অজানা, সুরও কেমন যেন ভয় ধরায় বুকের মধ্যে। বাকিরাও যোগ দিলেন। কারও সুরে বিন্দুমাত্র চ্যুতি হল না। সমান স্বরে, সমাল লয়ে, সমান তালে গাওয়া সেই সেই অজানা, অবশ করা সুর ভেসে বেড়াতে লাগলো ঘরটার মধ্যে।

এদিকে ঝড়ের প্রকোপ আরও বেড়ে উঠেছে। বাতাসের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে বাড়িটার বন্ধ শার্সিগুলো। মনে হচ্ছে হাওয়ায় যেন মাতন লেগেছে। ক্রুদ্ধ মহাসর্পের দল লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে চারিদিক।

খানিক পর সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হল। প্রৌঢ় লোকটি প্রসন্নস্বরে বললেন,

'আজকের মহাসুখচক্র সুসম্পন্ন হয়েছে। মা বজ্রচর্চিকা আমাদের সহায়। সৃষ্টির যে অমৃতমূলাধার এতদিন মানবজাতির কাছ হতে লুকিয়ে

রাখা হয়েছে তার উদ্ধার করব আমরা। আর একটি মাত্র সাধন বাকি। তাহলেই আমরা হব অজর, অমর, মহামৃত্যুঞ্জয়ী।'

'কী সেই সাধন গুরু বজ্রসত্ত্ব?' প্রশ্ন করে একজন।

একটু সময় নেন গুরু বজ্রসত্ত্ব। তারপর গম্ভীরস্বরে বললেন, 'গৌরীদান।'

* * *

অর্জুন ড্রাইভ করছিল মুম্বাই থেকে পুনে। সাড়ে তিনঘণ্টার রাস্তা। আর সে রাস্তা এমনই মসৃণ যে মনে হয় চলন্ত গাড়িতে বসে চেকে সই করা যাবে। তাছাড়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বুক চিরে তৈরি হওয়া এই রাস্তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যও তুলনাহীন। বিশেষ করে রাস্তাটা যখন লোনাভালা-খান্ডালা অঞ্চল পার করে, সেই দৃশ্যের তুলনা নেই। এই যেমন এখন। কয়েক দিন আগেই বর্ষা শেষ হয়েছে, শরৎ আসবে আসবে করছে। এই সময় পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে ছোট্ট ছোট্ট ঝরনার দল। যেন একদল চঞ্চল বালিকা নেমে আসছে নূপুর পায়ে। আর কালচে সবুজ পাহাড়ের বুক চিরে মাথা দোলা দেয় নাম না-জানা কত না রঙিন ফুলের দল। পিছনে উপত্যকার বুক জুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে কাশফুলের মতো সাদা মেঘের স্তূপ। সেই অপার্থিব সৌন্দর্য দেখলে মোহিত হয় না এমন মানুষ কমই আছে।

দিনের বেলা এই রাস্তা দিয়ে এলে দেখা যায় পথের ধারে কত মানুষ দাঁড়িয়ে এই অমল সৌন্দর্যের স্বাদ নিচ্ছে। বেশিরভাগই ক্যামেরা নিয়ে আসে। প্রেমিক-প্রেমিকা আসে, আসেন প্রৌঢ় দম্পতি। শিশুদের সঙ্গে নিয়ে আসেন নবীন কপোত-কপোতীরা। রাশভারী কর্পোরেট কর্তা থেকে সফল ব্যবসায়ী, স্ট্রাগলিং অভিনেতা থেকে উঠতি রাজনীতিবিদ, এখানে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেননি এমন মানুষ বিরল।

এখন অবশ্য রাত। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। এও ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার। রাত হোক বা দিন, সচরাচর এই রাস্তায় গাড়ির ভীড় লেগেই থাকে। এই খাঁ খাঁ করা মুম্বাই-পুনে হাইওয়ে তাই অর্জুনের কাছে অস্বাভাবিক লাগার কথা ছিল। কিন্তু সেদিকে অর্জুনের মনই ছিল না।



কারণ আজ, এই মুহূর্তে অর্জুন সেনগুপ্ত'র মনটা বিতৃষ্ণা, হতাশা আর বিরক্তিতে ভরে আছে একেবারে।

অর্জুন একজন ডকুমেন্টারি ফিল্ম পরিচালক। ফিল্মি দুনিয়ায় যে কজন উঠতি প্রতিভাবান ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকারের নাম উচ্চারিত হয়, অর্জুনের নাম তার মধ্যে একদম প্রথম সারিতে।

অর্জুনের বিশেষত্ব হচ্ছে সমাজের অসঙ্গতি এবং অন্ধকার দিক নিয়ে ডকুমেন্টারি বানানো। যেমন দিল্লির রাজনীতি আর অন্ধকার জগতের আঁতাত, মুম্বাইয়ের কামাথিপুরার অসহায়তা, বস্তারের আদিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা, এসব নিয়েই বিভিন্ন ডকু ফিল্ম বানায় সে। তার ডকু ফিল্ম দেশ-বিদেশে উচ্চপ্রশংসিত। বিভিন্ন বিদেশি কার্নিভালে ডাক পড়ে তার। কয়েকটি ছোটখাটো পুরস্কারও জুটেছে কপালে।

কিন্তু আপাতত সেই জনপ্রিয়তায় কিছু ভাঁটার টান দেখা যাচ্ছে। কাল তার সদ্য রিলিজ হওয়া নতুন ডকুমেন্টারি ফিল্মের প্রিমিয়ার ছিল। সেখানে কয়েকজন প্রভাবশালী ফিল্ম জার্নালিস্ট কাম ক্রিটিক-এর সঙ্গে কিছু উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে। তাঁরা অর্জুনের সাম্প্রতিক ডকুমেন্টারিগুলিকে একই বিষয়ের চর্বিতচর্বণ এবং সৃজনশীলতার নিরিখে নিম্নমানের বলে অভিযুক্ত করেছেন। অর্জুনও পালটা জবাব দিতে ছাড়েনি। দুপক্ষের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শেষ পর্যন্ত তর্কাতর্কিতে গড়ায়। ব্যাপারটা আরও বিশ্রী দিকে মোড় নেওয়ার আগেই প্রযোজক সংস্থার পি আর ম্যানেজার রঘু বাধ্য হয় প্রিমিয়ারের ইতি টানতে।

অর্জুন বুঝতে পারছিল কাজটা ঠিক হয়নি। এমনিতেই তার লাস্ট দুটো ফিল্ম মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। কাল যা হল তাতে এই সমালোচকরা রিভিউতে তাকে তুলো ধুনে দেবে। তাতে তার কেরিয়ারের কী অবস্থা দাঁড়াবে সেটা চিন্তার বিষয়। রাধিকা তাকে পই পই করে বারণ করেছিল ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে না জড়াতে। আর ঠিক সেটাই হল।

রাধিকা হচ্ছে অর্জুনের স্ত্রী। তাদের দাম্পত্যের বয়েস প্রায় দশ। সুখের সংসার তাদের। দুটি সন্তান, নূপুর আর নিখিল। নূপুর বয়সে বড়, আট। নিখিলের বয়েস ছয়। অর্জুনের সঙ্গে রাধিকা চাওলা'র আলাপ গোয়াতে,

শুটিং করতে গিয়ে। সেই আলাপ পড়ে গাঢ় হয়ে প্রণয়ের রূপ নেয়। মুম্বাই ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপিকা রাধিকা অর্জুনকে বিয়ে করতে দুবার ভাবেনি। চাকরিটা অবশ্য ছেড়ে দিয়েছে রাধিকা। এখন সে পুরোদস্তুর গৃহিণী। সময় সুযোগ পেলে সে গেস্ট লেকচারার হিসেবে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন কলেজে পড়াতে যায়।

অর্জুন ড্রাইভ করতে করতে ভাবছিল কী করবে সে। যে প্রোডাকশন হাউসের হয়ে সে ডকুমেন্টারি বানায়, তার মালিক সোফিয়া থাডানি। কালকের ঝামেলার খবরটা শুনে সোফিয়া তৎক্ষণাৎ তাকে ফোন করেছিল। এখনও অবধি সে অর্জুনের পক্ষেই আছে। কিন্তু এইভাবে চললে কতদিন থাকবে বলা মুশকিল। হাজার হোক, এটা সোফিয়ার ব্যবসা, চ্যারিটি নয়।

এখন অর্জুন যাচ্ছে সোফিয়ার ফার্মহাউসে। ফার্মহাউসটা পুনের একটু বাইরের দিকে। প্রায় বাইশ একর জমির ওপর ছড়ানো বাগানবাড়ি। প্রতি ডকুমেন্টারি বা সিনেমা রিলিজ হওয়ার পর সোফিয়া এখানে ক্রু মেম্বারদের জন্য পার্টির আয়োজন করে। রাতভর হইচই আর হুল্লোড়ে সময়টা বেশ কাটে। তবে আজ অর্জুন সেই পার্টি কতটা এনজয় করতে পারবে সে নিয়ে সন্দেহ আছে।

লোনাভালা পৌঁছনোর আগে অল্প ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হল। এই জায়গাটা সমতলের থেকে বেশ উঁচুতে। মেঘেদের দল নেমে এসেছে রাস্তার ওপর। বৃষ্টির মধ্যেই অর্জুনের গাড়ি টানেলে ঢুকে গেল।

টানেল পেরোবার একটু পর অর্জুন দেখল একজন মাঝবয়েসী লোক রাস্তার পাশে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে লিফট চাইছে। রেইন কোট তো দূরে থাক, লোকটার সঙ্গে একটা ছাতা অবধি নেই। অর্জুন চট করে এইভাবে কাউকে লিফট দেয় না। দিনকাল ভালো না, চুরি-ডাকাতির সম্ভাবনা তো আছেই। কিন্তু আজ যেন কী মনে হল তার। লোকটার পাশে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল। কাচ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেয়া হুয়া?'

লোকটা ভাঙাচোরা হিন্দিতে জানাল, বাসে করে লোনাভালা যাচ্ছিল। মাঝখানে ভুল করে নেমে পড়েছে। একটু সামনে পৌঁছে দিলে খুব উপকার হয়।

অর্জুন ইঙ্গিতে লোকটাকে উঠে পড়তে বলল। হিন্দি শুনে বোঝা যাচ্ছে যে ভদ্রলোক বাঙালি। মধ্যবয়স্ক বাঙালি লোক লোনাভালার রাস্তায় হাত দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে ডাকাতি করবে, এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে একগাল হেসে বলল, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনি না এলে যে কী হত। এই অসময়ে ভিজলে শরীর খারাপ হওয়া আটকায় কে।'

লোকটার হিন্দি উচ্চারণ শুনে আবার মজা পেল অর্জুন। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'বাঙালি বলে মনে হচ্ছে।'

লোকটা খানিক অবাক হয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, 'আপনিও বাঙালি? যাক, বাঁচা গেল। হিন্দি বলে বলে গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল মশাই। আপনার নাম জানতে পারি?'

'অর্জুন সেনগুপ্ত। পেশায় ফিল্ম মেকার। আমি কিন্তু কলকাতার বাঙালি নই, মুম্বাইয়ের।'

'আহা, সে হোক। বাঙালি তো। আপনার জন্মকর্ম সব কি এখানেই?'

'তা বলতে পারেন। বাবা আর্মিতে চাকরি করতেন। তাই সারা দেশ ঘুরতে হয়েছে। তবে বেশিটাই এই মহারাষ্ট্র সাইডে। আমার জন্ম এখানে, থাকিও এখানেই। তা আপনার হিন্দি শুনে তো মনে হচ্ছে খাঁটি কলকাতার লোক।'

লোকটি স্মিত হাসেন, 'ঠিকই ধরেছেন। তবে ঠিক কলকাতা না, আরও একটু পুবে, নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট।'

'আচ্ছা। তা এখানে কি কাজকর্মের সূত্রে?'

'একরকম তাইই বলতে পারেন। আমার পেশা হচ্ছে অধ্যাপনা। সেই সূত্রেই আসা।'

'আপনি প্রফেসর? ইন্টারেস্টিং। তা কোন সাবজেক্ট পড়ান আপনি?'

'আমার সাবজেক্ট হচ্ছে ইন্ডোলজি। আরও বিশেষ করে বলতে গেলে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও দর্শন।'

চমৎকৃত হল অর্জুন, 'আরে বাহ। কোন ইউনিভার্সিটি?'

'বহুদিন নেপাল রাজ কলেজে পড়িয়েছি। আপাতত শরীরে আর দিচ্ছে

না বলে চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরেছি। ভাবছি কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার কাজে জয়েন করব কোথাও।'

বলতে বলতেই ভদ্রলোক বললেন, 'আমি এখানেই নামব অর্জুনবাবু। অনেক অনেক ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামার আগে একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। হ্যান্ডশেক করার পর কিছুক্ষণ অর্জুনের হাত ধরে রইলেন। তারপর একটা অদ্ভুত কথা বললেন, 'যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের জাগাবেন না সাহেব। আমাদের চেনা পৃথিবীর বাইরে অন্য একটা পৃথিবী আছে, সেই অচেনা পৃথিবী নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে। তাকে বিরক্ত করবেন না।'

অর্জুন অবাক হল। বলল, 'হঠাৎ এই কথা?'

লোকটা খানিকক্ষণ অর্জুনের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আমি সর্বনাশের রং দেখতে পাই মিস্টার সেনগুপ্ত। আপনার মুখে তার ছায়া পড়ছে। আপনি সতর্ক থাকুন, সাবধান থাকুন। আর যদি তেমন কিছু হয়, আর মা মঙ্গলময়ী যদি চান তো আমি আপনার কাছে পৌঁছে যাব। ততদিন ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন' বলে লোকটা দরজা বন্ধ করে অন্ধকার রাস্তার মোড়ে মিলিয়ে গেল।

অর্জুন একটু ধন্দে পড়ে গেল। কী বলে গেল লোকটা? পাগল ছাগল তো মনে হয় না। কথাবার্তা দিব্যি শিক্ষিত লোকেদের মতো। তাহলে ওই শেষের কথাগুলোর মানে কী?

ধুত, মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল অর্জুন। যত্তসব উটকো আপদ। গেছে, বাঁচা গেছে।

গাড়ি চালানো শুরু করার পর অর্জুন খেয়াল করল লোকটার নামই জানা হয়নি তার।

* * *

পার্টিতে এসে লোকজনের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা আড্ডার মধ্যে অর্জুনের মন খারাপটা একটু একটু করে কেটে যেতে লাগল। সোফিয়া তো ওকে ডেকে নিয়ে আলাদা করে বলেই দিল, 'ওই মাথামোটা রিভিউয়ারগুলো

কী বলল সে নিয়ে মাথা ঘামিও না সেনগুপ্তা। ওদের কিনাতে আমার ট্যাঁকের থেকে অল্প কিছুই খসবে। তুমি বরং তোমার পরের প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ শুরু করে দাও।'

সোফিয়া থাডানি এক কথার মানুষ। তিন রাউন্ড ড্রিঙ্কসের পর সবাইকে আগের প্রোজেক্টের পারিশ্রমিকের চেক হ্যান্ডওভার করল। তারপর ফের অর্জুনকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এবার নতুন কিছু করা যাক অর্জুন।'

'যেমন?' ভদকার গ্লাসে সতর্ক চুমুক মারতে মারতে জিজ্ঞাসা করল অর্জুন।

লং আইল্যান্ড টী'র গ্লাস হাতে অনেক্ষণ চুপ রইল সোফিয়া। ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছে সে। তারপর বলল, 'সাউথ ইস্ট এশিয়ায় যে পেগান বা প্রাকৃত ধর্ম সম্পর্কিত রিচুয়ালস আছে সেই নিয়ে একটা কাজ করো। আজকাল লোকজন অকাল্ট, তান্ত্রা, এসব উইয়্যার্ড, ক্রিপি, ঈরী বিষয় নিয়ে খুব ইন্টারেস্ট নিচ্ছে। আশা করি এই প্রোজেক্টটা লোকে খাবে।'

অর্জুন কথাটা ভাবতে থাকে। আজকাল এইসব নিয়ে চর্চার একটা ঝোঁক বেড়েছে বটে। করলে মন্দ হয় না।

'কবে চাই কাজটা?'

'আমি চাইছি ইমিডিয়েটলি শুরু করতে।'

'কিন্তু পরের সপ্তাহে আমাদের ছুটি কাটাতে গোয়া যাওয়ার প্ল্যান আছে সোফিয়া।'

'প্ল্যান চেঞ্জ করো অর্জুন। তুমিও জানো যে তোমার লাস্ট কয়েকটা ডকুমেন্টারি তেমন সাফল্য পায়নি। এ চান্সটা মিস করা তোমার উচিত হবে না।'

অর্জুন বুঝতে পারে সোফিয়া তাকে একটা শেষ সুযোগ দিচ্ছে। হয়তো তার কেরিয়ারের শেষ সুযোগ। একজন ডুবন্ত উদ্বিগ্ন মানুষের আর কী লাগে?

'আয় আয় ক্যাপ্টেন। ইওর উইশ ইজ মাই কমান্ড' বলে ছদ্মবিনয়ের

ভঙ্গিতে বাও করে সে। সোফিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'কত নাটকই যে জানো বস।'

তারপর বলল, 'আই নিউ ইট অর্জুন। তোমার সিনসিয়ারিটি নিয়ে আমার মনে কোনওদিনই কোনও সন্দেহ ছিল না। কাল থেকেই কাজ শুরু করে দাও।'

বলতে বলতেই অর্জুনের হাতে অগ্রিম হিসেবে একটা চেক আর একটা ফাইল গুঁজে দেয় সোফিয়া, 'এখানে তোমার প্রয়োজন হবে এমন সব ডেটা দেওয়া আছে। তুমি তো জানো আমার একটা রিসার্চ টিম আছে। আমি এই বিষয় নিয়ে অনেক দিন ধরেই খোঁজখবর করছি। এমনি এমনি এই প্রোজেক্টটা তোমার ঘাড়ে চাপাইনি অর্জুন। আই অ্যাম ড্যাম সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট।'

অর্জুন মাথা নীচু করে ফাইলগুলো ঘাঁটছিল। প্রতি পাতাতেই নোটস আর ডায়াগ্রাম। রিসার্চ যে বা যিনি করেছেন তাঁর পরিশ্রমের ছোঁয়া পাওয়া যায় প্রতি পাতায়।

ফাইলটা বন্ধ করে অর্জুন, 'এক্সেলেন্ট সোফিয়া। অর্ধেক কাজ তো এগিয়েই রেখেছ দেখছি। আমাদের পরের পদক্ষেপ কী?'

সোফিয়া তার আইফোনটা বার করে বলে, 'একটা নাম্বার দিচ্ছি, সেভ করে রাখো। আসল কাজ দিন দুয়েক বাদ থেকেই শুরু হবে। যিনি এই রিসার্চটা করেছেন তিনি একজন অকাল্ট বিশেষজ্ঞ। আমার টিম খুঁজে বের করেছে এঁকে। এই বিষয়ে ভদ্রলোকের প্রভূত পড়াশোনা আছে। আমরা কথা বলে রেখেছি। তুমিও কথা বলে নিও। বেস্ট অফ লাক।'

অর্জুন নাম্বারটা সেভ করে মোবাইলটা পকেটে রাখল। এখন বেশ ভারমুক্ত লাগে তার। এবার দেখিয়ে দেবে সে, অর্জুন সেনগুপ্ত কী জিনিস।

* * *

হঠাৎ করেই শুরু হয়েছে প্রবল বৃষ্টি। মেঘে ঢেকে গেছে শরতের আকাশ। এই অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে জঙ্গল দেখে মনে হয় যেন আদিম কোনও অরণ্য উঠে এসেছে দার্জিলিংয়ের বুকে। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে

আছে বিষণ্ন মহাদ্রুমদল। তাদের কালচে গুঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে জলের ধারা মনে হচ্ছে যেন কোনও এক প্রাগৈতিহাসিক মহাসমুদ্র থেকে উঠে আসা অতিকায় মহাসর্পের গা বেয়ে নেমে আসছে প্রাচীন লবণাক্ত স্রোত।

এই অন্ধকার অরণ্যে, প্রবল বর্ষায় ভিজতে থাকা বাড়িটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন এক বৃদ্ধা বসে আছে মহা সর্বনাশের অভিশাপ মাথায় নিয়ে। তার শার্সির মধ্যে থেকে ক্ষীণ একটা আলো কাঁপতে কাঁপতে এসে পড়ছিল প্রবল বারিধারায় ধুয়ে যাওয়া বারান্দায়।

ঘরের ভেতর থমথম করছে ভয়। থেকে থেকে বিপুল বজ্রপাতের শব্দ আর আলোর ঝলকানি ছিটকে পড়ছে ঘরের মধ্যে। তারপরেই ঘরের কোণে গুটিশুটি মেরে বসে থাকা আলোয় মেশানো অন্ধকার আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘরের মধ্যে।

হলঘরের ঠিক মধ্যিখানে একটি সিংহাসনের মতো আসন। সেখানে বসে আছেন একজন মানুষ। তাঁর সারা শরীর, এমনকি মুখও ঢাকা। শুধু চোখটুকু খোলা। তীক্ষ্ণ, খর সেই চোখ দেখলে ভয় করে, এমনই তার তীব্রতা। আর সিংহাসন ঘিরে আরও পাঁচজন লোক।

তার সামনে একজন মেঝেতে হাতজোড় করে বসে আছে। তার বসার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে যে ভীত। মহাভয়ে ভীত, ত্রস্ত, আশঙ্কিত।

একটু পরে সিংহাসনে বসে থাকা মানুষটি একটি পাথরের গ্লাস এগিয়ে দিল মেঝেতে বসে থাকা লোকটির দিকে। গম্ভীর স্বরে বলল, 'খেয়ে নে বীরবাহাদুর। মনে জোর পাবি।'

লোকটি কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাসটি নিয়ে বলল, 'এতে কী আছে ঠাকুর?'

'মায়ের চরণামৃত। এক চুমুকে শেষ কর বীরবাহাদুর। নইলে মা রুষ্ট হবেন। তুই তো জানিস মায়ের ক্রোধ বড় সাঙ্ঘাতিক। তার হাত থেকে কারও নিস্তার নেই।'

বীরবাহাদুর এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে। তারপর মুখ বিকৃত করে চাপা আর্তনাদ করে, 'কী খাওয়ালে ঠাকুর। গলা-বুক জ্বলে যায় যে।'

সিংহাসনে থাকা লোকটি কিছু বলে না। শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বীরবাহাদুরের দিকে। এই আরক বড় শক্তিশালী, বহু প্রাচীন



পদ্ধতিতে তৈরি। এর তেজ সহ্য করার মত মানুষ এক নিজেকে ছাড়া আর দ্বিতীয়টি দেখেননি তিনি।

বীরবাহাদুর কিছুক্ষণ টলতে থাকে। তারপর স্থির হয়ে চোখ মেলে তাকায় সে।

একটু পর সিংহাসনে বসে থাকা লোকটি গম্ভীরস্বরে বলে উঠল, 'তাহলে কী ভাবলি বীরবাহাদুর?'

'ও যে আমার একমাত্র মেয়ে ঠাকুর। ওকে কী করে....'

ভুরু কুঁচকে যায় ঠাকুরের। এখনও মনের জোর রয়ে গেছে লোকটার, সম্পূর্ণভাবে আরকের বশীভূত হয়নি।

'তুই বুঝছিস না কেন বীরবাহাদুর। তোর বউয়ের পেটে যে ছেলে আছে সে তোর নাম উজ্জ্বল করবে। তোর পরিবারকে একডাকে চিনবে লোকে।'

'সে চিনুক ঠাকুর। কিন্তু তার বদলে কী করে... ও যে আমার বড় আদরের মেয়ে।'

'মেয়েরা জন্ম কেন নেয় বীরবাহাদুর? পরের বাড়ি যাবে বলেই তো। মেয়ে কখনও নিজের হয় না বীরবাহাদুর, ও হচ্ছে পরের গচ্ছিত সম্পত্তি। সে যখন যাবেই তখন না হয় মা নিজেই নিলেন।'

'কিন্তু ঠাকুর, আমার ছেলে মেয়ে দুই-ই না হয় থাকুক। আমার অত খ্যাতি দরকার নেই।'

'তা হয় না রে বীরবাহাদুর,' একটা ক্রূর হাসি খেলে যায় লোকটার মুখে, 'মা স্বয়ং তোর মেয়েকে চেয়েছেন। আমার লোক গিয়ে দেখে এসেছে তাকে। তোর মেয়ে সর্বসুলক্ষণা, এই কাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত। মায়ের চাওয়ার কি অন্যথা হতে পারে রে? তোর মেয়েকে আমাদের চাই বীরবাহাদুর। ওই দেখ মা কী বলছেন।'

ঘরের একদিকের দেওয়ালে একটা পর্দা টাঙানো ছিল। সেটা একটানে সরিয়ে দিল কেউ। আর সেদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল বীরবাহাদুর।

পর্দার ওপারে এক ভয়ঙ্করদর্শন দেবীমূর্তি। মূর্তির সম্পূর্ণ দেহ অস্থিসার, কঙ্কাল। মুখটিও করোটির মতো। দেবীর পরনে বাঘছাল। তিনি ছয়টি

হাত নিয়ে একটি শবদেহের ওপর নৃত্যরতা। ডানদিকের তিন হাতে বজ্র, খড়্গ আর চক্র। বামদিকের তিনটি হাতে নরকরোটি, রত্ন এবং পদ্ম। অন্ধকার চোখদুখানি যেমন ভীতিকর তেমনই ক্রূর।

ভয়ের চেয়েও ভয়ঙ্কর এই মূর্তি দেখে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকল বীরবাহাদুর। এতক্ষণে আরকের সম্পূর্ণ প্রভাব ছেয়ে ফেলেছে তার মস্তিষ্ক। মাথাটা শূন্য হয়ে যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসে তার।

ঠাকুর সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরেসুস্থে বীরবাহাদুরের সামনে মেঝেতে বসলেন। শীতল কণ্ঠে বলেন, 'মা বজ্রচর্চিকা তোর মেয়েকে চেয়েছেন রে বীরবাহাদুর। ওর রক্তে তোর পরিবারের শুদ্ধি হবে, তোর অনাগত সন্তানের কল্যাণ হবে। মায়ের ইচ্ছায় বাধা দিস না বীরবাহাদুর। মা যে ওকে চাইছেন।'

বীরবাহাদুর আছড়ে পড়ে যায় ঠাকুরের পায়ে। গোঙাতে থাকে, তারপর পা দুটো স্থির হয়ে যায়।

বাকিরা এতক্ষণ স্থির হয়ে পুরো নাটকটা দেখছিল। এবার বীরবাহাদুরকে তুলে নিয়ে গেল তারা।

* * *

কফিশপে দরজা খুলে লোকটাকে লোকেট করতে পারল অর্জুন। তারপর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আরে, আপনাকেই আমি পুনে যাওয়ার পথে লিফট দিয়েছিলাম না?'

লোকটা হেসে ফেলল, 'ফোনে আপনার নাম আর গলার স্বর শুনেই আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু পরিচয় আর দিইনি। ভাবলাম একটু মজা হোক। দুনিয়াটা সত্যিই গোল মিস্টার সেনগুপ্ত। সত্যি কথা বলতে কি ওইদিন আমারও সোফিয়া ম্যাডামের পার্টিতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খান্ডালায় একজনের বাড়িতে একটা পুরনো পুঁথির খোঁজ করতে গিয়ে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে আমি কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম যে মা আমাদের আবার মিলিয়ে দেবেন।'

আশ্চর্য হল অর্জুন, 'মা?'

লোকটা প্রণাম করে, ‘জগজ্জননী মহামায়া। তিনি সব জানেন, সব শোনেন, সবার খবর রাখেন। আর যার যখন আমাকে দরকার হয়, তার সঙ্গে আমাকে ঠিক মিলিয়ে দেন।’

লোকটাকে ভালো করে লক্ষ্য করল অর্জুন। পাগল বলে তো মনে হচ্ছে না। এমনিতে সাধারণ দেখতে। একটা হাওয়াই শার্ট, ট্রাউজার আর পায়ে চামড়ার পা-ঢাকা চপ্পল পরে আছে। হাইট মাঝারি, গায়ের রং চাপা, বাঙালিদের যেমন হয়। তবে লোকটার সব শক্তি যেন চোখদুটোতে। এমন শান্ত, গভীর অথচ উজ্জ্বল চোখ অর্জুন দ্বিতীয়টি দেখেনি জীবনে। আর সবসময় মনে হয় ভদ্রলোক যেন চোখের কোণ দিয়ে হাসছেন। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না সেই চোখের দিকে। শুধু মনে হয় এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম।

অর্জুন বলে, ‘কাজের কথা, দরকারের কথা পরে হবে। আগে আপনার নামটা বলুন দেখি। সেদিন তো আপনি গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার পর খেয়াল হল আপনার নামটাই জানা হয়নি।’

দুহাত জড়ো করে লোকটা, ‘আমার নাম কে এন মৈত্র। পুরো নাম কৃষ্ণানন্দ মৈত্র। বাড়ি তো আগেরদিনই বলেছি, নদিয়া। আরও ঠিক করে বলতে গেলে নবদ্বীপে। আর পেশা তো জানেনেই, অধ্যাপনা।’

‘ইন্ডোলজি, স্পেশালাইজেশন হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের দর্শন ও ইতিহাস। তাই তো?’

‘ঠিকই বলেছেন। তবে শুধু বৌদ্ধধর্ম নয়। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রকৃতিবাদী বা পেগান ধর্মের ইতিহাসই আমার অধ্যয়ন আর অধ্যাপনার বিষয়। তবে হ্যাঁ, বৌদ্ধধর্ম, বিশেষ করে বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম আর দর্শন আমার বিশেষ আগ্রহের বিষয়।’

অর্জুন আর দেরি করল না। ‘সোফিয়ার সঙ্গে আপনার এক প্রস্থ আলোচনা হয়ে গেছে শুনেছি। এবার এটা নিয়ে কী ভাবে এগোনো যায় সে নিয়ে আপনার পরামর্শ চাই।’

‘আপনি কীভাবে কাজ শুরু করতে চাইছেন বলুন।’

পরের আধঘণ্টা ধরে অর্জুন বিশদে তার পরিকল্পনা খুলে বলল।

মৈত্রমশাই সবটা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন 'ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেই তন্ত্র বা অকাল্ট বিষয়ে এতসব আকর্ষণীয় বিষয় ছড়িয়ে আছে যে একটা ডকুমেন্টারিতে শেষ করতে পারবেন না।'

'যেমন?'

'যেমন ধরুন শৈব আগম, শক্তিতন্ত্র উপাসকদের মধ্যেই প্রচুর ভাগ আছে। বামাচার আছে, বীরাচার আছে, যামল আছে, ডামর আছে...'

'দেখুন লোকে তো অত ফিলোসোফি বুঝবে না। তারা তন্ত্র-মন্ত্র এসবের অলৌকিক দিকটা নিয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড। আমি চাইছি সেই দিকটা নিয়ে কাজ করতে।'

'অর্থাৎ?'

'মানে কিছু ডেঞ্জারাস, স্পাইন চিলিং তান্ত্রিক রিচুয়ালস ক্যামেরাতে ডকুমেন্ট করতে।'

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, 'সেটা ঠিক হবে না সাহেব। তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি অতি গূঢ়, অতি গোপন। শাস্ত্রে বলে এই সাধনা মাতৃজারবৎ, মানে মায়ের উপপতির পরিচয়ের মতো গোপন রাখতে হয়। তাকে ক্যামেরাবন্দি করে সাধারণ্যে প্রকাশ করাটা অত্যন্ত অনুচিত কাজ হবে।'

'বুঝলাম না। এতে এত গোপনীয়তার কী আছে?'

'তন্ত্র আর পাঁচটা সাধারণ পূজা উপাসনার মতো নয় সাহেব। এক আশ্চর্য গোপন শাস্ত্র। প্রকৃতি নিজের হাতে একে সৃষ্টি করেছেন। তাই এই শাস্ত্র আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, পারমার্থিক এবং পারত্রিক। লৌকিক এবং অলৌকিক জগতের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম পর্দা হল তন্ত্র। সেই পর্দা উঠিয়ে অন্য জগতে প্রবেশের ক্ষমতা খুব কম লোকেরই থাকে সাহেব। তার জন্য স্বয়ং মহামায়ার কৃপা লাগে। তিনি নিজে এই সংসারকে মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। সেই মায়ার বাঁধন কাটিয়ে জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত করতে হয়। সে বড় কম ক্ষমতা নয়। সেই পৃথিবী অনধিকারীদের জন্য নয়। যারা শুয়ে আছে তাদের শুয়ে থাকতে দিন সাহেব। সেই পৃথিবীকে বিরক্ত করবেন না।'

অর্জুন মাথা নাড়ে, 'আমি কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না দাদা। সোফিয়া

আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছে সেটা তো শেষ করতেই হবে। এখন বলুন আপনি আমাদের হেল্প করবেন কি না।'

মৈত্রমশাই বললেন, 'সোফিয়া ম্যাডাম আমাকে তথ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করতে বলেছেন। তার জন্য আগাম টাকাও দিয়েছেন। শাস্ত্রে বলে অন্নের ঋণ মস্তবড় ঋণ। তাই আমাকে সাহায্য করতেই হবে, তবে একটাই অনুরোধ, আমাকে না জানিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু ডকুমেন্ট করতে যাবেন না প্লিজ।'

'হুম। তাহলে আমরা কোথা থেকে শুরু করব?'

মৈত্রমশাই চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'বঙ্গদেশ, মানে অভিবক্ত বাংলা, কামরূপ, শ্রীহট্ট এসব হচ্ছে তন্ত্রের আদিভূমি। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ, কামরূপ, নেপাল, তিব্বত এসব অঞ্চল। শাস্ত্রে বলে 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা, মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃত। ক্বচিৎ কচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা।' আপাতত বঙ্গভূমি দিয়েই শুরু করা যাক। আমি বেশ কিছু তন্ত্রসাধনার জায়গা, আখড়া এসব চিনি। বেশ কিছু প্রকৃত তান্ত্রিক সাধকদের সঙ্গেও আমার আলাপ পরিচয় আছে। কবে যাবেন বলুন।'

অর্জুন বলল, 'বাড়িতে একটু আলোচনা করেই আপনাকে জানাচ্ছি।'

সেদিনকার মতো মিটিং শেষ হল।

* * *

গৌরী তার মায়ের পেটের ওপর কান রেখে কী যেন শুনছিল। আট বছর বয়েস তার। পৃথিবীর সব কিছু নিয়েই তার বড় কৌতূহল। এই উপত্যকা, জঙ্গল, গ্রাম, গ্রামের পথ, বাজারের নরবু বুড়োর দোকান, দোকানের সামনে শুয়ে থাকা কুকুরটা, চা খেতে আসা ট্যুরিস্টদের পোশাক আশাক, গ্রামের একপ্রান্তে মচ্ছিন্দরনাথের মন্দির, মন্দিরের মস্ত তামার ঘণ্টাটা, সব কিছুই তার আগ্রহের বিষয়। এই নিয়ে সে ক্রমাগত তার মায়ের সঙ্গে বকবক করেই যায়। মা শেষমেশ বিরক্ত হয়ে বলে, 'অত জানি না বাপু। তোর বাবা এলে জিজ্ঞেস করিস বরং।'

গৌরীর বাবা এখানে থাকে না। এখান থেকে ইন্ডিয়া অনেক দূর। সেখানে একটা চা-বাগানে কাজ করে গৌরীর বাবা। বছরে দুবার বাড়ি আসে আর আসার সময় গৌরীর জন্য অনেক অনেক খেলনা আর জামাকাপড় নিয়ে আসে। তখন গৌরীর খুব আনন্দ হয়। রাতদিন বাবার কোলে বসে চোখ বড় বড় করে ইন্ডিয়ার গল্প শোনে। সেখানে নাকি এরকমই পাহাড়, জঙ্গল আর নদী আছে। আর আছে চা-বাগান। কোমরসমান উঁচু চা-গাছের সারি চলে গেছে মাইলের পর মাইল। সেখানে নাকি মাঝেমধ্যে চিতাবাঘ বেরোয়। আর সেখান থেকে একটু দূরে আরও মস্ত বড় জঙ্গল আছে। সেখানে হাতি, বুনো মোষ কত কী জানোয়ার থাকে। বাবা বলেছে আর একটু টাকা জমাতে পারলেই বাবা তাকে আর তার মা'কে ওখানে নিয়ে যাবে। চিতাবাঘ হাতি এসব শুনে কি গৌরীর ভয় করছে? দূর পাগল, বাবা আছে না। বাবা একবার খুকরি নিয়ে দাঁড়ালে কার সাধ্য গৌরীর ক্ষতি করে?

এখন গৌরীর মন আনন্দে ভরপুর, যাকে বলে ডবল মজা। একে তো গৌরীর একটা ভাই হবে। সেই নিয়ে গৌরীর উত্তেজনার শেষ নেই। সারাদিনে সে যখনই সময় পায়, এসে খানিকক্ষণ মায়ের পেটে কান ঠেকিয়ে কী যেন শোনে। তার ওপর বাবা এসেছে দিন দুয়েক আগে। বাবা অবশ্য মাসখানেক আগেই এসেছিল একবার, দুর্গাপুজোর আগে যেমন আসে তেমনই। তখন সঙ্গে আরও দুটো লোক ছিল। তারা অবশ্য ওদের বাড়ি ওঠেনি, নিজেদের থাকার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছিল। তবে একমাসের মধ্যে বাবার ফের আবার আসাটা গৌরীর কাছে বিশেষ আনন্দের বিষয় বই কি।!

বাবা বাইরে গেছে একটু। কী যেন একটা কাজে। মা শুয়েছিল। গ্রামের দাই মা বলেছে আর বেশিদিন নেই। আর মাসদুয়েকের মধ্যেই গৌরীর কোলে একটা জলজ্যান্ত ভাই এসে যাবে। সেই শোনা ইস্তক মেয়েটার উত্তেজনা আর বাঁধ মানছে না। বন্ধুদের, বন্ধুর মায়েদের, গোটা গ্রাম, এমনকি বাজারে গিয়ে ইস্তক গৌরী সবাইকে বলে এসেছে, তার একটা ভাই হবে। পুতুল পুতুল দেখতে জ্যান্ত একটা ভাই। শুধু তার, একমাত্র

তার জন্যই গোটা একটা ভাই। পাড়া-প্রতিবেশীরা সব্বাই এই পাগল মেয়ের ভাইয়াকে নিয়ে পাগলামি জানে। তাই তারা হাসে আর গৌরীর মাথায় কপালে দুটো করে চুমু খায়। আর বলে, 'এই একটা চুমু তোর জন্য, আর অন্যটা তোর আনেওয়ালা ভাইয়ার জন্য।'

মায়ের পেটে কান পেতে কী যেন শুনছিল গৌরী। মেয়ের মাথায় বিলি কেটে দিতে দিতে মা বলে, 'কী শুনছিস গৌরী?'

'ভাইয়ার ডাক।'

'তাই?' হেসে ফেলে মা। 'তা ভাইয়া কী বলছে?'

'বলছে ওর খিদে পেয়েছে। আর খেয়েই আমার সঙ্গে খেলতে বেরোবে।'

'বটে? আর কী বলছে?'

'বলছে, দিদি, তোমার সঙ্গে কবে দেখা হবে?'

'হবে তো।' তৃপ্তমুখে বলে গৌরীর মা বলে, 'এই তো আর মাস দুয়েক। তার পরেই ভাইয়ার সঙ্গে তোর দেখা হবে।'

'ভাইয়াকে কেমন দেখতে হবে মা?' উৎসাহিত স্বরে প্রশ্ন করে গৌরী।

'সে তো হলে দেখতেই পাবি।' কৌতুক খেলে যায় মায়ের মুখে।

গৌরীর কল্পনা আর বাঁধ মানে না। কেমন হবে তার ভাইয়া? ছোট্ট ছোট্ট হাত পা, খুদি খুদি চোখ, মাথায় অল্প চুল। হাত পা ছুঁড়বে আর ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদবে। আর গৌরী তাকে কোলে নিয়ে আদর করবে, ঘাঁটু ঘাঁটু আদর করবে।

গৌরী এবার মুখ তুলে চায়, 'ভাইয়াটা শুধু আমার, তাই না মা?'

মা কিছু বলার আগেই গৌরীর বাবা ঢুকল ঘরে। শঙ্কিত। ত্রস্ত। অস্থির। এবার আসার পর থেকেই গৌরী দেখছে তার বাবা কেমন যেন ছটফট করছে। কে যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সবসময়। আর কী যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। বিড়বিড় করে কী যে বলে বোঝাই যায় না।

গৌরীর মা বলল, 'কী হল? এত অস্থির দেখাচ্ছে কেন?'

বাবা বলল, 'কিছু না। আমি একটু বেরোচ্ছি। গৌরীকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।'

‘এত রাতে? কোথায় যাবে? কেন?’

‘জঙ্গলে একটা জিনিস পড়ে আছে। তুলে আনতে হবে। গৌরী লণ্ঠন ধরবে।’

* * *

রাধিকা রাগে ফেটে পড়ল, ‘মানে? তুমি এখন তোমার ডকুমেন্টারির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে? আমি যে এত করে বললাম ঘুরতে যাব, ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করে আছে, তার কোনও দাম নেই?’

অর্জুন মাথা নীচু করে বসেছিল। সত্যিই তো, পরিবারকে সময় দেবে বলে রাধিকা ওর অমন কেরিয়ার ছেড়ে চলে এল। ছেলেমেয়ে মানুষ করতে, সংসার সামলাতে উদয়াস্ত খাটে। ওরও তো একটা শখ আহ্লাদ আছে।

বছরের এই একটা সময় ওরা ঘুরতে যায়। দেশের মধ্যেই কোথাও। এক-দুবার মলদ্বীপ, মরিশাসও হয়েছে।

এবারে প্ল্যান ছিল সিমলা কুলু মানালি যাওয়ার। রাধিকার আর দুই ছেলেমেয়েরই পাহাড় খুব প্রিয়। অর্জুন টাকা সরিয়েও রেখেছিল এই প্ল্যানের জন্য। মধ্যে এই আচমকা ব্যাঘাত।

‘দেখ রাধিকা, যাওয়ার ইচ্ছে যে আমারও ছিল না তা তো নয়। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার কাছে আর কোনও অপশন নেই। পরপর দুটো প্রোজেক্ট মার খেয়ে গেল। দেখছ তো কী কম্পিটিশনের মার্কেট। টিকে থাকতে গেলে এই কষ্টটুকু করতেই হবে। নইলে বাজারে কি ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার কম আছে? সোফিয়ার অন্য কাউকে খুঁজে নিতে জাস্ট দুদিন লাগবে।’

রাধিকা তাও গজগজ করতে থাকে, ‘বছরে তো এই একবারই বেরোতে বেড়াই। তাতেও অশান্তি।’

অনেক তর্কবিতর্ক শেষে অবশেষে একটা সমাধান বেরোল।

অর্জুনের বাবার নাম সুবিনয় সেনগুপ্ত। ভদ্রলোক কাজ করতেন আর্মিতে। শেষে মেজর জেনারেল অবধি হয়েছিলেন। জীবনের অনেকটা

সময় পশ্চিম ভারতে কাটিয়েছেন। অর্জুনের জন্মও মুম্বাইতেই।

সুবিনয়বাবু রিটায়ার করার পর দার্জিলিংয়ে একটা বাড়ি কিনে ওখানেই সেটল করে গেছেন। তিনি প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ। শহরের ঝুটঝামেলা তাঁর পোষায় না। আর্মি জীবনে তাঁর এক শাগরেদ ছিল, হাবিলদার জংবাহাদুর থাপা। সেই-ই তার মেজর শা'ব কে বাংলোটা সস্তায় পাইয়ে দেয়। রিটায়ার করার পরও সে মেজর শা'ব-এর খিদমত খাটা ছাড়েনি। সে শুধু যে সেনগুপ্ত ভিলার কেয়ারটেকার তাই-ই নয়, সেনগুপ্ত পরিবারের সব কিছু তারই জিম্মায়। তাকে ছাড়া মেজর সেনগুপ্ত'র এক মুহূর্ত চলে না।

অর্জুন ভাবল এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাক। মৈত্রবাবুও ওদিকেই যেতে বলছেন পরের কাজের জন্য। তাহলে ওখানেই ভ্যাকেশনটা কাটানো যাক। পাহাড়ও হল, ছুটিও হল, কাজও এগিয়ে রইল খানিকটা।

প্রস্তাব শুনে রাধিকা তো বটেই, নূপুর আর নিখিলও খুব খুশি। তারা দাদা-দাদিকে খুব ভালোবাসে। বহুদিন হল তারা দাদা-দাদির আদর খায়নি। পারলে তারা এখন থেকেই রেডি হয়ে থাকে আর কী!

সেদিন রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল অর্জুন। দেখল কে যেন ওকে একটা উঁচু পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। আর সেই সঙ্গে চারিদিকে কারা যেন হাড়ের খটাখট শব্দে তালি দিয়ে নেচে চলেছে। পড়তে পড়তে যে ঠেলা দিল তার মুখটা দেখা চেষ্টা করল সে। এ কি! এ তো একটা বাচ্চা মেয়ে। মুখটা নূপুরের মতো না?

সারা রাত এপাশ-ওপাশ করে ভোরের দিকে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল অর্জুন। আর সেই রাতে রাহু প্রবেশ করল অশ্লেষা নক্ষত্রে। মহানাক্ষত্রিক কালসর্প ধীরে ধীরে তুলে ধরল তার তুণ্ডখানি।

* * *

অন্ধকার রাস্তা ধরে গাড়িটা যাচ্ছিল দূর থেকে আরও দূরে। পাহাড়ের পাকদণ্ডী ধরে দ্রুত নেমে আসছিল ইঞ্জিনের কর্কশ আর্তনাদ। মনে হচ্ছিল যেন কোনও প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের পিঠ বেয়ে নেমে আসছে বিষাক্ত

দাঁতালো কোনও পোকা। গাড়ির হেডলাইটের আলো গিলে খাচ্ছে উপত্যকার হাঁ করা অন্ধকার। দূরে দূরে মাঝে মাঝে পাহাড়ের বুকে থোকা থোকা আলো দেখা যায়, অন্ধকারে স্থির জোনাকির ঝাঁকের মতো। বোঝা যায় ওগুলো কোনও না কোনও পাহাড়ি জনপদ।

নেপাল থেকে দার্জিলিং ঢোকার সবচেয়ে সহজ রাস্তা নকশালবাড়ি হয়ে। কিন্তু ঠাকুরের আদেশ, রক্সৌল হয়ে দ্বারভাঙার রাস্তা ধরে পূর্ণিয়ার পথে শিলিগুড়িতে পৌঁছতে হবে। সময় বেশি লাগে বটে, কিন্তু অনেক সেফ রাস্তা। রাতে থাকার জায়গাও ঠাকুর বলে দিয়েছেন। যেখানে কেউ প্রশ্ন করবে না তিনটে লোক একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। আর মেয়েটা সবসময় এমন ঘুম ঘুম চোখে ঝিমিয়ে থাকে কেন।

গাড়ি একটু পরেই রক্সৌল ঢুকবে। যে লোকটা গাড়ি চালাচ্ছে তার পাথর কোঁদা শরীর আর ভাবলেশহীন চোখমুখ দেখলে প্রাণহীন রোবট মনে হয়। গাড়ির পেছনের সিটে বসে আছে বীরবাহাদুর। তার কোলে অচৈতন্য গৌরী। বীরবাহাদুরের চোখমুখ লাল। বোঝা যায় যে সে প্রকৃতিস্থ নেই। চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো ভীত পশুর মতো ঘুরছে এদিক ওদিক। মাঝে মাঝে মেয়ের বুকে হাত রেখে দেখছে সব ঠিক আছে কি না। ঠোঁটে সবসময়ই যেন কী বিড়বিড় করছে।

বীরবাহাদুরের পাশে যে বসে আছে তার দৈত্যের মতো চেহারা। মাথাটা গাড়ির ছাদ ছুঁই ছুঁই প্রায়। হাত দুটো থামের মতো মোটা। লোকটা কথা বলে না বললেই চলে। সারাক্ষণ ধরে কী একটা চিবিয়ে চলেছে। আর গাড়ি থামলে বীরবাহাদুরের কাছ ঘেঁষে থাকে।

বীরবাহাদুর একবার বাইরে দেখার চেষ্টা করল। বুঝতে পারল না কোথায় এসেছে তারা। স্খলিতস্বরে একবার জিজ্ঞাসা করল, 'হামলোগ কাঁহা তক আয়ে হ্যাঁয়?'

পাশের লোকটা তার মোটা থাবাটা বীরবাহাদুরের ঘাড়ে রেখে ইশারায় চুপ করতে বলল। ড্রাইভার লোকটা রিয়ার ভিউ মিরর দিয়ে দৃশ্যটা দেখে ফের রাস্তায় মন দিল। আর মাত্র দুটো দিন। তারপরেই অমরত্ব তাদের হাতের মুঠোয়।

বিড়বিড় করতে করতে বীরবাহাদুর ফের মেয়েকে আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। তার মাথার মধ্যে কে যেন বলে চলেছে খুব ভুল করছে সে। ভয়ানক, মারাত্মক ভুল।

* * *

পার্ক হোটেলের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে রাধিকা বলল, 'আঃ, কী আরাম। আমি বাপু এখান থেকে এখনই নড়ছি না। কয়েকদিন থাকব, নিখিল আর নূপুরকে কলকাতা দেখাব, নিউমার্কেট থেকে চুটিয়ে শপিং করব। তারপর দার্জিলিং যাব।'

অর্জুন জামা ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'জো হুকুম মেমসাহেব। গোটা পার্ক স্ট্রিট আর এসপ্ল্যানেড আপনার জন্যে কাঁদছে। দয়া করে দেখবেন, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স যেন একেবারে ধসে না যায়।'

রাধিকা হেসে ফেলল। কথাটা অর্জুন একদমই বাড়িয়ে বলেনি। কিছু কিছু শহরের সঙ্গে মানুষের আত্মিক টান থাকে। বোধহয় পূর্বজন্মের প্রারব্ধের টান। কলকাতার সঙ্গে রাধিকার টানটা বোধহয় সেরকমই।

অথচ অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে রাধিকা কলকাতা কেন, পূর্ব ভারতের কোনও শহরেই আসেনি। তার জন্ম, পড়াশোনা, বড় হয়ে ওঠা সবই দিল্লিতে। কাজের সূত্রে মুম্বাইয়ে এসে অর্জুনের সঙ্গে পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয়। আর সেই সূত্রেই রাধিকার কলকাতায় আসা।

কলকাতায় প্রথমবার এসে রাধিকা একটা ধাক্কা খেয়েছিল। মনে হয়েছিল এই শহর যেন কত চেনা তার। প্রথমবার ট্রামে চড়ে মনে হয়েছিল এর আগেও যেন সে চড়েছে এই অতিধীর জড়দগব বাহনে। পার্ক স্ট্রিটে পা রেখে তার মনে হয়েছিল কত যুগ পরে সে আবার পা রাখল এই আলোকোজ্জ্বল সরণিতে। এসপ্ল্যানেডের উচ্চকিত বিকেল, উত্তর কলকাতার অথর্ব গলিখুঁজি, দক্ষিণ কলকাতার ঝলমলে স্মার্টনেস সবই তার মনে হয় যেন কত জন্মের চেনা। যেন সে কত জন্ম এই কলকাতার পথে হেঁটেছে, ভালোবেসেছে, জন্মেছে, মরে গিয়েছে।

তাই একবার কলকাতা এলে তিন-চারদিন না কাটিয়ে অন্য কোথাও

যায় না রাধিকা। একটু একটু করে এই শহরটা তার আত্মার অংশ হয়ে উঠেছে।

অর্জুনও তার স্ত্রী'র এই কলকাতা প্রেমের ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে। তার অবশ্য তেমন টান নেই কলকাতা নিয়ে, সে ঘোর মুম্বাইয়া পাবলিক। মজা করে বউকে বলে, 'আগের জন্মে তুমি শিওর বাঙালি মেয়ে ছিলে। শিলে মশলা বেটে মাছের ঝোল আর সুক্তো রান্না করতে। আর খোঁপা বেঁধে গরদের শাড়ি পরে পুজোয় অঞ্জলি দিতে যেতে।' রাধিকা শুনে মিটিমিটি হাসে। মাছের ঝোল আর সুক্তো, দুটোই ভালো পারে সে, মুম্বাইয়ে তাদের এক বাঙালি প্রতিবেশীর কাছ থেকে শিখেছে। আর পুজোয় পাওয়াইয়ের বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনের পুজোতে অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে তার কখনও ভুল হয় না।

অর্জুনের রাতের ট্রেন, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। সে বেরিয়ে গেল কিছু কেনাকাটা করতে। রাধিকা স্নান করতে ঢুকল। একবার কালীঘাটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে হবে। পুজো দিতে হবে অর্জুনের নামেও। বড্ড চাপ যাচ্ছে লোকটার ওপর।

* * *

অর্জুনের সঙ্গে মৈত্রমশাইয়ের দেখা হল শিয়ালদা স্টেশনের গেটে। ভদ্রলোকের পরনে সেই শার্ট ট্রাউজার্স আর পা ঢাকা চামড়ার চপ্পল। তফাতের মধ্যে এবারে গায়ে একটা শাল জড়ানো। অর্জুনকে দেখে হেসে বললেন, 'গরম জামাকাপড় সঙ্গে নিয়েছেন তো অর্জুনবাবু? দার্জিলিংয়ে কিন্তু এখন মারাত্মক ঠান্ডা। মুম্বাইয়ের লোকেদের পক্ষে সে শীত সহ্য করা মুশকিল।'

অর্জুন হেসে ফেলল। কৌতুকের সুরে বলল, 'দাদা, আমাকে সে ডকুমেন্টারি ফিল্মের শুটিংয়ের জন্য সারা ভারত ঘুরতে হয়। গত বছর লেহ লাদাখ অবধি ঘুরে এসেছি। দার্জিলিংয়ের ঠান্ডা কি তার থেকেও ভয়ানক?'

মৈত্রমশাইয়ের চোখে কৌতুকের ঝিলিক খেলে গেল। তিনি বললেন,

'বটে? দার্জিলিংয়ের ঠান্ডাকে চ্যালেঞ্জ? দেখা যাক, কে জেতে, লাদাখ না দার্জিলিং।'

অর্জুন হা হা করে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'বাই দ্য ওয়ে, রাতের জন্য লুচি আর মাংস নিয়ে এসেছি। চলবে তো?'

'চলবে মানে? দৌড়বে।'

'আপনি মাংস খান?'

'কী বলছেন মশাই? আমি ঘোর শাক্ত, মায়ের পুজোয় মাছের অন্নভোগ দিই। আর আমিষ ছাড়া বাঙালি বাঁচে নাকি?'

কথা বলতে বলতে দুজনে নিজেদের বার্থ খুঁজে নিলেন। ঠিক সাড়ে ন'টায় কাঞ্চনকন্যা যাত্রা শুরু করল নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে।

* * *

কালীঘাট থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক খানিক হেঁটে রাধিকা বুঝতে পারল রাস্তা ভুল করেছে সে। অথচ এমন হওয়ার তো কথা নয়! প্রতি বছরই একবার করে এখানে পুজো দিতে আসে সে। তারপর খানিক হেঁটে বেড়ায় এদিক-ওদিক। এদিকের প্রায় সব রাস্তাই চেনা তার। রাস্তাটা গুলিয়ে গেল কী করে?

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। কলকাতা শহর সন্ধেবেলাতেই জেগে ওঠে। রাধিকার কানে কল্লোলিনীর বিপুল কলতান ভেসে আসছে। মানে বড় রাস্তা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। অথচ সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই পাড়াটা কেমন যেন নিঝুমমতো। বাড়িঘর সবই আছে। গলির রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করা আছে। বাড়িতে বাড়িতে আলো, সিলিং ফ্যান চলছে।

শুধু কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

একটু পর রাধিকার খুব অদ্ভুত লাগতে লাগল। জঙ্গল বা মরুভূমি নয়, মহানগরী কলকাতার বুকে একটি পাড়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে। বাড়িতে আলো জ্বলছে। ল্যাম্পপোস্ট-এর আলো আছে। প্রাণের সব লক্ষণ আছে। কিন্তু সাড়া নেই। কোনও বাড়ি থেকে কোনও শব্দ ভেসে

আসছে না। কোনও সাংসারিক কথাবার্তা, টিভির আর্তনাদ, উচ্চকিত তর্কাতর্কি, গাড়ির আওয়াজ, কিছুই নেই। কোথাও একটা লোক, কুকুর বা বিড়াল কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।

রাধিকা এদিক-ওদিক তাকাল। এ তো ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার! সন্ধে ছ'টার সময় কলকাতা শহরের একটা পাড়া এমন নির্জন, নিঃস্তব্ধ হতে পারে এ ভাবাই যায় না। ব্যাপারটা নিখিল আর নূপুরও লক্ষ্য করেছে। তারা ইতিউতি চাইছে। নিখিল একবার মায়ের হাতটা জোরে আঁকড়ে ধরল। তার মানে ভয় পেয়েছে ও।

আর একটু এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরল রাধিকা। আর তখনই দেখতে পেল দোকানটাকে। এই রাস্তাটা একটু এগিয়ে দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। সেই মোড়ে খুব সম্ভবত একটা পার্ক। অন্ধকারটা যেন ঝুপসি হয়ে পাকিয়ে আছে সেখানে। আর পার্কের বন্ধ গেটের ঠিক পাশে একটা গুমটি। আলো জ্বলছে। একটা লোকের অবয়বও দেখা যাচ্ছে সেখানে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রাধিকা। যাক লোক যখন পাওয়া গেছে, তখন এখান থেকে বেরোনোর রাস্তাও পাওয়া যাবে।

গুমটির কাছে গিয়ে রাধিকা দেখল একটা ছোট চায়ের দোকান। কলকাতার ফুটপাথে এমন দোকান অহরহ দেখা যায়। চায়ের স্টোভ আর তার সঙ্গে, সিগারেট, বাপুজি কেক, কয়েকটা বিস্কুট, এই সব নিয়ে ক্ষুদ্র সম্ভার। একটা লোক স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে বসেছিল।

রাধিকা গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে মেন রোডে যাওয়ার রাস্তা কোনটা দাদা?'

লোকটা রাধিকার দিকে তাকাল না। যেমন উদাসভাবে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, তেমনই তাকিয়ে রইল। তারপর নিস্পৃহসুরে বলল, 'মানুষ যে পথে হেঁটে পথ হারায়, সে পথেই পথ খুঁজে পায়। যে রাস্তায় হেঁটে দিশা হারিয়েছেন, সেই রাস্তাই আপনাকে ঠিক দিশা দেখাবে।'

রাধিকা ঘাবড়াল না। সে জানে বাঙালিদের মধ্যে এরকম একটা অদ্ভুত পাগলামি আছে। দিল্লি বা মুম্বাইয়ে চায়ের দোকানি ফিলোসোফির কথা আওড়ালে অস্বাভাবিক লাগতে পারে। কলকাতায় এসব বিচিত্র কিছু না।

সে আবার জিজ্ঞেস করতে যাবে বড় রাস্তাটা কোনদিকে, এমন সময় শুনল গুমটির পাশ থেকে কে যেন ক্ষীণস্বরে বলল, 'কিছু খেতে দেবে মা?'

রাধিকা দেখল শতছিন্ন কাপড় পরা এক বুড়ি গুমটির পাশে গুটিশুটি মেরে বসে আছে। জায়গাটা গুমটির ছায়ায় অন্ধকার বলে চোখে পড়েনি। রাধিকা সেদিকে তাকাতে বুড়ি স্তিমিত স্বরে আবার বলল, 'দুটি খেতে দেবে মা? আজ সারাদিন পেটে কিছু জোটেনি গো।'

রাধিকা চেয়ে দেখল তার সামনে যেন একটুকরো ক্ষুধার্ত ভারতবর্ষ বসে আছে। পরনে ছেঁড়া কাপড়, পা খালি, উস্কোখুস্কো সাদা চুল আর কঙ্কালসার শরীর। বিবর্ণ হতশ্রী দুই চোখে অন্ধ আকুল প্রত্যাশা, যদি একটুকরো খাওয়ার পাওয়া যায়।

রাধিকা কিছু বলার আগে নূপুর হাত বাড়িয়ে দোকানের বয়াম থেকে বিস্কুট আর কেক তুলে নিল। তারপর বুড়ির হাতে দিয়ে বলল, 'খাও ঠাম্মি।'

বুড়ির গলা থেকে ক্ষীণ শব্দ বেরোল, 'জল, একটু জল দেবে মা?'

নিখিলের হাতে একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল ছিল। সে বোতলের ঢাকনাটা খুলে বুড়ির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও। জল।'

বুড়ির দু'বার হাত ওঠাবার চেষ্টা করেও পারল। না খেয়ে খেয়ে এমনই দুর্বল হয়ে গেছে বুড়ি, যে হাত তুলে জলের বোতলটা অবধি নিতে পারছে না। সেই দেখে নূপুর হাত বাড়িয়ে নিখিলের হাত থেকে বোতলটা নিল। তারপর পরম মমতায় বুড়ির মুখে জল ঢেলে দিতে থাকল।

দেখতে দেখতে রাধিকার বুকটা গর্বে ফুলে উঠছিল। যাক, ছেলেমেয়েকে অন্তত এইটুকু যে শেখাতে পেরেছে, সেটাই বা কম কী?

বুড়ির জল খাওয়া শেষ হলে নিখিল আর নূপুর আবার মায়ের কাছে ফিরে এল। রাধিকা দু'জনের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিল, নিচু হয়ে একটু চুমুও খেল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সেই গুমটিও নেই, বুড়িও নেই। আর গলি থেকে বাঁদিকে তাকালেই দেখা যাচ্ছে বড় রাস্তার জনস্রোত।

* * *

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে গাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না। মৈত্রমশাই বেশ চমকিত হলেন, 'আপনাদের কম্পানির সিস্টেম তো বেশ আধুনিক মশাই। আগে থেকেই সব ঠিক করা থাকে।' অর্জুন হেসে বলল, 'সোফিয়া থাডানির হাউস বেশ বড় হাউস দাদা। এমপ্লয়িদের ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস ম্যানেজ করার জন্য ওদের আলাদা ডিপার্টমেন্টই আছে। এমনকি আমাদের দার্জিলিংয়ে হোটেলও বুক করা আছে।'

মৈত্রমশাই বললেন, 'এখনই দার্জিলিংয়ের জন্য রওনা দেব নাকি?'

অর্জুন বলল, 'সেরকমই তো কথা ছিল। আমি অবশ্য হোটেলে থাকব না। দার্জিলিংয়ে আমার বাবা-মা থাকেন, আমি ওখানেই উঠব। আপনার জন্য হোটেল ঠিক করা আছে।'

মৈত্রমশাই মাথা নেড়ে বললেন, 'না মিস্টার সেনগুপ্ত। আমাদের দিন দুয়েক এখানে থাকতে হবে। একে তো আমাকে কিছু কেনাকাটা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শুনেছি এখানে একজন মস্ত বড় তন্ত্রবিদ থাকেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। আপনিও ব্যবহারিক তন্ত্র কী এবং কেন এ নিয়ে একটা ভালো ধারণা পেয়ে যাবেন। আপনার কাজও অনেকটা এগিয়ে যাবে।'

অর্জুন ভুরু কুঁচকে বলল, 'সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু এই তান্ত্রিক ভদ্রলোক থাকেন কোথায়?'

'জায়গাটার নাম নাগরাকাটা। এখান থেকে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা। বেলাবেলি বেরোলে সন্ধের মধ্যে ফিরে আসা যাবে। কাল আমার কিছু জিনিস জোগাড় করার আছে। আপনি চাইলে শিলিগুড়ি ঘুরে দেখতে পারেন। তারপর পরশু সকালে দার্জিলিংয়ের জন্য রওনা দিলেই হল।'

অর্জুন ইতস্তত করল, 'সেক্ষেত্রে তো আজকের জন্য একটা হোটেল বুকিং করতে হয় সেটা তো হেড অফিসে বলে রাখিনি।'

মৈত্রমশাই হেসে বললেন, 'আরে মশাই, আপনাদের হেড অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন হোটেল ছাড়া কি আর শিলিগুড়িতে হোটেল

নেই? ডলি ইন-এ থাকবেন চলুন। ভালো ব্রেকফাস্ট দেয়, আর রাতে দুর্দান্ত ভালো মাটন করে মশাই, খেলেই মন ভালো হয়ে যাবে।'

* * *

দুজনে যখন নাগরাকাটার পথে, তখন দুপুর প্রায় মাথার ওপর। চমৎকার ঝকঝকে রাস্তার দুধারে জঙ্গল আর চা-বাগানের দিগন্ত-উন্মোচিত উদার বিস্তার। মাথার ওপর ঝকঝকে আকাশ। উত্তরবঙ্গের নির্মল বাতাস গাড়ির জানলা বেয়ে মুখে ঝাপটা মারতেই মন ভালো হয়ে গেল অর্জুনের। মুম্বাইয়ে মানুষ হলে কী হবে, কর্মসূত্রে দেশের অনেক জায়গাই ঘুরতে হয়েছে তাকে। তবুও এই সজল সপ্রাণ স্নিগ্ধ বঙ্গভূমি প্রথম আলাপেই তার মন কেড়ে নিয়েছে। মনে হয় মায়ের আঁচল বিছিয়ে কে যেন তাকে ডাকছে, আয় আয় আয়।

নাগরাকাটা পৌঁছে তান্ত্রিক ভদ্রলোকের ঠিকানা খুঁজে পেতে একটু বেগ পেতে হল। লোকের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে দুজনে যে জায়গাটায় পৌঁছলেন সেটা একটা গ্রাম, নাম চম্পাগুড়ি। কাছেই একটা চা-বাগান আছে, নাম কুর্তি টী গার্ডেন। এখানে অবশ্য চারিদিকেই চা-বাগান। নাগরাকাটা টী গার্ডেন তো আছেই। তাছাড়াও আছে নয়াসইলি, গাটিয়া, লুকসান, গ্রাসমোর, আরও কত কী।

যেতে যেতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল 'যাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি তাঁর নাম কী?'

'ভদ্রলোকের নাম কালিকিঙ্কর ভট্টাচার্য। এককালে স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এখন সেসব ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, স্কুলছুটদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা, লাইব্রেরি স্থাপন, রক্তদান শিবির এসব করে বেড়ান। তবে প্রধান কাজ হচ্ছে তন্ত্রচর্চা। এই এলাকায় ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, তাবিজ কবচ এসবের প্রচলন খুব। ভট্টাচার্যমশাই এ লাইনে একেবারে ধন্বন্তরি বললেই চলে। এলাকার কোনও শুভ কাজ তাঁকে ছাড়া হওয়ার জো নেই। পুংসবন থেকে শ্রাদ্ধশান্তি সবেতেই ভট্টাচার্যমশাই। এলাকার পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে এমএলএ অবধি কালিকিঙ্কর ভট্টাচার্যর পারমিশন না নিয়ে ইলেকশন

ক্যাম্পেইন শুরু করেন না। তবে আমি যা শুনেছি, ভদ্রলোকের তন্ত্র নিয়ে পড়াশোনা প্রচুর। আমাদের কাজে লাগবে সেইটে।'

গ্রামের ঢোকার মুখে একটা বড় বটগাছ। তার নীচে বাঁধানো বেদিতে কয়েকজন লোক অলস ভাবে বসেছিল। মৈত্রমশাই লক্ষ্য করলেন যে বসার ভঙ্গি অলস হলেও চোখ সতর্ক। গাড়িটাকে দেখেই তাদের একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যাবেন কোথায়?'

মৈত্রমশাই চেঁচিয়ে বললেন, 'কলকাতা থেকে আসছি। কালিকিঙ্কর ভট্টাচার্য'র বাড়ি কি এদিকেই?'

গাঁট্টাগোট্টা চেহারার একজন নেমে এল, 'চলুন, পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ভট্টাচার্য মশাই দাওয়াতে বসে কোষ্ঠীবিচার করছিলেন। সামনে লম্বা লাইন। কেউ এসেছে হাত দেখাতে, কেউ হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিতে, কেউ সরকারি দপ্তরে পাঠাবে বলে চিঠি লেখাতে। সঙ্গে আসা লোকটি চেঁচিয়ে বলল, 'ঠাকুরমশাই, এঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন বলে।'

কালিকিঙ্কর চোখ তুলে তাকালেন। ফর্সা ঋজু দেহ। মাথায় অল্প চুল, সবই সাদা। উন্নত কপাল, খাড়া নাক আর দুখানি অন্তর্ভেদী চোখ। পরনে গেরুয়া ধুতি আর চাদর, গলায় একগাছা রুদ্রাক্ষমালা। অর্জুনের মনে হল একবার যেন মেপে নিলেন দুজনকে। তারপর স্মিত হেসে বললেন, 'আসুন, গরিবের ঘরে স্বাগত। কী সাহায্য করতে পারি বলুন।'

বাকিরা ঠাকুরমশাইয়ের ইশারায় উঠে পড়ল। অর্জুন আর মৈত্রমশাইয়ের জন্য চেয়ার এল ভেতর থেকে। দুজনেই ভটচাজমশাইকে প্রণাম করে চেয়ারে বসলেন, নিজেদের পরিচয় দিলেন। মৈত্রমশাই বললেন, 'বলুন, কী সেবা করতে পারি?'

মৈত্রমশাই বললেন, 'আমরা দুজনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমার এই সঙ্গীর নাম অর্জুন সেনগুপ্ত, থাকেন বম্বেতে। ইনি পেশায় ডকুমেন্টারি ছবি বানান। অর্জুনবাবু ঠিক করেছেন তন্ত্র নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি বানাবেন। তাই আপনার কাছে আসা। প্রধান উদ্দেশ্য তন্ত্র কী সেই সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য

এই ছবির ব্যাপারে যদি কোনও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ করে দেখাতে পারেন তো সেটা ইনি নিজের ক্যামেরায় বন্দি করতে পারেন।'

ভটচাজমশাই কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তারপর বললেন, 'তন্ত্র হচ্ছে পৃথিবীর আদিতম ধর্ম। প্রকৃতি মা যে ধর্ম নিজে মানবসভ্যতাকে শিখিয়েছেন, তাকেই আমরা ইংরেজিতে পেগান ধর্ম বলি। আর ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক আত্মা সেই প্রাকৃতধর্মকে আরও পরিশোধিত করে, আরও উন্নত করে তার নাম দিয়েছে তন্ত্র।

তন্ত্র শব্দের সাধারণ অর্থ জ্ঞানের বিস্তারসাধন করা, 'তনোতি বিস্তারং করোতি', অথবা তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানং অনেন ইতি তন্ত্রম। অথবা তনোতি বিপুলং অর্থং তন্ত্র-তত্ত্ব-সমন্বিতম এনঞ্চ কুরুতে যস্মাৎ তন্ত্রং ইত্যভিধীয়তে।' তন্ত্র তাই কোনও ধর্ম নয়, তন্ত্র একটি আচরণবিধি। সংসার ধর্ম ত্যাগ করে তবে পরমার্থ পাওয়ার সাধনা তন্ত্র স্বীকার করে না। তন্ত্র বাস্তববাদী। বস্তুতন্ত্রকে স্বীকার করে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তন্ত্রের সাধনবিধি তৈরি হয়েছে। তাই তন্ত্রের মধ্যে দার্শনিক মতবাদ থাকলেও তা বড় কথা নয়। এখানে মূলত মানবদেহকে যন্ত্রস্বরূপ করে কতগুলি গুহ্য সাধনপদ্ধতির সন্নিবেশ ঘটে থাকে, যে পদ্ধতি আদতে সাধনশাস্ত্র ও শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভের পথে দিশারী।'

অর্জুন প্রশ্ন করল, 'এই তন্ত্রসাধনার ইতিহাস কত পুরনো?'

'ওই যে বললাম, যবে থেকে মানবসভ্যতা শুরু হয়েছে, তবে থেকে তন্ত্রের উৎপত্তি। অথর্ববেদেই রহস্যমার্গ সাধনপদ্ধতির উল্লেখ আছে। আর তন্ত্রের প্রধান ধারাই তো মাতৃকাসাধনা। যে মাতৃকাসাধনার ধারা তুরস্ক, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ইজিপ্ট, চীন সর্বদেশেই ব্যাপৃত ছিল। তবে ভারতবর্ষে মাতৃকাউপাসনার যেমন প্রকাশ, তেমনটা আর কোথাও দেখা যায় না। এ আমাদের দেশের জলহাওয়ার গুণ বলতে পারেন।'

অর্জুন একটু ইতস্তত করে বলল, 'তন্ত্রে অনেক অদ্ভুত রিচুয়ালসের কথা শোনা যায়। যার অনেকগুলোই মানে ইয়ে., শুনলে ভালো লাগে এমন নয়। এ নিয়ে কিছু বলবেন?'

ভটচাজমশাই একটা রহস্যময় হাসি হাসলেন। 'তন্ত্রের পথ সহজ পথ নয় সেনগুপ্ত সাহেব। কথায় বলে বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে কালকেউটের মাথা চেপে ধরার সাহস যদি থাকে, তবেই এই পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই পথ রহস্যমার্গ। কুণ্ডলিনীতত্ত্ব, শরীরজ্ঞান, পঞ্চ ম'কার সাধনা, বীরসাধনা, চক্রানুষ্ঠান, মন্ত্রসিদ্ধি এসবের অধিকারী হওয়া মুখের কথা নয়। গুরুর আদেশ ছাড়া এ পথে অগ্রসর হওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তন্ত্রে বলে তনুকে যা ত্রাণ করে তাই তন্ত্র। আমরা বলি যা নেই এই দেহভাণ্ডে, তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে। এই দেহসাধনার পথ ধরে নির্বাণে উত্তরণ, এই হচ্ছে তন্ত্রের মূলকথা। দুঃখের কথা হচ্ছে নিম্নশ্রেণীর সাধকেরা অনেক ঘৃণ্য পথ আশ্রয় করে লোকের ক্ষতি করার জন্য। তাতে তন্ত্রের নামের থেকে বদনাম হয় বেশি।'

মৈত্রমশাই বললেন, 'আপনি ষটকর্মের কথা বলছেন কি?'

'সে তো বটেই। মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, ও স্বস্ত্যয়ন, এই হচ্ছে কৃষ্ণষটকর্ম। এতে লোকের ক্ষতি তো হয়ই। যারা এই ষটকর্ম করে তাদেরও খারাপ বই ভালো হয় না। আর এসব কুপ্রথাকেই লোকে তন্ত্র বলে মেনে নিয়েছে।'

'কিন্তু এই ষটকর্ম ছাড়া আরও তো অনেক ভয়ঙ্কর প্রথা আছে তন্ত্রে। যেমন ধরুন বলিদান প্রথা।'

'বলিদান প্রথা শুধু তন্ত্রে আছে বলছেন কেন? দেবতার উদ্দেশ্যে পশু বলি, এ তো যে কোনও ধর্মেই আছে। ধর্মের ইতিহাসে পশুবলির ধারা অতি প্রাচীন। এই প্রথা ইসলামে আছে, খ্রিস্টান ধর্মে আছে, ইহুদিদের মধ্যেও পশু উৎসর্গের প্রথা আছে। ভারতেও বৈদিক যাগযজ্ঞের অন্যতম অংশই ছিল পশুবলি।

যে কোনও তান্ত্রিক সাধনায়, বা মাতৃপূজায় বলি আবশ্যক। বলির রক্তে দেবী প্রীত হন। শাস্ত্রে বলে 'পশুঘাত পূর্বক রক্তশীর্ষয়োর্বলিত্বং। স্থানে নিয়োজয়েদ্রক্তং শিরশ্চ সপ্রদীপকম্। এবং দত্বা বলিং পূর্ণং ফলং প্রাপ্নোতি সাধকঃ।' অর্থাৎ পশু হনন করে তার রক্ত ও মুণ্ড উপহার দিতে হয়। কারণ বিধি আছে, হত পশুর রুধির ও মুণ্ড প্রদীপের সঙ্গে যথাস্থানে

স্থাপন করবে। সাধক এইভাবে বলি প্রদান করলে পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়।'

অর্জুন বলল, 'আমরা অনেক সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নরবলিরও খবর পাই। শোনা যায় সেসব নাকি বিভিন্ন তান্ত্রিকদের উসকানিতেই হয়েছে। তন্ত্রে কি সত্যিই নরবলির বিধান আছে?'

উসকানি শব্দটা শুনে ভটচাজমশাই বোধহয় কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হলেন। গম্ভীরস্বরে বললেন, 'দেখুন, নরবলি দেশের আইনে নিষিদ্ধ, তাই তাতে প্রশ্রয় দেওয়া আইনের চোখে অপরাধ তো বটেই। তবে নরবলির ইতিহাস সুপ্রাচীন। এ নিয়ে লম্বা আলোচনা করতে পারি। তবে আপনাদের মনে হয় সে সময় নেই। বেদেও নরবলির ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। আর তন্ত্রের কথা যদি বলেন, তবে বলি, হ্যাঁ, তন্ত্রের নরবলির বিধান আছে। দেবীর সামনে কী কী বলি দেওয়া যায় কালিকাপুরাণে তার লম্বা তালিকা আছে। সবধরনের পাখি, কচ্ছপ, কুমির, শুয়োর, ছাগল, মোষ, গোসাপ থেকে শুরু করে মানুষ অবধি। শাস্ত্রে নরবলিকে বলে অতিবলি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলছে দুর্গাদেবী মেষ বা কুষ্মাণ্ডে একবছর, ছাগল বা কৃষ্ণসার মৃগে দশ বছর, মহিষে শতবর্ষ এবং নরবলিতে সহস্র বছর প্রীত হয়ে থাকেন।'

মৈত্রমশাই মৃদুস্বরে বললেন, 'কিন্তু ভটচায্যিমশাই, বেদে কিন্তু নরবলি হত না। বৈদিকযুগে নরবলি ছিল প্রতীকী। বধ্য পুরুষকে যজ্ঞস্থলে এনে পর্যাগ্নিকরণ নামের একটা অনুষ্ঠান, যাতে বধ্যমানুষটির গলায় যজ্ঞাগ্নি ছুঁইয়ে দেওয়া হয়, করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হত। আপনি তো তন্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ, সত্যি করে বলুন তো, মা কি কখনও তাঁর সন্তানের বলি চাইতে পারেন? আপনি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কথা তুললেন। ওই পুরাণেই তো এই কথাও আছে, 'বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র দুর্গা প্রীতি ভবেন্নৃণাং। হিংসাজন্যঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ।' অর্থাৎ বলিদান দ্বারা দুর্গাদেবী প্রীত হন বটে, কিন্তু সেই কার্যে মনুষ্যগণ হিংসাজনিত পাপও অর্জন করে।'

ভট্টাচার্যমশাই দৃশ্যতই অপ্রসন্ন হলেন, বললেন,'তাহলে আপনার কী মত? তান্ত্রিক পূজায় বলিবিধির কী উদ্দেশ্য?'

মৈত্রমশাই বললেন, 'আপনি কালিকাপুরাণের কথা তুললেন।

কালিকাপুরাণেরই সদাচার অধ্যায়ে আছে, রাজা হোম দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধ ও দান দ্বারা পিতৃগণের এবং বলিদান দ্বারা ভূতগণের পূজা করবেন। দেবীপুরাণেও বলছে শিবা ও নাগগণের বলি পায়স, পিতৃ ও দেবগণের বলি তিলমিশ্রিত অন্ন, যক্ষগণের বলি ঘৃত ও মধু, দেবীগণের বলি মোদক এবং দৈত্যদের বলি মৎস্য ও মাংস। ওই একই পুরাণে আছে দেবদেবীদের পূজা ধূপদীপ ও হোম ইত্যাদির মাধ্যমে করবে, পিশাচ, দানব ও রাক্ষসদের পূজা মদ্যমাংস দ্বারা করবে। আরও শুনুন, দেবীপুরাণেই আছে, নবমীতে অজ মেষ মহিষাদি পশু বধ করে ভূত ও বেতালদের বলি উপহার দিতে হয়। যদি শাস্ত্রের কথাই তুললেন ভট্টাচার্যমশাই, তাহলে বলতে হয় বলিপ্রথা দেবীর ভূতানুচরদের তৃপ্ত করার জন্য। যিনি সর্বপ্রেমময়ী স্নেহময়ী জগন্মাতা, তাঁর বলির রক্তে বিন্দুমাত্র রুচি নেই।'

ভট্টাচার্যমশাই বড় অর্থপূর্ণ হাসলেন। বললেন, 'লোকে রক্তলোলজিহ্বা, অতিবিস্তারদশনা, মহাঘোরা, মহাভয়ঙ্করী মায়ের পূজা করে কেন মৈত্রমশাই? কামার্থে ক্রিয়তে ধর্ম। কোনও কিছু কাম্যবস্তুর জন্যই তো মায়ের আরাধনা করি আমরা। তাছাড়া শাস্ত্রেই যখন বলির বিধান আছে...'

মৈত্রমশাই বললেন, 'কিন্তু ভটচাজমশাই, বৃহস্পতিঠাকুর স্বয়ং আজ্ঞা করেছেন, 'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে।' কেবল শাস্ত্রের কথায় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া কর্তব্য নয়। বিচার যদি যুক্তিহীন হয়, তবে তাতে ধর্মহানি হয়ে থাকে।'

ভট্টাচার্যমশাই কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইলেন। তারপর যখন তিনি মাথা তুললেন তখন তাঁর চোখ ঈষৎ ঘোলাটে হয়ে এসেছে। তিনি সামান্য শ্লেষ্মাজড়িতস্বরে বললেন, 'শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে করে থাকে মৈত্রমশাই। সে তর্কে আমাদের কাজ নেই। কথায় বলে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। আপাতত আপনারা যে কাজে আমার কাছে এসেছেন তার কারণ বলুন।'

অর্জুন বলল, 'এই যে বিভিন্ন তান্ত্রিক রিচুয়ালসের আপনি নাম বললেন, তার কোনও একটা আমাদের সামনে পারফর্ম করতে পারবেন? আমাদের মানে ক্যামেরার সামনে। আমরা দেশের বিভিন্ন তান্ত্রিক

ক্রিয়াকলাপের ওপর একটা ডকুমেন্টারি করছি। তাই জন্যই আপনার কাছে আসা। এর জন্য দরকার হলে উপযুক্ত সাম্মানিক দিতেও রাজি আছি।'

মৈত্রমশাইয়ের মনে হল কালিকিঙ্কর ভট্টাচার্য'র চোখ দুটো একবার দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল। তিনি গম্ভীরমুখে বললেন, 'আমরা নাচিয়ে বা গাইয়ে নই মিস্টার সেনগুপ্ত যে দুটো পয়সার বিনিময়ে আমাদের বিদ্যে নিয়ে ক্যামেরার সামনে পারফর্ম করব। তন্ত্র লোকসমক্ষে দেখাবার জিনিস নয়, নিভৃতে অনুশীলনের জিনিস। আমি দুঃখিত, আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না। তবে তন্ত্র কী এবং কেন এই নিয়ে যদি আমার মন্তব্য ক্যামেরাবন্দী করতে চান তাহলে অবশ্যই পারেন। তার জন্য কোনও টাকা লাগবে না।'

অর্জুন অপ্রস্তুত হল। বিব্রতস্বরে বলল, 'কিছু মনে করবেন না প্লিজ। কথাটা আমার ওভাবে বলা উচিত হয়নি। আসলে আমি আমার ডকুমেন্টারির উদ্দেশ্য নিয়ে বলছিলাম। ঠিক আছে, আপনি যদি তন্ত্রের ব্যাপারে একটা প্রাথমিক আইডিয়া দেন তাতেও আমাদের অনেকটা উপকার হবে। কবে পারবেন জানাবেন কাইন্ডলি। আমরা কাল অবধি শিলিগুড়ির হোটেল ডলি ইন-এ আছি, পরশু দার্জিলিংয়ের জন্য বেরোব। যদি কালকের মধ্যে না হয়, আমরা দার্জিলিং থেকে ফেরার পথেও আপনার ইন্টারভিউটা নিতে পারি।'

ভটচাজমশাই বললেন, 'আচ্ছা, আমি জানিয়ে দেব, কেমন? এখন আমার স্নান খাওয়ার সময়, আমাকে এবার উঠতে হবে।'

দুজনে উঠে আসার আগে মৈত্রমশাইয়ের দিকে ফিরলেন কালিকিঙ্কর, 'আপনার সঙ্গে একদিন আলাদা করে আলাপ করার ইচ্ছে রইল। আপনার দেহলক্ষণ বলছে আপনি কোনও সাধারণ মানুষ নন। খুব সম্ভবত কর্কট রাশি, কুম্ভ লগ্ন। চতুর্থে বৃহস্পতি, বুধাদিত্য যোগ আছে। নবমে শনি। কি, ঠিক বলছি তো মৈত্রমশাই?'

মৈত্রমশাই কিছু বললেন না। অল্প হেসে নমস্কার করে বললেন, 'দেখা হবে ভটচাজমশাই। আপাতত আসি।'

* * *

অন্ধকার ঘরে অস্থির পায়ে পায়চারি করছিলেন কালিকিঙ্কর ঠাকুর। কোনায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। নিভু নিভু হয়ে এসেছে তার আলো। ঘরের মধ্যে জমাট অন্ধকার ঘাপটি মেরে বসে আছে, সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে।

দুজন বলশালী লোক দরজার দুদিকে নিশ্চল নিস্তব্ধ দাঁড়িয়েছিল। তাদের নির্বিকার মুখে কোনও ভাব খেলছিল না। কিন্তু শরীরের পেশির টানটান ভাব বুঝিয়ে দিচ্ছিল প্রভুর যে কোনও আদেশ পালন করতে তাদের শরীর আর মন উদগ্রীব হয়ে আছে।

লোকটা খানিক পর পায়চারি থামিয়ে বলল, 'বীরবাহাদুর আর ওর মেয়ে কোথায়?'

একজন উত্তর করল, 'আমাদের কাছেই আছে ঠাকুর। আপনার ওষুধ খাইয়ে রেখেছি। দুজনেই ঘুমোচ্ছে।'

লোকটা আবার পায়চারি করতে লাগল। তারপর অন্যমনস্ক স্বরে বলল, 'ভালো না, লক্ষণ ভালো না।'

'কী ভালো না ঠাকুর?'

'কাল অমাবস্যা। কালই বলিদানের প্রকৃষ্ট সময়। তিথি নক্ষত্র সব অনুকূল, এমন সুযোগ হয়তো হাজার বছরে একবার আসে। আর আজই ওকে এখানে আসতে হল?'

'কার কথা বলছেন ঠাকুর?'

হ্যারিকেন-এর নিভু নিভু আলোয় কালিকিঙ্কর ভট্টাচার্য'র মুখটা নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। তিনি দাঁতে দাঁত চিপে বললেন, 'ওই যে কলকাতা থেকে এসেছে, কী এক মৈত্র। ও যদি এখানে থাকে তাহলে আমাদের সমস্ত কাজ ভণ্ডুল করে দিতে পারে।'

একজন ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ও জানবেই বা কী করে আমরা কী করতে চলেছি? আর যদি জানেও বা, ভণ্ডুল করতে যাবেই বা কেন?'

'পারে পারে, ও সব পারে। আমি দেহলক্ষণ চিনি। ও অতি উচ্চমার্গের

সাধক, কোটিতে একজন এমন হয়। আজ আমরা যা করতে চলেছি তা এর আগে কেউ করেনি। জেনে রাখো, যে কোনও বড় মাপের চিন্তা বা উদ্যোগের একটা স্পন্দন হয়। মহাজাগতিক স্পন্দন। সবাই সেই স্পন্দন টের পায় না। যারা পায় তারা ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে। ও সেই মানুষ। ও চাইলে আমাদের সব উদ্যোগ পণ্ড করে দিতে পারে। ওকে আটকাতে হবে।'

'কিন্তু ঠাকুর, উনি যদি আমাদের কাজে কোনও বাধা না দেন, তাহলে তো আটকাবার প্রশ্ন ওঠে না।'

'না না না,' অস্থির হয়ে ওঠেন কালিকিঙ্কর ঠাকুর, 'কোনও ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। আমরা আমাদের সাধনার শেষ চরণে এসে পৌঁছেছি। এ সুযোগ এ জীবনে আর আসবে না। এখন যদি বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে তাহলে আমাদের এতদিনের স্বপ্ন, সাধনা, চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

'তাহলে উপায়?'

অনেকক্ষণ চুপ থাকেন কালিকিঙ্কর ঠাকুর। তারপর ধীরস্বরে বলেন, 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে, বুঝলি। যে উদ্দেশ্যে ওরা আমার কাছে এসেছিল, সে উদ্দেশ্য আমি সফল করব। আর সেটাই হবে ওস্তাদের মার।

তোরা এক কাজ কর। কাল সকালে তোরা যে হোটেলে ওরা উঠেছে ওখানে চলে যা। ওই যে সেনগুপ্ত নামের সিনেমা করিয়ে লোকটা ছিল, মৈত্র'র চোখের আড়ালে তার সঙ্গে দেখা কর। খেয়াল রাখবি, ও যেন সম্পূর্ণ একা থাকে তখন। সেনগুপ্ত'র সঙ্গে ফোনে আমার কথা বলা। বাকিটা আমি দেখছি। আর কাল রাতের ব্যবস্থা যেন নিখুঁত হয়। সেদিকে লক্ষ্য রাখিস। বিন্দুমাত্র ত্রুটি যেন না হয়।'

দুজনে কোনও কথা বলল না। ঠাকুরকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল। কালিকিঙ্কর ঠাকুর ভ্রু কুঁচকে বসে রইলেন।'

* * *

রিসেপশন থেকে ফোন পেয়ে অবাক হল অর্জুন। এখানে তাকে কেউ চেনে না। তার সঙ্গে দেখা করতে কারা এল? দেখা করাটা কি উচিত হবে?

কাল রাতে মৈত্রমশাই যে কাণ্ডটা করেছেন তাতে বেশ হকচকিয়ে গেছিল অর্জুন। নাগরাকাটা থেকে ফেরত আসার সময় অর্জুনের জন্মসময় আর জন্মস্থান জেনে নিয়েছিলেন মৈত্রমশাই। তারপর রাতের খাওয়াদাওয়া করে অর্জুন ঘুমোবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় মৈত্রমশাই ইন্টারকমে অর্জুনকে ফোন করে বললেন, 'একবার আমার ঘরে আসতে পারবেন?'

মৈত্রমশাইয়ের ঘরে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল অর্জুন। ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। চুল উস্কোখুস্কো। অথচ সন্ধেবেলাতেই তো সব ঠিক ছিল। এই ক'ঘণ্টার মধ্যে কী হল ভদ্রলোকের?

অর্জুন ঘরে ঢোকামাত্র প্রায় দৌড়েই এলেন কে এন মৈত্র। অর্জুনের হাত ধরে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'একটা কথা বলি সাহেব, কাল যাই হোক, কোনও পরিস্থিতিতেই ঘরের বাইরে বেরোবেন না। চন্দ্র সূর্য এদিক ওদিক হয়ে গেলেও না। আমার কথা যদি না শোনেন তাহলে মহা অনর্থ হয়ে যাবে।'

অর্জুন হতভম্বের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখল। সারা খাট জুড়ে খাতার পাতা ছড়িয়ে আছে। তাতে কোষ্ঠীছক আঁকা আর জ্যোতিষ গণনা করা।

অর্জুন অবাক হয়ে বলল, 'কীসের কী অনর্থের কথা বলছেন মিস্টার মৈত্র? ঘর থেকে বেরব নাই বা কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মৈত্রমশাই ফিসফিস করে বললেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই আমার একটা সন্দেহ হচ্ছিল মিস্টার সেনগুপ্ত। আমি সর্বনাশের গন্ধ পাই সাহেব, মৃত্যুর গন্ধ পাই। সেই আসন্ন মহাসর্বনাশ আপনার শিরে সর্পাঘাত করার জন্য উদ্যত হয়েছে। তাই আপনার জন্মসময় আর জন্মস্থান নিলাম। সারা রাত ধরে আপনার ছক দেখেছি সাহেব। আপনার জীবনে একটা ঝড় আসতে চলেছে, মস্ত বড় ঝড়, যা আপনার জীবন তছনছ করে দেবে। আর সেই ঝড় আসবে এক অতি ভয়ঙ্কর কালরাত্রির রূপ ধরে।

আমার গণনা বলছে কালকের রাতই সেই কালরাত্রি। কাল দয়া করে আপনি এই হোটেলের বাইরে বেরোবেন না, আমার অনুরোধ। আমি

যাচ্ছি একটা বিশেষ ব্যক্তিগত কাজে, আমাকে যেতেই হবে, উপায় নেই। পরশু সকালের আগে আমি ফিরব না। কিন্তু দোহাই আপনার, পৃথিবী এদিক থেকে ওদিক হয়ে যাক, আপনি কিন্তু হোটেলের রুমের বাইরে পা রাখবেন না।'

অর্জুন বিস্মিত হয়ে গেল। অবাক স্বরে বলল, 'কী বলছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কাল রাতে আমার সর্বনাশ হবে? আপনি নিশ্চিত? আমার ভবিষ্যৎ এত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন? কে আপনি? এত ক্ষমতা পেলেন কোথা থেকে?'

কথাটা শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন মৈত্রমশাই, 'শুনুন সেনগুপ্ত সাহেব, আমার নাম কৃষ্ণানন্দ মৈত্র। আমি আগমশাস্ত্রে কিছু অধিকার রাখি, তাই আমার একটা অন্য উপাধিও আছে, আগমবাগীশ। লোকে ডাকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। মা চিদানন্দময়ী আনন্দস্বরূপিণীর দীন সন্তান আমি। কিন্তু জগন্মাতা মহামায়া আমাকে কিছু বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন। তন্ত্রশাস্ত্র আমার অধিগত বিদ্যা সাহেব, চন্দ্র সূর্য এদিক-ওদিক হতে পারে, কিন্তু আমার গণনা আজ অবধি মিথ্যা হতে দেখিনি। আমার কথা শুনুন। এই এখন থেকে পরশু সকালে আমি ফিরে আসা না পর্যন্ত ঘরের বাইরে বেরোবেন না। এর যেন অন্যথা না হয়।'

* * *

লোকদুটোর সঙ্গে কথা বলে অর্জুন দোলাচলে ভুগছিল, বেরোনো উচিত নাকি উচিত নয়? লোকদুটো তার ঘরেই বসে আছে। মনে হচ্ছে তাকে না নিয়ে বেরোবে না। অবশ্য তারা যে প্রস্তাবটা এনেছে তা অর্জুনকে ঘর থেকে বার করার জন্য যথেষ্ট। এর জন্যেই তো এতদূর এসেছে সে।

লোকদুটো এসে বিনা বাক্যব্যয়ে নিজেদের মোবাইল থেকে কাকে একটা কল করে ফোনটা ধরিয়ে দিয়েছিল অর্জুনকে, বলেছিল ঠাকুরমশাই কথা বলতে চান।

কালিকিঙ্কর ঠাকুর যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেটা শুনে অর্জুনের নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। উনি বলছিলেন যে সারা রাত ভেবে উনি

স্থির করেছেন তন্ত্রবিদ্যার আরও প্রসার এবং প্রচার আবশ্যক, যাতে লোকে আরও বেশি করে এর দিকে আকৃষ্ট হয়। আজ রাতের দিকে নাগরাকাটার শ্মশানে একটা গোপন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান আছে। সেনগুপ্ত সাহেব চাইলে সেখানে আসতে পারে, সব কর্মকাণ্ড ক্যামেরায় রেকর্ডও করতে পারেন। শর্ত একটাই, ওই মৈত্রমশাইকে সঙ্গে আনা যাবে না, এমনকি এ ব্যাপারে তাঁকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানানো যাবে না। সাহেব কি রাজি? তাহলে এই দুজন লোক তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

দ্বিধার সুতোয় দুলছিল অর্জুন। মৈত্রমশাই কাল অত করে বলেছেন ঘরের বাইরে না যেতে। এদিকে এত বড় সুযোগ ফসকে যেতে দেওয়াটাও ঠিক নয়। কী করবে সে? এসব ক্ষেত্রে সে সচরাচর রাধিকার সঙ্গে কনসাল্ট করে নেয় একবার। কিন্তু সকাল থেকে কোনও কারণে রাধিকার সঙ্গে ফোনে কানেক্ট হচ্ছে না।

দশটা নাগাদ সোফিয়ার ফোন এল। অর্জুন পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতেই সোফিয়া প্রায় লাফিয়ে উঠল। ধমকের সুরে বলল, 'এত বড় চান্স কেউ মিস করে? মিস্টার মৈত্রকে শুধু রিসার্চ করার জন্য রিটেন করেছি, অপারেশনসে মাথা গলাবার জন্য না। মনে রেখো অর্জুন, এই ডকুমেন্টারি ঠিকঠাক না দাঁড়ালে কিন্তু তোমার কেরিয়ার কোনদিকে মোড় নেবে বলতে পারব না।'

অর্জুন সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলল। চুলোয় যাক মৈত্রমশাইয়ের সতর্কবাণী। চাকরি বাঁচলে বাপের নাম। তার কেরিয়ার চৌপাট হয়ে গেলে কি ওই আগমবাগীশ এসে বাঁচাবে? শালা আগমবাগীশ না আগমগাম্বাট। ক্যামেরা আর রেকর্ডিং-এর জিনিসপত্র নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়ল সে। লাঞ্চটা না হয় রাস্তাতেই করে নেবে সে।

* * *

বীরবাহাদুর কিচ্ছু বুঝতে পারছিল না। জঙ্গলের বাইরে তাকে কোথায় ছেড়ে গেল ওরা? এটা কোন রাস্তা? একদিকে উঁচু উঁচু পাইনগাছের বন, অন্যদিকে গভীর খাদ। যেদিন তারা তাদের গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করেছিল

সেদিন কী তিথি ছিল যেন? আজ আকাশ পুরো অন্ধকার। নষ্ট যাওয়া ফ্যাকাসে আকাশের গায়ে কতগুলো মৃত তারা ধুঁকতে ধুঁকতে জ্বলছে। চারিদিকে হাওয়ার দল তাকে ঘিরে পাক খাচ্ছে আর ফিসফিস করে তার কানে বলে যাচ্ছে, 'ফেরবার পথ নেই, পথ নেই।'

এই কদিন টানা ঘুমিয়েছে সে। খাবার কম খেয়েছে, মদ বেশি। সেই মদে কি কিছু মেশানো ছিল? কে জানে! কেমন যেন অন্যরকম, ঝাঁজালো স্বাদ ছিল মদটার। এ ক'দিন কোন রাস্তা ধরে তারা এসেছে, কোথায় রাত কাটিয়েছে, কিছুই মনে নেই তার। কেমন যেন একটা ঝিমধরা ঘোরের মধ্যে কেটেছে তার এই ক'টা দিন।

আর গৌরী? গৌরীকে কোথায় নিয়ে গেল ওরা?

সেই ঝাঁজালো মদ আজও অনেকটা খেয়েছে বীরবাহাদুর। সঙ্গে বোধহয় আরও কিছু মেশানো ছিল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে তার। গলাটা শুকিয়ে গেছে। আরও একটু মদ পেলে হত এখন। টাকা তো কম পায়নি সে।

ওরা পৌঁছতেই ঘুমন্ত গৌরীকে ওরা নিয়ে গেল কোথায় যেন। তারপর ঠাকুর কী যেন বলল ওকে। মা ওকে অনেক আশীর্বাদ করবে, গৌরী এই জন্মেই মুক্ত হয়ে গেল, এইসব আগড়ম বাগড়ম। তারপর তাবিজের মতো কী যেন একটা হাতে ধরিয়ে দিল তার হাতে। বলেছে ছেলে জন্মালে তার গলায় পরিয়ে রাখতে, আর টাকাও দিয়েছে, অনেক টাকা। দেশে ফিরে এবার একটা খাবারের দোকান দেবে সে। বিদেশে বিভুঁইয়ে মেয়ে বউকে ছেড়ে থাকতে হবে না তাকে আর।

মেয়ে? মেয়ে কোথায় গেল তার? গৌরীকে কেন যেন সঙ্গে করে এনেছিল বীরবাহাদুর? মনে পড়ছে না তার। যেমন মনে পড়ছে না এই অন্ধকারে তাকে কেন এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে গেল ওরা।

গৌরী কোথায়? গৌরীকে ছাড়া কী করে দেশে ফিরবে বীরবাহাদুর? কী বলবে গৌরীর মা'কে?

অনেকক্ষণ থেকে বীরবাহাদুরের বুকের মধ্যে একটা কষ্ট দলা পাকাচ্ছিল। এবার সেটা উদগত কান্নার মতো বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। কোথায়

গেল তার মেয়ে, তার সোনার পুতলি? দুটো পয়সার লোভে আর ভয়ে কী করে বসল সে। সে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকল মেয়ের নাম ধরে, গৌরী, গৌরী রে, কোথায় গেলি মা, কোথায় গেলি তুই?

বেশিক্ষণ অবশ্য কাঁদতে হল না বীরবাহাদুরকে। একটু পরেই তার পিছনে ছায়ার মতো কতগুলো লোক এসে দাঁড়াল। তারা দেখল অন্ধকার আকাশের সামনে, অগণন মৃত তারাদের দিকে তাকিয়ে একটা লোক অল্প অল্প টলছে আর কী যেন বলতে বলতে হাউ হাউ করে কাঁদছে। অবশ্য বেশিক্ষণ আর সেই কষ্ট করতে হল না তাকে। কয়েকটা তাগড়া লাঠি নেমে এল বীরবাহাদুরের মাথায়। কষ্ট আর মায়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব মিটে গেল তার।

* * *

কালিকিঙ্করের লোকজন দাঁড়িয়েছিল বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে ওরাই অর্জুনকে নিয়ে এসেছিল ঠাকুরমশাইয়ের বাড়িতে। দুপুরের খাওয়াদাওয়াও ঠাকুরমশাইয়ের বাড়িতেই করল অর্জুন। বহুদিন বাদে খাঁটি বাঙালি খাবার খেতে অর্জুনের খারাপ লাগছিল না।

খাওয়ার পর ঠাকুরমশাই বসেছিলেন অর্জুনের সঙ্গে। বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছিলেন তন্ত্র কী, তার প্রকরণ এবং প্রয়োগ। তার সঙ্গেই তন্ত্রের ইতিহাস বিশদে জানিয়েছিলেন তিনি।

তন্ত্রের খুঁটিনাটি নিয়ে ঠাকুরমশাইয়ের প্রভূত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে গেছিল অর্জুন। পুরো সাক্ষাৎকারটাই রেকর্ড করেছে সে। এ জিনিস এডিট করার পর সাবটাইটেল-সহ যে কী দাঁড়াবে সে ভাবতেও রোমাঞ্চিত হচ্ছিল সে। নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল অর্জুন। ভাগ্যিস মৈত্রমশাইয়ের কথা শোনেনি সে। নইলে এই জিনিস পাক্কা মিস হয়ে যেত তার।

বিকেলের দিকে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিল অর্জুন। আসল কাজ রাত আটটার পর। ততক্ষণ পর্যন্ত একটু বিশ্রাম নেওয়া জরুরি।

অর্জুনের যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ রাত। রিস্টওয়াচে টাইম দেখল সে, রাত ন'টা বাজে। ধড়মড় করে উঠে বসল অর্জুন। ইশ, এতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে?

বাইরে আসতেই একজন ঘটিতে জল নিয়ে এল, 'মুখে চোখে একটু জল দিয়ে নিন বাবু। ঠাকুরমশাই আর বাকিরা সব জোগাড়যন্ত্র করতে গেছে। আপনি মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন, আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

অর্জুন তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে এসে দেখল লোকটা একটা বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুন আর দ্বিরুক্তি না করে বাইকে চেপে বসল। সঙ্গে রইল তার রেকর্ডিং-এর এর জিনিসপত্র।

বড় রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ যাওয়ার পরেই বাইকটা বাঁদিক বেঁকে একটা জঙ্গলের রাস্তা ধরল। বোঝা যায় যে এই রাস্তায় লোক যাতায়াত করে, পথের রেখা স্পষ্ট। মোটরবাইকের আওয়াজ আর হেডলাইটের আলো জঙ্গলের শান্ত পরিবেশ খানখান করে দিচ্ছিল।

দুধারের জঙ্গল ক্রমশ ঘন হয়ে আসতে লাগল। অর্জুন কখনও রাতের জঙ্গল দেখেনি। তার কেমন একটা অস্বস্তি হতে লাগলো। কেমন যেন একটা চোরা ভয়, একটা গা ছমছমে ভাব। মনে হচ্ছে সে যেন ক্রমেই একটা অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আর সেই সর্বগ্রাসী অন্ধকার তাকে যেন গিলে খাওয়ার জন্য ডাকছে, আয় আয় আয়..

একটু পরেই বাইকটা এসে একটা জায়গায় থামল। অর্জুন নেমে দেখল একটা খোলামেলা জায়গায় এসে পৌঁছেছে তারা। সামনের বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। একটু দূরে একটা নদীর মরা খাত। তার পাশে কয়েকটা ভাঙা কুঁড়েঘরের অবশেষ। নদীখাতের ওপারে জঙ্গল। তবে এপারেও গাছপালা কম নয়। ওই ফাঁকা জায়গাটার মধ্যেই অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করে রেখেছে ঠাকুরের লোকজন। একটু পরে কেউ একজন এসে দূরে দূরে কয়েকটা মশাল পুঁতে দিয়ে গেল। সেই আলোয় এবার চারিদিক সামান্য স্পষ্ট হল।

অর্জুনের মনে হল এটা বোধহয় কোনও পরিত্যক্ত গ্রাম্য শ্মশান।



চারিদিকে ইতিউতি উঁচু হয়ে আছে শব জ্বালানোর বেদি। কুঁড়েঘরগুলোতে বোধহয় শ্মশানযাত্রীরা এসে থাকত।

এর একদম মাঝখানে একটি মাটির উঁচু বেদি মতো করা আছে। আপাতত সেইটেকে বোধহয় একটা একটা পুজোর আসন করা হয়েছে। কারণ তার সামনে বেশ কিছু পুজোর উপকরণ রাখা... কয়েকজন ছায়ার মানুষ যন্ত্রের মতো নিজেদের কাজ করে চলেছে। অর্জুন অনুমান করল ওরা ঠাকুরের লোক।

একটু পর বেদির একপ্রান্তে একজন একটি দেবীমূর্তি এনে রাখল। অর্জুন নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। মূর্তিটাকে দেখে কীসের আকর্ষণে যেন হাতের কাজ থামিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে।

মূর্তিটা ভারী অদ্ভুত। আর শুধু অদ্ভুত নয়, মূর্তিটাকে দেখে রীতিমতো অস্বস্তি হতে শুরু করল তার। এমন ভীতিপ্রদ ভয়ঙ্করদর্শন মূর্তি জীবনে দ্বিতীয়টি দেখেনি সে। সারা শরীর অস্থিসার কঙ্কালের মতো, মুখটা একটা করোটি বই আর কিছু নয়। মূর্তির ছ'টা হাত, তাতে কী সব যেন ধরা। আর সবচেয়ে ভয় লাগে মূর্তিটার চোখের দিকে তাকালে। মনে হয় এক আদিম অপার শূন্যতা যেন গিলে খাবে। আর সেই অতলগ্রাসী দৃষ্টি নিয়ে সেই মূর্তি যেন একাগ্রচিত্তে অর্জুনের দিকেই তাকিয়ে আছে।

ঝট করে চোখ নামিয়ে নিল অর্জুন। ওদিকে আর তাকাল না সে। বাপ রে, এমন ভয়ঙ্করদর্শন দেবীমূর্তি জীবনে দ্বিতীয়টি দেখেনি সে। থাক, ওদিকে আর তাকাবে না সে। নিজের কাজেই মনোনিবেশ করা যাক না হয়।

আধঘণ্টা পর অর্জুন যখন উঠে দাঁড়াল তখন সব কিছু সেট করে ফেলেছে সে। ক্যামেরাটা এমন জায়গায় রেখেছে যেখান থেকে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। মাইকটাও ঠিকঠাক জায়গায় প্লেস করা। আলোর অবশ্য কোনও ব্যবস্থা নেই, ঠাকুরের বারণ আছে। তবে অর্জুনের ক্যামেরায় নাইট ভিশনের ব্যবস্থা আছে, অসুবিধা হবে না।

চারিদিকে তাকিয়ে একটু অবাক হল অর্জুন। ঠাকুরের লোকজন কেউ আর নেই চারিপাশে। শুধু আছে সে, আর আছে শবদাহবেদির ওপর ওই ভয়ঙ্করদর্শন মূর্তি। আর তার ঠিক অন্যদিকে একটা হাড়িকাঠ। এটা যে ঠাকুরের লোকেরা কখন পুঁতে দিয়ে গেছে সেটা খেয়াল করেনি সে।

একটু পরে কালিকিঙ্কর ঠাকুর এলেন। পরনে লাল টকটকে ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। কাঁধে একটি ঝোলা, গলায় ঝুলছে রুদ্রাক্ষের মালা। এই শীতেও এ ছাড়া আর কিছু পরেননি তিনি। সঙ্গে একজন সেবক। সেও একই পোশাকে সজ্জিত।

ঠাকুরের সঙ্গে আসা অনুচরটি দেখিয়ে দিল অর্জুন কোথায় বসে আছে। ঠাকুর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন অর্জুনের দিকে। একটিও কথা বললেন না। সঙ্গে থাকা ঝোলা থেকে একটি নরকরোটি বার করলেন তিনি। তারপর তাতে একটি তরল ঢেলে অর্জুনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সংক্ষিপ্ত আদেশ করলেন, 'খাও।'

অর্জুন খুব শক্ত মনের মানুষ। তাকে আদেশ দিয়ে কাজ করাতে পারে এমন লোক কমই আছে। কিন্তু এই অতিপ্রাকৃত পরিবেশে সেও কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল। বিনা বাক্যব্যয়ে সেই নরকরোটিতে ঢেলে ঘনকৃষ্ণ ঝাঁজালো তরলটি গলাধঃকরণ করে নিল সে।

তারপর ঠাকুরমশাই ফিরে গিয়ে পুজোয় বসলেন। বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে পুজোপচার অর্পিত হতে থাকল সেই দেবীমূর্তির চরণে। অর্জুন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রতিটি ফ্রেম তুলে রাখতে লাগল তার ক্যামেরায়। নাইট ভিশন ক্যামেরায় বন্দি হতে লাগল একের পর এক দৃশ্য।

আস্তে আস্তে অর্জুন বুঝতে পারছিল যে ক্রমশ সারা শরীরের ওপর থেকে তার নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে যেন যন্ত্রের মতো কাজ করছে। শরীর চলছে, কিন্তু সে শরীর পুরোপুরি তার ইচ্ছাধীন নয়। তার চৈতন্য, বুদ্ধি, উচিত অনুচিত বোধ সব যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে।

পূজাপাঠ শেষ হল। এবার সব চুপচাপ। মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেছে। গুগগুলের ক্ষীণ গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে জঙ্গলের বাতাসে। ঠাকুর ধ্যানস্থ। চারিদিকে জঙ্গলের রাতচরা পাখিদের টীটীইই ডাক থেমে গেছে। বাতাস

যেন বইতে বইতে হঠাৎ করেই অশক্ত বৃদ্ধের মতো নুইয়ে পড়েছে এই অঞ্চলে। বেদির ওপর ঠাকুর বজ্রাসনে বসে আছেন। নিভু নিভু মশালের আলো ছিটকে যাচ্ছে তাঁর ঘর্মাক্ত শরীর থেকে।

অর্জুন অসাড় নিবিষ্ট মনে সব রেকর্ড করে যাচ্ছিল। একটু পর তার ক্যামেরার এক কোনায় কিছু চাঞ্চল্য দেখা গেল। অর্জুন মনিটরে দেখল ঠাকুরের এক শাগরেদ, একটি অচৈতন্য মেয়েকে টানতে টানতে নিয়ে এল। মেয়েটি শিশু, সাত-আটের বেশি বয়েস হবে না।

ক্যামেরা চলছে। মনিটরে নাইট ভিশনে কিছু কালচে সবজেটে শরীর নাড়াচাড়া করছে। এবার আরও একজন এল স্ক্রিনে। দুজন এসে হাড়িকাঠে জুতে দিল মেয়েটাকে। তারপর তাদেরই একজন কালিকিঙ্কর ঠাকুরের হাতে একটা মস্ত খাঁড়া এনে দিল।

অর্জুনের বোধ সব নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। সে শুধু দেখে যাচ্ছে, কোনও ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষমতাও যেন লুপ্ত হয়ে গেছে তার। শুধু মাথার মধ্যে যেন একটা বোবা আর্তনাদ ফেটে পড়ছে। কে যেন চিৎকার করে বলছে যা হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না। অর্জুনের এক্ষুনি দৌড়ে যাওয়া উচিত মেয়েটার কাছে, সাহায্য করা উচিত। মেয়েটা সাঙ্ঘাতিক বিপদের মধ্যে আছে। কিছু করা উচিত তার এখনই।

কিন্তু না, তার সমগ্র অস্তিত্ব যেন অসাড় হয়ে আছে। কোনও বোধ নেই, সাড় নেই, চৈতন্য নেই, স্পন্দন নেই। তার হাত পা কাঁপছে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো। ঘামের স্রোত নেমেছে সারা শরীর জুড়ে। অথচ তার কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই। শুধু বিস্ফারিত চোখে সামনে যেটা ঘটছে সেটা দেখে যাওয়া ছাড়া।

মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে কালিকিঙ্কর বিশালকায় খাঁড়াটি মাথার ওপর তুললেন। তারপর সেটি সবেগে নামিয়ে আনলেন মেয়েটির গলার ওপর।

অর্জুন অজ্ঞান হয়ে গেল।

* * *

ঘুম ভাঙতেই চোখটা কুঁচকে গেল অর্জুনের। জানালার পর্দাটা অনেকটা সরে গেছে। ভোরের রোদ্দুর বল্লমের মতো আছড়ে পড়ছে তার চোখেমুখে।

তার সঙ্গে সেবক রোডের ব্যস্ত ট্রাফিকের কর্কশ শব্দ তো আছেই।

উঠে বসে চাদরটা গা থেকে সরিয়ে মাটিতে পা দুটো পা রাখল অর্জুন। তারপরেই বুঝতে পারল সারা শরীর অজানা ব্যথায় টাটিয়ে আছে তার। এমন নয় যে ব্যথাটা শরীরের কোনও বিশেষ জায়গায় হচ্ছে। কোনও মাসল পুল, হ্যাঁচকা টান, জয়েন্ট পেইন, এমন কিছুই নেই। অথচ সারা শরীর জুড়ে যেন একটা বিষাক্ত ভোঁতা কষ্ট জেগে আছে।

ধীরে ধীরে বাথরুমে গেল অর্জুন। ফ্রেশ হল। স্নান সারার পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। কই, সারা শরীরে তো কোনও দাগ বা কিছু নেই। তাহলে এই বিষব্যথা কেন?

দ্রুত চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল অর্জুন। এখন এই নিয়ে ভাবলে তার চলবে না। আজ তাদের দার্জিলিং যাওয়ার কথা। অভ্যস্ত হাতে জামাকাপড় পরল অর্জুন। তারপর ভাবল মৈত্রমশাইয়ের রুমে ইন্টারকম থেকে একটা ফোন করবে। মৈত্রমশাই ঘুম থেকে উঠেছেন?

মৈত্রমশাইয়ের নামটা মনে পড়তেই কে যেন একটা বিদ্যুতের চাবুক চালিয়ে দিল তার স্মৃতির মধ্যে। মৈত্রমশাইয়ের আজ সকালে ফেরার কথা না? তিনি কোথাও একটা গেছেন। আর তার আগে বলে গেছিলেন অর্জুন যেন হোটেলের বাইরে পা না রাখে।

আস্তে আস্তে অর্জুনের স্মৃতির পটে একটা একটা করে ঘটনার দানা ফুটে উঠতে লাগল। মৈত্রমশাইয়ের বারণ সত্ত্বেও কাল দুটো লোকের সঙ্গে হোটেলের বাইরে গেছিল সে। কোথায় যেন গেছিল অর্জুন? কাল কী যেন হয়েছিল তার? কী যেন দেখে ফেলেছিল সে যেটা তার দেখার কথা না?

মুহূর্তের মধ্যে ফ্লাডগেট খোলা বন্যার জলের মতো একরাশ কুৎসিত ভয়ঙ্কর দৃশ্য আছড়ে পড়ল তার মাথার মধ্যে। হাত পা থরথর করে কাঁপতে লাগল অর্জুনের। বলির ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার কথা মনে পড়তেই সমস্ত গা গুলিয়ে বমি উঠে এল তার মুখে।

বমি করে একটু সুস্থ হল অর্জুন। ঘরে এসে দেখল তার ক্যামেরা পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা আছে ঘরের কোণে। সেদিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল সে। যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য ওই ক্যামেরায় বন্দি হয়েছে তা ভাবতেও আর একবার থরথর করে কেঁপে উঠল সে। না, সেই দৃশ্য আর দ্বিতীয়বার কিছুতেই দেখতে পারবে না সে।

মৈত্রমশাই। একমাত্র মৈত্রমশাই-ই বাঁচাতে পারেন তাকে।

ঘরের দরজা একটানে খুলে মৈত্রমশাইয়ের রুমের দিকে ছুটে গেল সে।

কিন্তু মৈত্রমশাইয়ের ঘরের দরজা বন্ধ। ঘরে ফিরে এসে রিসেপশনে ফোন করল সে। ওরা বলল মিস্টার মৈত্র কাল রাতে ফেরেননি। ভদ্রলোক মোবাইল ব্যবহার করেন না। ফলে অন্যভাবেও যোগাযোগ করার উপায় নেই।

অর্জুন ফোন রাখার আগে রিসেপশনিস্ট জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন আছেন মিস্টার সেনগুপ্ত? সুস্থ বোধ করছেন তো?'

অর্জুন সতর্ক এবং বিস্মিতস্বরে প্রশ্ন করল, 'মানে?'

রিসেপশনিস্ট যা বলল তা এইরকম।

কাল গভীর রাতে তিন চারজন লোক এসে অচৈতন্য অর্জুনকে তার জিনিসপত্র-সহ হোটেলের রিসেপশনে পৌঁছে দিয়ে যায়। বলে অর্জুন নাকি অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার গা থেকেও মদের গন্ধ ছাড়ছিল। হোটেলের লোকজনই তাকে রুমে পৌঁছে দেয়। তাই রিসেপশনিস্ট তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিচ্ছে।

অর্জুন কিছু না বলে ফোনটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল। এরপর কী করবে সে? আরও একবার কালিকিঙ্কর ঠাকুরের কাছে যাবে? ওরা যদি অস্বীকার করে? তাছাড়া অর্জুন একা, ঠাকুরের লোকবল কম নয়।

তাহলে কি ও পুলিশে যাবে? কিন্তু পুলিশ তো প্রথমেই প্রমাণ দেখতে চাইবে।

কাঁপা কাঁপা হাতে ক্যামেরাটা হাতে তুলে নিল অর্জুন। আবার কপালে

বিড়বিড় করে ঘাম জমতে শুরু করেছে তার। বুকের ভেতর যেন হাতুড়ি পিটছে। হাতে সুইচ অন করল।

প্রথমে অন্ধকার স্ক্রিন ভেসে এলো। তারপর শুরু হল একটা একটানা বিশ্রী ক্যারক্যার শব্দ। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল অর্জুন। তারপর আবিষ্কার করল যে কিচ্ছু নেই। কোনও ভিডিও নেই। সব রেকর্ডিং উধাও।

ক্যামেরাটা বন্ধ করল অর্জুন। মাথার মধ্যে সব গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল তার। কাল রাতে কারা তাকে হোটেলে পৌঁছে দিল? নিশ্চয়ই ঠাকুরের লোক। তারাই ওই নরবলির দৃশ্য তার ক্যামেরা থেকে মুছে দিয়েছে নির্ঘাত। কিন্তু কেন?

এর একটাই উত্তর, এই জঘন্য অপকর্মের কোনও সাক্ষী রাখতে চায় না তারা।

অথচ তাই যদি হয়, তাহলে ওখানে অর্জুনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই ভয়ংকর দৃশ্যটা দেখাবার দরকারই বা কী ছিল?

ছটফট করছিল অর্জুন। মৈত্রমশাইয়ের আসার কোনও নামলক্ষণ নেই। কিন্তু অর্জুনের আর তর সইছে না। এই রহস্য তাকে ভেদ করতেই হবে।

এদিকে আবার আজই রাধিকাদের ফ্লাইটে বাগডোগরা এসে পৌঁছবার কথা। তারপর তারা তিনজন চলে যাবে দার্জিলিং। তার আগে মৈত্রমশাইয়ের সঙ্গে তার দেখা করা জরুরি, অত্যন্ত জরুরি।

অসহায়ভাবে ছটফট করতে করতে একবার ঘড়ি দেখল অর্জুন। হ্যাঁ, ফ্লাইট আধঘণ্টা আগেই ল্যান্ড করার কথা। কিন্তু রাধিকা ফোন করেনি কেন তাকে? এতক্ষণে তো ওদের চলে আসার কথা এখানে। ওরা এখনও এসে পৌঁছল না কেন?

রাধিকাকে ফোন করল অর্জুন।

রাধিকা ফোন তুলেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'তুমি কোথায় আছ অর্জুন? এক্ষুনি এয়ারপোর্টে এসো। এদিকে সাঙ্ঘাতিক বিপদ হয়ে গেছে।'

অর্জুন হতভম্ব হয়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে রাধিকা? এমন করছ কেন?'

রাধিকা ক্রমাগত ফোঁপাতে লাগল। তার জড়ানো গলার স্বর শুনে কিছু বোঝাই যায় না। ক্রমে ক্রমে তাকে শান্ত করে পুরো ঘটনাটা শুনল অর্জুন।

ফ্লাইট যখন কলকাতা থেকে ওড়ে তখন সব কিছু ঠিকঠাক ছিল। স্মুথ টেক অফ। শান্ত আবহাওয়া। নির্বিঘ্ন উড়ে যাওয়া। সব একদম ছবির মতো সুন্দর। নূপুর বসেছিল উইন্ডো সিটে, নিখিল মিড, রাধিকা আইল সিটে।

তখন ল্যান্ডিং হতে আর মিনিট পনেরো বাকি। আচমকাই প্লেনটা মিড এয়ারে সাঙ্ঘাতিক ভাবে নড়ে ওঠে। পাগলের মতো দুলতে থাকে ওপর-নীচে। ফ্লাইটের নিয়মিত যাত্রীরা এসবে অভ্যস্ত। তারা ভেবেছিল হয়তো এ কয়েক মিনিটের ব্যাপার, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর হঠাৎ করেই শুরু হয় ফ্রি ফল। এবার যাত্রীদের মধ্যে আর্তচিৎকার শুরু হয়ে যায়। ককপিট থেকে ক্যাপ্টেনের উত্তেজিত সতর্কবার্তা ভেসে আসে। যাত্রীদের তো বটেই, এমনকি ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টদেরও সিটবেল্ট লাগিয়ে বসতে বলা হয়। ততক্ষণে যাত্রীদের খাবার প্লেট, জলের বোতল সব এদিক-ওদিক উড়তে শুরু করেছে। বাচ্চাদের আর্তচিৎকার, বয়স্কদের কান্না আর ঈশ্বরের নাম নেওয়া, সব মিলিয়ে নরক গুলজার অবস্থা।

রাধিকাও ভয় পেয়েছিল বিলক্ষণ। এতদিন ধরে এত জায়গায় ফ্লাইটে করে যাতায়াত করেছে সে, ফ্লাইট টার্বুলেন্স কম দেখেনি। তবে আজকেরটা যেন সব কিছু ছাড়িয়ে। এমন উথালপাথাল করা সর্বনাশী টার্বুলেন্স রাধিকা কখনও দেখেনি তার জীবনে। তবে নিজের থেকেও তার চিন্তা ছিল নূপুর আর নিখিলকে নিয়ে। অতটুকু বাচ্চা, ওরা সামলাবে কী করে?

টার্বুলেন্স থামতে নেয় পাঁচমিনিট মতো। ততক্ষণে সব শান্ত হয়েছে। ফ্লাইটের চারিদিকে শুধু ঠাকুরের নাম আর ফোঁপানো কান্নার শব্দ। আর মিনিট দশেক পরেই ফ্লাইট বাগডোগরা ল্যান্ড করে।

আর তার পর থেকেই শুরু হয়েছে নাটক। নূপুর এতটাই ভয় পেয়ে গেছে যে ফ্লাইট ল্যান্ড করার পরেও কিছুতেই প্লেন থেকে নামতে চায়নি। চেঁচামেচি করে, সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে একাকার কাণ্ড করেছে। শেষে

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টদের সাহায্যে, লেডি পুলিশ ডেকে কোনওমতে তাকে নামানো হয়েছে। তারপরেও নূপুর অত্যন্ত অস্বাভাবিক আচরণ করছে। ওরা এখন এয়ারপোর্টের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে আছে। অর্জুন যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হোটেল ছেড়ে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে চলে আসে।

অর্জুনের এবার অন্য টেনশন শুরু হয়। নূপুর এমনিতে খুব সাহসী মেয়ে, আর অনেকবার ফ্লাইটে চড়েছে। এয়ার টার্বুলেন্স নতুন কিছু নয় ওর কাছে। হঠাৎ করে এই পাগলামি শুরু হল কেন?

তড়িঘড়ি নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল অর্জুন। আগে পরিবার, তারপর গতকালের রহস্য ভেদ করা যাবে না হয়। ছেলেমেয়েরা তার প্রাণ, তাদের কিছু হলে অর্জুনের মাথা খারাপ হয়ে যায়।

অর্জুন যখন চেক আউট করে বেরোচ্ছে, ঠিক তখনই মৈত্রমশাই হোটেলে ঢুকছিলেন। সারা শরীরে ক্লান্তির ছাপ। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। খুব অবিন্যস্ত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

অর্জুন তাঁকে কিছু বলার আগেই মৈত্রমশাই অর্জুনকে দেখে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর চোখেমুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। যেন হঠাৎ করেই ভয়াবহ কিছু একটা দেখে ফেলেছেন তিনি।

তিনি বলতে গেলেন, 'আপনি...আপনি কাল বেরিয়েছিলেন?'

কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই অর্জুন বলে উঠল, 'এদিকে বিশাল কাণ্ড হয়ে গেছে মিস্টার মৈত্র। আমাকে এক্ষুনি এয়ারপোর্টে যেতে হচ্ছে একটা এমার্জেন্সিতে। আপনাকে অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু এখন তার একদম সময় নেই। আমি আমার ফ্যামিলিকে পিক করে সোজা দার্জিলিং চলে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে আমি পরে যোগাযোগ করে নিচ্ছি।'

অর্জুন দেখতে পেল না তার চলে যাওয়ার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তাঁর চোখে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে ভয়, হতাশা আর আতঙ্ক।

* * *

এই নূপুরকে অর্জুন চেনে না। তার বড় স্নেহের সন্তান, চোখের মণি, যেন এই দুদিনেই সম্পূর্ণ পালটে গেছে। সারা রাস্তা একটাও কথা বলেনি

সে। বাড়িতে ঢুকেই একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই থেকে সে ঘরের বাইরে একবারও বেরোয়নি নূপুর। রাধিকা, অর্জুন অনেক চেষ্টা করেছিল নূপুরকে বার করার। কোনও ফল হয়নি। শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ শোনা গেছে। অর্জুন একবার জোর করে ঘরের দরজা ভাঙতে গেছিল। একটা অস্বাভাবিক জান্তব গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল নূপুর। সেই অস্বাভাবিক গর্জন শুনে থমকে গেছিল বাড়ির লোকজন।

কাল দুপুর থেকে দাঁতে কুটোটি কাটেনি নূপুর, এমনকি জল অবধি খায়নি সে। অর্জুন আর রাধিকা ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। এত অস্বাভাবিক আচরণ তো নূপুর করেনি কখনও।

সন্ধেবেলায় ক্লান্ত বিধ্বস্ত রাধিকা আর অর্জুন বাগানে বসে আলোচনা করছিল। অর্জুনের বাবা হাই ব্লাড প্রেশারের পেশেন্ট। তাঁকে বাড়ির দোতলায় ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। প্রাণের চেয়েও প্রিয় নাতনির এই অবস্থা তিনি আর দেখতে পারছিলেন না। অর্জুনের মা তাঁর দেখভাল করছিলেন। নিখিল তার ঠাম্মি দাদুর কাছেই ছিল। দিদির এই অবস্থা দেখে সেও খুব ভীত হয়ে পড়েছে।

অর্জুন বলছিল কোনও সাইকিয়াট্রিস্টকে ডেকে আনার কথা। রাধিকার মত হচ্ছে আজকের রাতটা দেখে নেওয়া।

ঠিক এই সময়ে এই বাংলোর কেয়ারটেকার জংবাহাদুর দৌড়ে এসে বলল, 'ছোটিমেম ঘর পে নেহি হ্যায় শা'ব। ঘর খালি হ্যায়। বাংলো মে কঁহি নেহি মিল রহি হ্যায়।'

রাধিকা আর অর্জুন ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে দাঁড়াল। অর্জুন বলল, 'তুমি জানলে কী করে?'

জংবাহাদুর উদ্বিগ্নস্বরে বলল, 'আমি ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম শা'ব। দেখি ছোটি মেমসাহেবের ঘর খোলা। গিয়ে আলো জ্বেলে দেখলাম ভিতরে কেউ নেই। তারপর অন্যান্য ঘর খুঁজে এলাম। তারপর পুরো বাংলো ওপর নীচে তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলাম। কোথাও নেই।'

দুজনে দ্রুত গিয়ে ঢুকল নূপুরের ঘরে। ঘর ফাঁকা। তারপর একের পর

এক অন্যান্য ঘর খোঁজা শুরু হল। দরজার আড়াল, সিঁড়ির নীচে, বাথরুম, রান্নাঘর, স্টোররুম, পিছনের বাগান, সব তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু নূপুর কোথাও নেই!

অর্জুন এবার ঘামতে শুরু করল। মাথা কাজ করছে না তার। বুকের ধক ধক শব্দটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মেয়েটা কোথায় গেল? কোনও সর্বনাশ হয়ে গেল না তো?

একটু পর একটা বড় টর্চ আর জংবাহাদুরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল অর্জুন। রাধিকাকে বলল, 'এদিকে সব কিছু সামলে রাখো। আমি আশপাশটা একটু খুঁজে আসছি। দরকার হলে থানায় যেতে হবে।'

* * *

নূপুরকে খুঁজে পাওয়া গেল একটা খাদের ধারে। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে আলোর বিন্দু জ্বলে উঠেছে জোনাকির ঝাঁকের মতো। খাদের গা থেকে প্রেতযক্ষের মতো উঠে এসেছে দীর্ঘ ও প্রাচীন পাইন বৃক্ষের দল। আর খাদের নীচ থেকে দলা দলা প্রহেলিকার মতো কুয়াশার উঠে আসা দেখছিল নূপুর।

অর্জুন টর্চটা বন্ধ করে দিল। নীলচে চাঁদের আলোয় ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল নূপুরের পিছনে। তারপর খুব নরম করে ডাকল, 'নূপুর, বেটা...'

নূপুর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। অর্জুন দেখল নূপুরের চোখের মধ্যে কোনও ভাষা নেই। যেন একটা পুতুল তাকিয়ে আছে তার দিকে।

অর্জুন আবার ডাকল, 'নূপুর, ঘরে যাবি না মা?'

নূপুর একটা সম্পূর্ণ একটা অচেনা মেয়ের গলায় বলে উঠল, 'তিমিলে মলাই মারেকো ছো। মা তিমিলাই ছোড়নে চৈন।'

জংবাহাদুর অর্জুনের পিছনেই ছিল। তার মুখ থেকে একটা আতঙ্কের চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। অর্জুন বলল, 'কী হয়েছে?'

জংবাহাদুর থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বিস্ফারিত চোখে বলল, 'আপনার মেয়ে নেপালী কোথা থেকে শিখল শা'ব? আর এ কার গলা?'

অর্জুনের গলা শুকিয়ে গেছিল। সে কোনওমতে জিজ্ঞেস করল, 'এ কী বলছে?'

'বলছে, তোমরা আমাকে মেরেছ। তোমাদের আমি ছাড়ব না।'

অর্জুন থমকে গেল। একটু এগিয়ে শক্ত হাতে নূপুরের হাতটা ধরল সে। শক্ত গলায় বলল, 'কী পাগলের মতো বকছিস নূপুর।.ঘরে চল। তোর মা তোর জন্য চিন্তায় আছে।'

নূপুর একবার নিষ্প্রাণ চোখে তাকাল অর্জুনের দিকে। তার ঠোঁটের কোণে একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল। তারপর সে যেটা করল, সেটা অবিশ্বাস্য। সে এক হ্যাঁচকা টানে অর্জুনকে নিয়ে এনে ফেলল খাদের ধারে, তারপর তাকে সর্বশক্তিতে ঠেলে দিতে চাইল পাহাড়ের গা বেয়ে!

অর্জুন নিয়মিত শরীরচর্চা করে। তবুও এই আকস্মিক আক্রমণে হতবাক হয়ে গেছিল সে। খাদের ধার বেয়ে পড়ে যেতে যেতেও সে একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলতে লাগল।

জংবাহাদুর একটা আর্তনাদ করে দৌড়ে এল অর্জুনের দিকে। প্রথমেই নূপুরকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিল সে। নূপুরের মাথাটা একটা পাথরে ঠুকে গেল। সেখানেই নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল সে।

জংবাহাদুর হাঁচোড়পাঁচোড় করে নেমে এল খানিকটা। তারপর অর্জুনকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ধীরে ধীরে উঠিয়ে শা'ব, হড়বড়ি মত কিজিয়ে। নেহি তো প্যায়ের ফিসল জায়েগা।'

অনেক কষ্টে একটু একটু করে অবশেষে ওপরে উঠে এল অর্জুন। তারপরেই দৌড়ে গেল মেয়ের কাছে।

নূপুর ততক্ষণে উঠে বসেছে। সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে জংবাহাদুরের দিকে। সে দৃষ্টিতে কতটা ঘৃণা, কতটা ক্রোধ আর কতটা বিতৃষ্ণা মিশে আছে সে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

অর্জুন কোনওমতে কাঁপা কাঁপা হাতে নূপুরের হাতটা ধরে বলল, 'ঘরে চল বেটা। তোর মা খুব চিন্তা করছে।'

নূপুর কিছু বলল না। উঠে দাঁড়াল। জংবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর চুপচাপ অর্জুনের হাত ধরে হাঁটতে শুরু করল। অর্জুনের

মনে হল সে যেন একটা মানুষ নয়, একটা নিষ্প্রাণ পুতুলকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে।

* * *

ঘরে আসার পর নূপুর আর কোনও কিছু করেনি। চুপচাপ নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। দরজা বন্ধ করেনি। কাঁদেনি, ফোঁপায়নি। কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। যেন স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো চলছে সে, কোনও ভাব, বিকার সাড়, কিছুই নেই।

রাত্রিবেলা ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। ও আর নিখিল এক ঘরে শুয়েছে। নূপুর আর রাধিকা অন্য একটা ঘরে। উঠে দেখল পাশে নিখিল নেই।

ঘুম থেকে উঠে নিখিলকে পাশে না পেয়ে চিন্তিত হল অর্জুন। বাথরুমে গেল নাকি?

কই না তো। বাথরুমের দরজার নীচ থেকে কোনও আলোর রেখা এসে পড়ছে না। জলের শব্দও নেই। এত রাতে কোথায় গেল ছেলেটা?

বিছানা থেকে নেমে টর্চটা হাতে নিল অর্জুন। ধীরে ধীরে দরজা খুলে বাইরে এল। ক্ষীণ চাঁদের আলো বারান্দায় এসে পড়ছে। এদিক-ওদিকে টর্চ মেরে দেখল কেউ কোথাও নেই। তারপর একটু এগিয়ে সিঁড়ির কাছে আসতেই নিখিলকে দেখতে পেল সে।

নিখিল সিঁড়ির একটা ধাপের ঠিক মাঝখানে বসেছিল। দৃষ্টি সিলিংয়ের দিকে। যেন খুব মন দিয়ে কিছু একটা দেখছে সে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, 'নিখিল, কী করছ এখানে?'

মাথা না ঘুরিয়েই নিখিল জবাব দিল, 'ওকে দেখছি।'

চকিতে একবার সিলিংয়ের দিকে টর্চের আলো বুলিয়ে নিল অর্জুন। কিচ্ছু নেই সেখানে।

'কাকে দেখছ নিখিল?'

এবার মুখ ঘোরালো নিখিল, মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। যেন খুব মজা পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'দিদি ওখান থেকে ঝুলছে। দেখতে পাচ্ছো না?'

অর্জুন কিছু বলার আগেই নূপুরের ঘর থেকে একটা আর্তচিৎকার ভেসে এলো। রাত্রির নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল সেই চিৎকারের শব্দে।

* * *

কৃষ্ণানন্দ মৈত্র বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকেই থমকে গেলেন। অর্জুন এগিয়ে আসছিল তাঁকে স্বাগত জানাতে। সেও থমকে গেল, জিজ্ঞেস করল, 'কী হল মৈত্রমশাই?'

মৈত্রমশাই কিছু বললেন না। অর্জুনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাংলোর বেড়া বরাবর প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলেন। মাঝে মাঝে থামছেন, নীচু হয়ে মাটি তুলে এনে শুঁকছেন, আবার ফেলে দিচ্ছেন। আর বিড়বিড় করে ক্রমাগত কী যেন বলে চলেছেন।

এই করতে করতে বাংলোর দক্ষিণ ও পশ্চিম কোণের ঠিক মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। অর্জুনের মনে হল একবার যেন শিউরে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপর দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে তীব্রস্বরে বললেন, 'আমি আপনাকে সেদিন অনেক করে বলেছিলাম না বেরোতে। তাও আপনি আমার কথা অগ্রাহ্য করে বেরিয়েছিলেন। কেন?'

অর্জুনের মাথা নীচু হয়ে এলো। এমনিতেই তার মাথা কাজ করছে না কালকের পর থেকে।

কাল রাতে নিখিলের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল অর্জুন। এসব কী বলছে কী নিখিল? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ছেলেটার? কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই চিৎকার ভেসে এসেছিল রাধিকার ঘর থেকে। অর্জুনের ঘোর কেটে গেছিল তখনই। সে দৌড়ে গিয়েছিল রাধিকার ঘরে।

রাধিকা তখন প্রাণের ভয়ে সারা ঘরের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আর তার পিছনে রান্নাঘরের মাংসকাটার বড় ছুরিটা নিয়ে তাড়া করেছে নূপুর। ফ্যানের হাওয়ায় তার চুল উড়ছে সহস্র সাপিনীর মতো। ক্রমাগত থুতু ছিটিয়ে চলেছে সে। তার সঙ্গে সেই বিজাতীয় স্বরে নেপালী ভাষায় ক্রমাগত কী যেন বলে চলেছে।

অর্জুন মুহূর্তের জন্য থমকে গেছিল এই দৃশ্য দেখে। তারপর চিৎকার করে উঠেছিল, 'নূপুর!!!'

নূপুর ধীরে ধীরে ঘুরল তার দিকে। আর ভয়ে অর্জুনের প্রাণ উড়ে গেল মেয়েকে দেখে।

কোন অলৌকিক মন্ত্রবলে নূপুরের গাল দুটো চুপসে একেবারে ভেতরে ঢুকে গেছে। হনু দুটো অস্বাভাবিক উঁচু। হাত-পায়ে মাংস নেই, যেন ক'খানা হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো আছে। কয়েকঘণ্টার মধ্যে মেয়েটা যেন কঙ্কালে পরিণত হয়েছে।

আর চোখদুটো?

অর্জুন দেখল, নূপুরের চোখে শুধু অন্ধকার।

নূপুর ছুরিটা হাতে নিয়ে এবার ধীরে ধীরে এগোতে লাগল অর্জুনের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনও হিংস্র শ্বাপদ এগোচ্ছে তার শিকারের দিকে। অর্জুন দুবার নূপুরের নাম ধরে ডাকতে গেল। কিন্তু কোনও স্বর ফুটল না তার গলায়।

নূপুর সেই বিজাতীয় স্বরে হিংস্রস্বরে ফের বলে উঠল, 'তোরা মেরেছিস আমাকে। তোদের আমি ছাড়ব না।'

এই বলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই দরজার কাছ থেকে নিখিলের আর্তস্বর ভেসে এলো, 'দিদি, এ কী করছিস তুই?'

নূপুরের মাথাটা ধীরে ধীরে ঘুরল নিখিলের দিকে।

নিখিল আঁতকে উঠল তার দিদিকে দেখে। আতঙ্কিত, ত্রস্তস্বরে বলল, 'দিদি, ওই দিদি, তুই এমন কেন করছিস দিদি? আমার ভয় লাগছে তো।'

নূপুরের হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গেল। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেয়েটা।

ফোনটা ভোর রাতের দিকে এসেছিল অর্জুনের মোবাইলে। তখনও ঘুমোয়নি অর্জুন আর রাধিকা। মেয়েকে কোলে চেপে ভোর হওয়ার প্রতীক্ষা করছিল। ফোনের ওপারে সেই চেনা গম্ভীরস্বর, 'আমি দার্জিলিং পৌঁছেছি মিস্টার সেনগুপ্ত। আপনাদের বাড়িটা ঠিক কোথায় একটু বলবেন?'

অর্জুন ধীরে ধীরে মাথা তুলল। তার চোখে জল। সে বলল, 'আজ অবধি জ্ঞানত কারও কোনও ক্ষতি করিনি মিস্টার মৈত্র। জানি না কার

পাপে আজ আমার মেয়ের এই অবস্থা।'

মৈত্রমশাই এসে অর্জুনের কাঁধে হাত রাখলেন, 'আপনাকে বলেছিলাম না যে আমি সর্বনাশের গন্ধ পাই? যেদিন আমরা ফিরে এলাম ওই কালিকিঙ্কর ঠাকুরের ওখান থেকে, সেদিন থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আপনার ওপর একটা ঝড় আসতে চলেছে। কিন্তু ঝড়টা কোনদিক থেকে কীভাবে আপনার ওপর আছড়ে পড়বে সেটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু সেদিন আমাকে বেরোতেই হত। আপনাকে তাই পইপই করে বলে গেছিলাম বাইরে বেরোবেন না।

কিন্তু কপালে ভোগান্তি থাকলে আর কী হবে। আপনি সেই বেরোলেন। আর সেদিন থেকেই যাবতীয় বিপত্তির শুরু। এবার বলুন তো মিস্টার সেনগুপ্ত, সেদিন ঠিক কী কী হয়েছিল?'

পরের আধঘণ্টা শুধু বলে গেল অর্জুন। মৈত্রমশাই চুপ করে শুনে গেলেন, কিছু বললেন না। অর্জুনের কথা শেষ হওয়ার পর মুখ খুললেন তিনি, 'সেদিন আপনাকে ছেড়ে কোথায় গেছিলাম জানেন?'

অর্জুন তাকিয়ে রইল মৈত্রমশাইয়ের দিকে।

'মায়ের আশীর্বাদে আমার কিছু ক্ষমতা আছে সাহেব। আমি চাইলে মানুষের ভেতরটা অবধি দেখতে পাই। সেদিন কালিকিঙ্কর ঠাকুরকে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম। কেন জানেন? ওই লোকটার ভেতরটা শুধু অন্ধকার, ঘন অন্ধকার। জীবনে অনেক মানুষ দেখেছি সাহেব। কেউ কখনও পুরো সাদা বা পুরো কালো হয় না। ভালো মন্দ, সাদা-কালো মিশিয়েই জীবন। কিন্তু কালিকিঙ্কর ঠাকুর আলাদা, সবার থেকে আলাদা। আত্মিক ক্ষমতায় মহাশক্তিধর তিনি। তন্ত্রচর্চায় তিনি মহাসিদ্ধ, মহাকৌল। চীনাচার তন্ত্রের সর্বোচ্চ বিন্দুতে আরোহণ করেছেন তিনি। আমার জীবনে এমন মহাপ্রতিভাধর তন্ত্রসিদ্ধ আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।

কিন্তু মানুষ আসলে কী জানেন? মানুষ আসলে তার সমস্ত সিদ্ধান্তের সমষ্টি। আমরা প্রতি মুহূর্তে কোনও কোনও সিদ্ধান্ত নিই। এটা ঠিক, ওটা ভুল, ওটা করব, এটা করব না। এই ঠিক ভুলের ভুলভুলাইয়াতে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলার নামই জীবন। আর আমরা এই ভুলভুলাইয়াতে যা

যা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি, শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তগুলোই আমাদের আমরা যা, তাই করে তোলে।

আর আশ্চর্যের কথা কী জানেন? এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে মানুষের শিক্ষাগত যোগ্যতার, বা প্রতিভার সবসময় মিলমিশ থাকবে তার কোনও মানে নেই। আমি সমাজের একদম নীচের স্তরের মানুষও দেখেছি যাঁরা নৈতিক, আত্মিক চরিত্রের উন্নতায় সমুজ্জ্বল। আবার সমাজের উপর স্তরের মানুষের মধ্যেও কত যে নীচ, হীন মানসিকতা দেখেছি তা বলার নয়।

কালিকিঙ্কর ঠাকুর তন্ত্রশাস্ত্রে মহাসিদ্ধি লাভ করেছেন বটে, কিন্তু অন্তরের লোভকে জয় করতে পারেননি। তন্ত্র মুক্তির কথা বলে, দেহ থেকে দেহাতীতে যাওয়ার কথা বলে, আত্মার বিশুদ্ধতার কথা বলে। এই জীবনচক্রের আবর্তন থেকে পুণ্য নির্বাণের দিকে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু কালিকিঙ্কর সেই মুক্তি চাননি। তিনি চেয়েছেন অন্যকিছু। আর সেই চাওয়াই তাঁর কাল হয়েছে। কোনও এক অতিলৌকিক, অতিদৈবিক ক্ষমতার লোভে নিজের আত্মাকে অন্ধকারের কাছে বলি দিয়েছেন তিনি। নিজেকে বিক্রি করেছেন, পাপের পথে হেঁটে নিজেই মূর্তিমান পাপ হয়ে উঠেছেন। আর সেই পাপকর্মের কিছুটা ফল ভোগ করছেন আপনি।

শুনুন অর্জুনবাবু, অন্ধকার জগতের এক অত্যন্ত অশুভ আত্মা আপনাকে অধিগ্রহণ করেছে। সেদিন বলিদান নিয়ে কথা হচ্ছিল মনে আছে? মা কখনও সন্তানের বলি চান না। তিনি শুভঙ্করী, এই পৃথিবীর রক্ষাকর্ত্রী।

বলি দেওয়া হয় দেবীর অনুচর ভূতপ্রেতপিশাচাদির উদ্দেশ্যে, কোনও বিশেষ কামনা নিয়ে। ঠাকুরের সেই অশুভ কামনার একটা ছোট্ট অংশ হয়ে পড়েছেন আপনি। সেদিন আপনি যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, আপনাকে দেখেই সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। আজ এখানে পা দিয়ে সেই অশুভ প্রভাব সর্বাংশে অনুভব করতে পারছি।'

শুনতে শুনতে অর্জুনের শীত করছিল। সে কাতরস্বরে প্রশ্ন করল, 'কী করেছি আমি? আমার ছোট মেয়েটাই বা কী অপরাধ করেছে?'

'কালিকিঙ্কর ঠাকুর দেবী বজ্রচর্চিকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন অর্জুনবাবু। ইনি একজন অতি প্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী। মায়ের রূপ

অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অস্থিসার, কঙ্কালসদৃশ। আমরা হিন্দুরা যাঁকে মা চামুণ্ডা বলে পুজা করি, তিনিই আদিকালে দেবী বজ্রচর্চিকা নামে প্রকট ছিলেন।

আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি কালিকিঙ্কর ঠাকুরের একটি অনুগত অঘোরী তান্ত্রিকের গোপন দল আছে, তার নাম হচ্ছে অক্ষোভ্যসমাজ। এই অক্ষোভ্যসমাজ আজকের নয়, এটি একটি প্রায় সহস্রাব্দপ্রাচীন গুপ্ত তান্ত্রিক গোষ্ঠী। এদের সাধনার ধারা হচ্ছে কালচক্রযান।

কালচক্রযান বৌদ্ধতন্ত্রের একটি সাধনপদ্ধতি। এর বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণে যাব না, আমাদের তার দরকারও নেই। এই অক্ষোভ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কালচক্রযানের একটি মিথকে কেন্দ্র করে, তার নাম হচ্ছে অমৃতমূলাধার। এই অমৃতমূলাধার নাকি সৃষ্টির আদিতম বিন্দুগন্ধ তাকে আয়ত্ত করতে পারলে মানুষ অমর হয়, কারণ তখন সে তার নিজের জরাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কালকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কালিকিঙ্কর ঠাকুর সেই প্রাচীন অক্ষোভ্যসমাজকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন। তিনি চর্চিকাসিদ্ধাই, দেবীর সাধনায় মহাবেত্তা। আপনি সেদিন যে মূর্তিটি দেখেছিলেন, ওটিই দেবী বজ্রচর্চিকার মূর্তি। আর দেবীর সামনে সাত বা আট বছরের বালিকার বলিকে ওরা বলে গৌরীদান। এর অর্থ হচ্ছে ঠাকুর সিদ্ধিলাভের পথে একদম শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। আর একটি মাত্র অন্তিমচক্র বাকি। তারপরেই ঠাকুর অমিত শক্তির অধিকারী হবেন। তিনি নরকের দ্বার উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবেন, তুলে আনবেন সৃষ্টির আদিবিন্দু, অমৃতমূলাধার।'

'কিন্তু, কিন্তু...' কথা খুঁজে পাচ্ছিল না অর্জুন, 'এর সঙ্গে আমার, আমার মেয়ে, বা পরিবারের কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক আছে সাহেব,' ধীরে ধীরে বললেন মৈত্রমশাই, 'শাস্ত্রে বলে বলিপ্রাপ্ত প্রাণী তৎক্ষণাৎ জীবনচক্রের আবর্তন থেকে মুক্তিলাভ করে, নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে তার। কিন্তু এই অমৃতমূলাধারপ্রাপ্তির বলিদানে তা ঘটে না। এ উপাসনা নারকী উপাসনা, স্বয়ং যমারি এর হোতা, যমান্তক এর উদগাতা, দেব হেরুক এর অধ্বর্যু। তাই এই উপাসনার বলিপ্রাপ্ত জীবের কোনও মুক্তি নেই, তার একমাত্র গতি নরকের প্রেতলোক।

যে মেয়েটিকে বলি দেওয়া হয়েছে, তার প্রেত তখন কোনও আধার খুঁজছিল। ওই কালিকিঙ্কর ঠাকুর বোধহয় অন্য কোনও হতভাগ্য আর তার পরিবারকে এর জন্য নির্বাচিত করে রেখেছিল। তারপর আপনাকে দেখে তার মাথায় এই অভিনব পরিকল্পনা আসে। আপনাকে আমার থেকে সুকৌশলে সরিয়ে নিয়ে যায় তার বলিদানের সময়। আর সেই হতভাগ্য মেয়েটির প্রেতাত্মাকে দেখিয়ে দেয় আপনার পরিবারকে।

'কিন্তু কেন? আমি আর আমার মেয়ে কী ক্ষতি করেছি ওদের?'

'না, আপনি কোনও ক্ষতি করেননি ওর। আপনি ওর পরীক্ষার পাত্র বিশেষ। ওই যে বললাম, ও বোধহয় অন্য কাউকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল প্রেতের ভোগ হিসেবে। আপনার আগ্রহ দেখে ও আপনার ওপরেই পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই সেদিন আপনাকে যেতে বলেছিল, কিন্তু আমাকে না নিয়ে। ও জানত আমি থাকলে ওই নৃশংস পাপকাজ আমি কিছুতেই করতে দিতাম না। আমিও যেমন ওকে প্রথম দেখাতে চিনেছি, ও-ও আমাকে প্রথম দেখাতেই চিনতে পেরেছে। কালিকিঙ্কর কম বড় তান্ত্রিক নয় অর্জুনবাবু।'

'তাহলে উপায়?'

বিষণ্ণমুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মৈত্রমশাই 'জানি না অর্জুনবাবু, সত্যি জানি না। তবে এটুকু জানি এই পাপ আপনার সংসার ছারখার করে দেবে। প্রথমে যাবে আপনার মেয়ে, তারপর ছেলে, তারপর আপনার স্ত্রী, আর তারপর অনেক কষ্ট দিয়ে তিলে আপনাকে শেষ করবে।'

অর্জুন কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারল না। তারপর স্খলিতস্বরে বলল, 'তাহলে এখন উপায়?'

কৃষ্ণানন্দ গম্ভীরমুখে বললেন, 'এই প্রেতকর্মের প্রতিষেধক আমার জানা নেই সাহেব। এই প্রেত অন্ধ, সে শুধু জানে ধ্বংস করতে আর তার আগে অসীম, অবর্ণনীয় কষ্ট দিতে। মা মহামায়াকে ডাকুন, এক তিনিই যদি কোনও রাস্তা দেখান।'

অর্জুন কিছু বলে ওঠার আগেই দোতলার বারান্দা থেকে রাধিকার

চিৎকার শোনা গেলো, 'অর্জুন, শিগ্গিরি এদিকে এসো, সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

* * *

কালিকিঙ্কর ঠাকুরমশাইয়ের ভুরুদুখানা কুঁচকে ছিল। যা যা দরকার ছিল সবই তো করেছেন। সাধনার সব কটি ধাপ বিনাবাধায় সুসম্পন্ন করেছেন। গৌরীদান হয়েছে যথাযথ প্রক্রিয়াতে। প্রেতসন্নিবেশ করেছেন ওই মূর্খ সিনেমা করিয়ের পরিবারের ওপর। আর দুদিন পর অমাবস্যা। সেদিন রাহু প্রবেশ করবেন ভরণী নক্ষত্রে, শনি থাকবেন অশ্বিনীতে। শনি মূল ত্রিকোণে থেকে রাজযোগ তৈরি করবেন। ওই দিন তাঁর সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট দিন। তার আগে এই দুদিন তাঁর কিছু প্রাথমিক ক্রিয়া আছে। সেসবই অতি সাধারণ ক্রিয়া, তিনি ইচ্ছামাত্রে সেসব সুসম্পন্ন করতে পারেন। অথচ তিনি মনঃসন্নিবেশ করতে পারছেন না কেন? এই অতি সাধারণ ক্রিয়াতেও তাঁর সিদ্ধিলাভ হচ্ছে না কেন?

কালিকিঙ্কর ওরফে ঠাকুরমশাই মাথা আঁকড়ে বসে থাকেন। সব কিছু অতি সাবধানে, অতি সুচারুরূপে, অতি যত্ন সহকারে সুসম্পন্ন করা সত্ত্বেও তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে না কেন? এত বাধা আসছে কোথায়?

প্রতিবার পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসা সত্ত্বেও তাঁর কানে ওই বালিকার অন্তিম আর্তনাদ ভেসে আসে কেন? তাঁর সব সাধনা, সব সিদ্ধি, সব ইষ্ট নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর মনের কোণে যেন কোন আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠে।

আসনে স্থির হয়ে বসেন কালিকিঙ্কর ঠাকুর। গম্ভীরস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে শুরু করলেন, 'ওঁ বজ্রচর্চিকায়ৈ স্বাহা, ওঁ মহাবিদ্যে স্বাহা, ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা। ওঁ আর্য্যাপরাজিতায়ৈ স্বাহা। ওঁ সর্ববুদ্ধডাকিন্যৈ স্বাহা....

তাঁকে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতেই হবে। যে করেই হোক।

* * *

নূপুরকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে। কড়া সিডেটিভের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। একটা ঘরে থম মেরে বসে আছে রাধিকা। তার হাতে, পায়ে, পিঠে ড্রেসিং করা। রাধিকার কোলের কাছে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে নিখিল। অর্জুনের বাবাকে অন্য একটা ঘরে রাখা হয়েছে। অর্জুনের মা রয়েছেন স্বামীর কাছে। সারা বাড়িতে একটা থমথমে ভাব।

অর্জুন ধরা গলায় কৃষ্ণানন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কী হচ্ছে মিস্টার মৈত্র।'

রাধিকার চিৎকার শুনে দৌড়ে গেছিল অর্জুন। চিৎকারটা আসছিল রান্নাঘর থেকে। অর্জুন গিয়ে দেখে নূপুর রাধিকাকে চেপে ধরেছে গ্যাসের স্টোভের ওপর। রাধিকা চাইছে তাকে ঠেলে ফেলে দিতে, কিন্তু পারছে না। কোথা থেকে যেন অমানুষিক শক্তি এসে ভর করেছে ওই একরত্তি মেয়েটার ওপর। এদিকে রাধিকার শাড়ির আঁচলে আগুন ধরে গেছে। তারস্বরে চিৎকার করছে সে। আর নূপুর সেই আর্তনাদ শুনে সম্পূর্ণ অচেনা গলায় খিলখিল করে হাসছে আর বলছে 'তপাইকো সময় সকিয়ো বুড়ি।'

কৃষ্ণানন্দের ওপরে উঠে আসতে একটু সময় লাগল। তিনি এসে দেখলেন অর্জুন একটা বেত দিয়ে নির্মমভাবে মারছে নূপুরকে। নূপুরকে দেখে মনে হচ্ছে সেই প্রহার যেন তার গায়েই লাগছে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে উন্মাদের মতো হি হি করে হাসছে সে। আর সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে রাধিকা নিখিলকে জড়িয়ে কাঁদছে।

মৈত্রমশাই এসে বেতের লাঠিটা কেড়ে নিলেন। তারপর কড়া গলায় ধমকালেন অর্জুনকে, 'কী করছেন কী। মেরে ফেলবেন নাকি মেয়েটাকে।'

এতক্ষণের পরিশ্রমে নূপুর বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে ধুপ করে পড়ে গেল মেঝের ওপর। মৈত্রমশাই পরম মমতায় তাকে তুলে বিড়বিড় করে কী একটা মন্ত্র বলতে বলতে তাকে তার ঘরে শুইয়ে দিয়ে এলেন।

* * *

সেদিন রাতে হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে গেল জংবাহাদুরের। প্রথমে সে বুঝতে পারল না তার কারণটা কী। বুকের ওপর যেন একটা পাহাড় বসে আছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার।

ওঠার চেষ্টা করতেই জংবাহাদুর বুঝল যে সে একটুও নড়তে পারছে না। এমনকি ডানদিকে ঘুরে যে জলের বোতলটা নেবে, সেটাও পারছে না সে।

বুকের ওপর চাপটা ক্রমশ বাড়ছে। কপালে ঘাম জমছে জংবাহাদুরের। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ক্রমশ। মনে হচ্ছে ফুসফুসটা যেন গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে এবার।

হাঁসফাঁস করতে করতেই জংবাহাদুর বুঝল তার বুকের ওপর চেপে থাকা পাহাড়টা নড়ছে। তারপর সেটা অল্প ঝুঁকে এল জংবাহাদুরের ওপর। আর চেনা একটা গলায় ভেসে এল, 'ধেরৈ দুখাই ছ?'

মিসিবাবা বসে আছে তার বুকের ওপর! তাকে জিজ্ঞেস করছে, খুব কষ্ট হচ্ছে!

আতঙ্কিত হওয়ারও সময় পেল না জংবাহাদুর। শুধু অল্প খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে আসা চাঁদের আলোয় ঝলসে উঠল মাংস কাটা ছুরিটা।

পরদিন সকাল থেকে জংবাহাদুরকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

* * *

সকালে রাধিকার ঘরে ঢুকে চমকে উঠল অর্জুন। রাধিকার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন একরাতেই অনেক বয়েস বেড়ে গেছে তার। চুল উসকোখুসকো, চোখের নীচে কালি। এই মুহূর্তে সে বসে আছে নিখিলের মাথার কাছে। সারা রাত কেঁদেছে ছেলেটা, ঘুমিয়েছে ভোররাতের দিকে।

এই মুহূর্তে রাধিকার মাথার ভেতর সব কিছু শূন্য হয়ে আছে।

নিখিল ঘুমিয়ে যাওয়ার পর একবার নূপুরকে দেখতে এসেছিল রাধিকা। নূপুর তখন অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। আর তার ডানহাতে আলগোছে ধরা আছে রান্নাঘরের মাংস কাটার ছুরিটা। আর তার গায়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্ত!

মাথা ঘুরে গেছিল রাধিকার। কোনওমতে দরজা ধরে নিজেকে সামলেছিল সে। কী করেছে মেয়েটা? ছুরিতে রক্ত কেন?



একটু পরে নিজেকে সামলাল রাধিকা। আলগোছে ছুরিটা তুলে নিল নুপুরের হাত থেকে। তারপর দৌড়ে ফিরে গেল নিজের ঘরে, ওয়ার্ড্রোবের একদম ভেতরে জামাকাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখল ছুরিটা।

কিছু তো একটা ঘটিয়েছে মেয়েটা। সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু।

ভাবতেই রাধিকা আবার অসুস্থ বোধ করতে লাগল। বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এল কিছুটা। তারপর কী ভেবে আবার নূপুরের ঘরে গেল। মেয়েটা কোথায় কী করে এসেছে জানা দরকার। ছুরিতে যখন রক্ত লেগে আছে, নিশ্চয়ই রক্তের ফোঁটাও পড়ে থাকবে কোথাও না কোথাও।

কিন্তু নূপুরের ঘরে ঢুকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও কোনও রক্তের দাগ দেখতে পেল না রাধিকা। ভুরু কুঁচকে গেল তার। এমন তো হওয়ার কথা নয়।

খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেঝেটা পরীক্ষা করে দেখল রাধিকা। কই, না তো, কোথাও একবিন্দু রক্তের ছাপ নেই। মেঝে, চৌকাঠ, ব্যালকনি, সিঁড়ি, এক এক করে সব পরীক্ষা করল সে।

নাহ, কোথাও কোনও রক্তের চিহ্নমাত্র নেই।

আবার নূপুরের ঘরে ফিরে এল রাধিকা। এবার চাদরটা পরীক্ষা করল সে। আর তখনই একটা অদ্ভুত জিনিস নজরে পড়ল তার।

চাদরের একপ্রান্তে একফোঁটা রক্তের দাগ লেগে আছে। কিন্তু প্রায় মিলিয়ে এসেছে সেটা। ওই জায়গাটা ভালো করে দেখল রাধিকা। বুঝতে পারল যে ওখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে রক্ত লেগেছিল। কিন্তু কোন অলৌকিক উপায়ে সেই দাগ মুছে এসেছে প্রায়। শুধু একফোঁটা রক্ত লেগে আছে। আর তার স্তম্ভিত চোখের সামনে সেই দাগটাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। যেন ওখানে কিছুই ছিল না।

অর্থাৎ যেখানে যেখানে রক্তের ফোঁটা পড়েছিল, সেই দাগও এভাবেই মিলিয়ে গেছে। তাই কোথাও কোনও চিহ্ন পায়নি রাধিকা।

চুপচাপ উঠে পড়ল রাধিকা। নিজের ঘরে এসে ওয়ার্ড্রোব খুলল। বার করে আনল ছুরিটা।

নিদাগ নিষ্কলঙ্ক ছুরি। কে বলবে একটু আগে এই ছুরিটার সারা গায়ে রক্ত লেগেছিল?

অর্জুনকে আঁকড়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল রাধিকা। 'এসব কী হচ্ছে অর্জুন? কেন হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে? আমি কি এবার পাগল হয়ে যাব? আমাদের সঙ্গে কী হচ্ছে কি এসব?'

অর্জুন রাধিকার মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরল। তাকে এখন বিভ্রান্ত হলে চলবে না। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

একটু পর রাধিকার কান্নার বেগ কমলে সে বলল, 'রাতে কী হয়েছে জানো?'

অর্জুন বলল, 'কী হয়েছে?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে সব কথা খুলে বলল রাধিকা। শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গেল অর্জুন।

* * *

তাকদা থানার ইন্সপেক্টর অনিল গুরুং কাজের লোক। জংবাহাদুরের উধাও হওয়ার রহস্য সমাধানের ভার তাঁর ওপরেই পড়েছে। সকাল সকালই পুলিশ এনে একপ্রস্থ রুটিন এনকোয়্যারি শুরু করে গেছে। এবার গুরুং সাহেব নিজে এসেছেন সরেজমিনে তদন্ত করতে।

নূপুরকে দেখবার জন্য ডাক্তারবাবু এসেছেন। তিনি নূপুরকে চেক করতে করতে মাথা নাড়লেন, 'কাল যা বলেছি, আজও তাই বলছি মিস্টার সেনগুপ্ত। আমি কিন্তু অসুস্থতার কোনও লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমার মনে হয় কোনও মেন্টাল ট্রমা থেকে ও এরকম করছে। আমার সাজেশন হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতা বা মুম্বাইতে নিয়ে গিয়ে কোনও ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান।'

ডাক্তারবাবু চলে গেলে রাধিকা এসে ঢুকল ঘরে। অর্জুন তাকে বলল, 'এসো রাধিকা, পাশে বোসো। অনেক কথা বলার আছে মৈত্রমশাইকে।'

মৈত্রমশাই রাধিকাকে দেখে অবাক হয়ে গেছিলেন। অমন ঝকঝকে সুন্দরী আধুনিকা মেয়েটিকে তিনি এমন বিধ্বস্ত, বিস্রস্ত অবস্থায় দেখবেন এ তাঁর দূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

রাধিকা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, 'আজ অবধি সজ্ঞানে কারও ক্ষতি করিনি মৈত্রমশাই, কারও খারাপ চাইনি। আমার সন্তানদের সঙ্গেই এমন কেন হচ্ছে বলতে পারেন?'

মৈত্রমশাই ভারী নরম সুরে বললেন, 'উতলা হবেন না মা। জানি আপনারা এক মহাবিপদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। মা যদি কৃপা করেন তাহলে এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধারের পথ তিনিই বলে দেবেন।'

একটু সামলে রাধিকা ভোররাতের পুরো ঘটনাটা বলল। শুনে খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন মৈত্রমশাই। তারপর রাধিকাকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা মা, একটা কথা বলুন তো আমাকে। আজ ভোররাতের ঘটনাটা ছাড়াও গত কয়েকদিনের মধ্যে এমন কিছু আপনার সঙ্গে ঘটেছে আপনি যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি?'

রাধিকা প্রথমে প্রশ্নটা বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'যুক্তিতে ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না বলতে?'

'মানে এমন কিছু ঘটনা যা ঘটা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। অথচ তাই ঘটেছে আপনার সঙ্গে। এমন কিছু যার কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক নেই, এমন কিছু।'

রাধিকা একটু ভাবল। খানিক পর বলল, 'হ্যাঁ, ঘটেছিল। যেদিন আপনারা ট্রেন ধরলেন, সেদিন আমি কালীঘাটে নূপুর আর নিখিলকে নিয়ে পুজো দিতে গেছিলাম। ফেরত আসার সময় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে।'

সোজা হয়ে বসলেন মৈত্রমশাই, 'কী ঘটনা?'

রাধিকা থেমে থেমে পুরো ঘটনাটা বলল। শুনতে শুনতে মৈত্রমশাইয়ের চোখমুখের ভাষা পালটে যাচ্ছিল। রাধিকার কথা শেষ হতে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে বৃদ্ধার কথা বললেন তাঁকে দেখতে কেমন?'

'একদম শুকনো কঙ্কালসার চেহারা। গাল দুটো বসে গেছে, চোখ একেবারে কোটরে ঢুকে গেছে, হাত দেখলে মনে হয় যেন হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো। গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন শাড়ি, আর খালি পা। এইটুকু মনে আছে।'



কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ দুহাত জড়ো করে কপালে ঠেকালেন, বললেন, 'জয় মা, জয় মা চামুণ্ডা। মা রাধিকা, জানি না আপনি কত পুণ্য সঞ্চয় করেছেন যে মা স্বয়ং আপনাকে দেখা দিয়েছেন, আপনার সন্তানের হাতে জল খেয়েছেন। মা গো, আর ভয় নেই। যে জলে আপনার মেয়ে জগন্মাতার তৃষ্ণা নিবারণ করেছে, মা নিজে এসে সেই জলেই রক্তের দাগ মুছে দিয়েছেন, যাতে নূপুরের কোনও বিপদ না হয়। জয় জগদিশ্বরী...জয় মহামায়া। ওই ছুরিটি আমাকে এনে দিন মা। ওতে স্বয়ং জগত্তারিণীর হাতের ছোঁয়া আছে। ওটি আমার লাগবে।'

বলতে বলতেই ইন্সপেক্টর গুরুং ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলেন। বেজার মুখে বললেন, 'কী ঝামেলার কেস বলুন তো। লোকটা কী করে উধাও হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না।

এমনিতে জংবাহাদুরকে আজ অবধি এই গ্রামের বাইরে কেউ যেতে দেখেনি। হঠাৎ করে কাউকে না বলে চলে যাবে সেটাও সম্ভব না। তাছাড়া কাপড়জামা জুতো টাকাপয়সা সবই রেখে গেছে। ঘরে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন নেই, রক্তপাতের চিহ্ন নেই। খুন বা অপহরণ বলেও মনে হচ্ছে না। কী হতে পারে সে তো মাথাতেই আসছে না।'

রক্তপাতের কথা শুনে একবার ঢোঁক গিলল অর্জুন।

গুরুং বললেন, 'ডাক্তারবাবুকে দেখলাম বেরোতে। কী বললেন উনি? শুনেছি আপনার মেয়ে খুব অসুস্থ। সে ঠিক আছে এখন?'

অর্জুন বলল, 'ওই সামান্য নার্ভাস ব্রেকডাউন মতো। ডাক্তারবাবু বলেছেন ওকে কোনও বড় স্পেশালিস্ট দেখাতে। খুব শিগ্গিরিই ওকে আমরা কলকাতা নিয়ে যাব।'

ইন্সপেক্টর গুরুংকে দেখে মনে হল কথাটা শুনে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে যান। এমনিতেও কাল থেকে অন্য একটা ঝামেলায় বিচ্ছিরি ভাবে ফেঁসে আছি, তার ওপর এই। একের পর এক আমার ওপর দিয়ে যা যাচ্ছে না...'

মৈত্রমশাই ভদ্রতাবশত জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'আর বলবেন না। কাল থেকে এক মহিলাকে নিয়ে অত্যন্ত বিব্রত

হয়ে আছি। বাড়ি নেপালের কোন না কোন গ্রামে। কাল থেকে এখানে এসে হাজির। তার একমাত্র মেয়ে, আর হাজব্যান্ড নাকি এদিকে এখানে কোথায় এসেছে, তারপর তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ের বয়েস আট, নাম গৌরী। মহিলা প্রেগনেন্ট, অ্যাডভান্স স্টেজ। এই অবস্থায় শিলিগুড়ি, কালিম্পং, কার্শিয়াং, দার্জিলিং এসব চষে বেড়াচ্ছেন মেয়ে আর স্বামীর খোঁজে। কাল থানায় এসে কী হুজ্জুতি, যে করে হোক আমরা যেন ওঁর মেয়ে আর স্বামীকে খুঁজে দিই।'

মৈত্রমশাই প্রায় লাফিয়ে উঠলেন,'এখুনি আমাকে ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করান ইন্সপেক্টর সাহেব, এই মুহূর্তে।'

অর্জুন আর ইন্সপেক্টর গুরুং দুজনেই অবাক হয়ে গেলেন। গুরুং বললেন, 'এ কী মশাই, আপনি অমন ক্ষেপে গেলেন কেন?'

ছটফট করে উঠলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, 'সব পরে বলব আপনাকে। আপাতত আমাকে ওই মহিলার কাছে নিয়ে চলুন সাহেব। মায়ের কৃপায় এবার একটা রাস্তা বোধহয় পাওয়া গেছে।'

* * *

ডুয়ার্সের জঙ্গলের মধ্যে একটি পরিত্যক্ত মন্দির। সেখানে আজ আলো জ্বলেছে বহুদিন বাদে। লোক লাগিয়ে মন্দিরটি পরিষ্কার করা হয়েছে। মন্দিরের মধ্যে একদিকে দেবী চামুণ্ডার পূর্বাস্য মূর্তি। তাঁর সামনে হোম এবং অন্যান্য পুজোপকরণ। একটি যজ্ঞের বেদি প্রস্তুত করা হয়েছে। তাকে ঘিরে বসে আছেন চারজন। মৈত্রমশাই, অর্জুন, নিখিল আর নূপুর।

নূপুরকে নিয়ে আসা সহজ হয়নি। তাকে কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে গাড়িতে তোলা হয়েছে। সারাটা রাস্তা নূপুরের মাথা নিজের কোলে নিয়ে বসেছিলেন মৈত্রমশাই। ক্রমাগত মন্ত্রজপ করে গেছেন এখন, এই মন্দিরে বসেও সে ঘুমে ঢুলছে।

অর্জুন চারিদিক দেখে প্রশ্ন করল, 'এটা কীসের মন্দির মৈত্রমশাই?'

'এই মন্দির চামুণ্ডা মন্দির অর্জুনবাবু। এ বহু প্রাচীন মাতৃমন্দির। কালাপাহাড়ের আক্রমণের সময় এই মন্দির পরিত্যক্ত হয়। কালের

করালগ্রাসে এই মন্দিরকে লোকে ভুলে গেছে বটে, তবে এই চামুণ্ডামূর্তি ভারী জাগ্রত। আজ মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে এক মায়ের চোখের জল মোছাব। আর আমার ছোট মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নেব।'

'ছোট মায়ের হত্যার প্রতিশোধ?' অর্জুনের গলায় বিস্ময়, 'কার কথা বলছেন মৈত্রমশাই?'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন মহাতন্ত্রবেত্তা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তাঁর চোখে জল। তিনি ধীরে ধীরে বলেন, 'আপনি তো জানেন আমি বহুদিন নেপাল রাজ কলেজে অধ্যাপনা করেছি। তখন প্রায়ই পশুপতিনাথ মন্দিরে যেতাম পূজার্চনার জন্য। সেখানেই একটি ছয় বছরের মেয়ের সঙ্গে আমার একবার আলাপ হয়। ওর বাবা মা মন্দিরে এসেছিল পুজো দিতে। মেয়েটি ভারী মিষ্টি, অতি সুলক্ষণা। আমার সঙ্গে তার দিব্যি ভাব হয়ে গেছিল।

যে কদিন তারা কাঠমাণ্ডুতে ছিল, পশুপতিনাথ মন্দির চত্বরে প্রায় রোজই দেখা হত। গত বছরেও আমি কাঠমাণ্ডু গেছিলাম শুধু মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে। মেয়েটি আমাকে বাঙালিদাদু বলে ডাকত।

গত কয়েকদিন ধরেই মেয়েটিকে বারবার স্বপ্নে দেখছিলাম। মন বলছিল কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। ওরা কাঠমাণ্ডুর বাইরে একটা গ্রামে থাকে। সেখানে টেলিফোন মোবাইল কিচ্ছু নেই। ফোনে যোগাযোগ করার উপায়ও নেই।

যেদিন আপনাকে আমি হোটেলে একলা ছেড়ে আমি চলে যাই, তার আগেরদিন রাতে আমি আপনার সঙ্গে ওই মেয়েটিরও কোষ্ঠী গণনা করেছিলাম, আর বুঝতে পারি যে তার সমূহ বিপদ। সেদিন আমি গেছিলাম আমার এক প্রাক্তন সহকর্মীকে ফোন করতে, যার বাড়ি ওই মেয়েটির গ্রামের কাছাকাছি। তাকে অনুরোধ করেছিলাম সে যেন একবার ওদের বাড়ি গিয়ে দেখে আসে মেয়েটি কেমন আছে।

সারাদিন, সারারাত আমি ফোনের কাছে ঠায় বসেছিলাম। অবশেষে মাঝরাতে আমার সেই সহকর্মী আমাকে জানায় তাদের বাড়ি ফাঁকা, কেউ নেই। সেই থেকে মেয়েটির জন্য ভারী উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম।

আজ বুঝলাম কেন আমার মন বারবার মেয়েটির অমঙ্গল আশঙ্কা

করছিল। আপনার সামনে যে মেয়েটিকে বলি দেওয়া হয়েছিল, ওই-ই সেই মেয়ে, গৌরী, আমার অসমবয়সী বন্ধু।'

অর্জুন শ্বাসরুদ্ধ করে এই কাহিনী শুনছিল। সে বলল, 'সেই মেয়েটির আত্মাই কি...'

'হ্যাঁ অর্জুনবাবু। গৌরীর প্রেতাত্মাই আজ আপনার মেয়ের শরীর অধিগ্রহণ করেছে। দেবী বজ্রচর্চিকার উদ্দেশ্যে নিবেদিত নরবলির কুৎসিত উপসর্গ আজ অভিশপ্ত পিশাচিনীর রূপ ধরে আপনার জীবন ছারখার করতে উদ্যত।

দুদিন আগে অবধি সেই প্রেতাত্মার কবল থেকে আপনাদের উদ্ধার করার কোনও উপায়ই আমার জানা ছিল না। তবে মায়ের কৃপায় সেদিন একটি উপায় আমার করায়ত্ত হয়েছে।

আজ অমাবস্যা। আমি জানি কালিকিঙ্কর এখনও চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেনি। আজ সে তার সর্বশক্তি দিয়ে শেষ চেষ্টা করবেই। নইলে তার সমস্ত সাধন, সমস্ত উদ্যোগ বিফলে যাবে। আর আজ আমি এই অতি প্রাচীন চামুণ্ডামন্দিরে বসে আমার সমস্ত পুণ্যফল সম্বল করে উপায়সাধনে প্রবৃত্ত হব, কালিকিঙ্করের সাধনা ব্যর্থ হবে, হবে, হবেই।

'কিন্তু আপনি যে বললেন কালিকিঙ্কর ঠাকুর বজ্রচর্চিকার সাধনা করছেন। ইনি তো...'

'বৌদ্ধ দেবী বজ্রচর্চিকা আর হিন্দু দেবী চামুণ্ডা এক এবং অভিন্ন সাহেব। আজ আমি মা চামুণ্ডার কাছে আহুতি দেব। গৌরীর আত্মাকে নূপুরের শরীর থেকে মুক্তি দেব আর তাতেই কালিকিঙ্করের সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হবে।'

'কিন্তু মৈত্রমশাই, কী করে জানলেন যে কালিকিঙ্কর ঠাকুর এখনও তার সাধনায় সফল হয়নি?'

প্রায় ঘুমন্ত নূপুরের দিকে ইঙ্গিত করলেন কৃষ্ণানন্দ, 'কারণ গৌরীর আত্মা এখনও সম্পূর্ণ পিশাচে পরিণত হয়নি। সে সবার ক্ষতি করতে চেয়েছে, হয়তো একজনের প্রাণও নিয়েছে। একজন ছাড়া, নিখিল। সেই

পিশাচিনী কিছুতেই নিজের ভাইয়ের ক্ষতি করতে পারেনি। আর আজকে নিখিলই হবে আমার সর্বোত্তম অস্ত্র।'

'কিন্তু কেন? নিখিলই কেন?'

'এটা আমাকেও ভাবাচ্ছিল। গৌরীর আত্মা সবাইকে মারতে চাইছে, সবার ক্ষতি চাইছে, কিন্তু নিখিলের ওপর তার আক্রোশ নেই কেন?

সেদিন গৌরীর মায়ের সঙ্গে কথা বলেই সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

গৌরীর মা গর্ভবতী, আসন্নপ্রসবা। গৌরী জানত ওর একটা ভাই আসছে। সেই না দেখা, না পরিচিত হওয়া ভাইয়ের প্রতি এক আশ্চর্য মমতা, অদ্ভুত ভালোবাসা জন্মেছিল মেয়েটির। সেই ভালোবাসা কোনও কারণেই, কোনও তন্ত্রসাধনাতেই, কোনও অপশক্তিতেই নষ্ট হয়নি। তাই গৌরীর আত্মা সবার ক্ষতি চাইলেও নিখিলের কোনও ক্ষতি চাইতে পারেনি।

আর আজ গৌরীর সেই নিজের অদেখা ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসাই আপনাকে রক্ষা করবে সাহেব। জেনে রাখুন সাহেব তন্ত্র মন্ত্র অপশক্তি সব পারে, শুধু ভালোবাসাকে নষ্ট করতে পারে না, ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড় তন্ত্র, সবচেয়ে বড় জাদু।'

* * *

কালিকিঙ্কর সাধনায় বসেছেন। সেই একই শ্মশানে। সেই একই বেদি। সামনে দেবী বজ্রচর্চিকার মূর্তি সেই একই মূর্তি। কিন্তু বারবার বাধা আসছে কেন। মন উৎকণ্ঠিত, বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কেন?

মনকে একাগ্রচিত্ত করে বজ্রাসনে বসে হুঙ্কার দিলেন মহাঘোরী তন্ত্রসিদ্ধ কালিকিঙ্কর শাস্ত্রী। আজ তাঁকে বিজয়ী হতেই হবে।

* * *

পূজা যত এগোতে লাগল ততই চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল নূপুর। চুল খুলে গেছে তার। চোখে রক্তের আভা। ধীরে ধীরে অল্প অল্প দুলতে লাগল সে।

অর্জুন লক্ষ্য করল ধীরে ধীরে তার মুখের, হাত পায়ের গড়ন বদলে যাচ্ছে। গাল দুটো চুপসে গেল, চোখ ঢুকে গেল অক্ষিকোটিরের মধ্যে। হাত পায়ের মাংস শুকিয়ে গেল, মনে হচ্ছে শুধু কয়েকটা হাড়ের ওপর চামড়ার আস্তরণ জড়িয়ে আছে।

অর্জুন ভয় পেয়ে নূপুরকে ধরতে গেল। নূপুর একঝটকায় সরিয়ে দিল বাবার হাত। তার চুলগুলো তখন উড়তে শুরু করেছে অশনিসঙ্কেতের মতো। একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে কৃষ্ণানন্দের দিকে। রগের শিরা ফুলে উঠেছে তার। সেই অচেনা গলায় ঘরঘরে স্বরে নেপালী ভাষায় বলে উঠল সে, ‘বন্ধ কর শয়তান, বন্ধ কর এসব।’

কৃষ্ণানন্দ সেসবে কান দিলেন না। তিনি তখন হোমের আগুন প্রজ্বলিত করেছেন। গম্ভীর গলায় মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন,

‘চামুণ্ডাট্টহাসাং বিকটিতদশানাং ভীমবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং নীলাম্ভোজ-প্রভাভাং প্রমুদিতপুষং নারমুণ্ডালিমালাম। খাং শূলং কপালং নরশিখরখচিতং খেটকং ধারয়ন্তীং প্রেতারূঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং ভাবয়েচ্চগুরূপাম্। ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ...’

নূপুর হঠাৎই লাফিয়ে উঠল ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো। তারপর দুহাত বাড়িয়ে ঝাঁপ দিল মৈত্রমশাইয়ের গলা লক্ষ্য করে। অর্জুন সতর্কই ছিল। নূপুরের হাত মৈত্রমশাইয়ের গলা অবধি পৌঁছবার আগেই সে ধরে ফেলল নূপুরকে। তার দুই বাহুর মধ্যে ছটফট করে উঠল একরত্তি মেয়েটা। তাকে ধরে রাখতে পারছে না অর্জুন। ওইটুকু মেয়ের শরীরে যেন অজুত হস্তীর বল। নূপুরের চোখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। বেরিয়ে এসেছে শ্বদন্ত দুটি। আর সেই সঙ্গে তার মুখ থেকে অচেনা নেপালি স্বরে ছিটকে আসছে উচ্চকিত অভিশাপ আর দুর্বাক্যের স্রোত।

কোনওমতে নূপুরকে আটকে রাখল অর্জুন। ততক্ষণে তাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে নূপুর। অর্জুনের হাত, গলা, গাল থেকে রক্ত ঝরছে অঝোরধারায়। নিখিল দিদির এই রূপ দেখে সিঁটিয়ে গেছে মন্দিরের এক কোণে। আর্তনাদ করে কাঁদছে সে।

হোম সম্পন্ন করে নূপুরের দিকে চাইলেন কৃষ্ণানন্দ। যজ্ঞের ফোঁটা

হাতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নূপুরের কপালে সেই ফোঁটা পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মা, তুমি সাক্ষাৎ জগদীশ্বরী, মহাগৌরী, ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপা। অপশক্তির সাধ্য কি তোমার শুদ্ধ আত্মাকে কলঙ্কিত করে? মুক্ত হও মা, শুদ্ধ হও। যে মহাগৌরী স্বয়ং ভগবতীর অংশ তার কি এই পিশাচযোনি সাজে?'

কপালে ফোঁটা পরাবার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল নূপুর। তারপর তার এক ধাক্কায় অর্জুন ছিটকে পড়ে গেল চামুণ্ডামূর্তির পায়ের কাছে। যজ্ঞবেদির কাছে পূজার উপকরণ হিসেবে সেই মাংস কাটার ছুরিটি রাখা ছিল। সেই তুলে নিয়ে নূপুর অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে আমার শিকার খেতে দিবি না বুড়ো? মর, তুই মর।'

অর্জুন অসহায় স্তম্ভিত চোখে দেখল উন্মাদিনী নূপুর মৈত্রমশাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে ছুরি হাতে। কৃষ্ণানন্দ কিন্তু অটল। তিনি চোখ বন্ধ করে কীসের যেন ধ্যান করছেন।

ঠিক তখনই উঠে দাঁড়াল নিখিল। না, তার দিদিকে এই কাজ কিছুতেই করতে দেবে না সে। 'দিদি' বলে চিৎকার করে সে দৌড়ে গেল নূপুরের সামনে। আর সবেগে নেমে আসা ছুরিটা গেঁথে গেল নিখিলের বুকে।

অর্জুন আর্তনাদ করে উঠল। কৃষ্ণানন্দ চোখ খুললেন না। তাঁর মন্ত্র আরও উচ্চকিত হয়ে উঠল। অর্জুন ধড়মড় করে উঠে দৌড়ে এল নিখিলের কাছে।

রক্তের ছিটে এসে লেগেছে নূপুরের মুখে, গায়ে। খানিকক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল সে। তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল ছুরিটা। নূপুরকে দেখে মনে হল যেন এক সুদীর্ঘ নিদ্রার ঘোর কেটে জেগে উঠছে সে। একটু পর ক্লান্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে নূপুর। তারপর তার কণ্ঠ থেকে অচেনা মেয়ের গলায় আর্তনাদ ভেসে আসে, 'তোর সঙ্গে এই জন্মে আর দেখা হল না রে ভাই। এই কষ্ট আমি ভুলব না। তোর সঙ্গে কোনও না কোনওদিন আবার দেখা হবে, অন্য কোনও জন্মে, অন্য কোনও সংসারে...'

* * *

হল না। আজও হল না। ব্যর্থ হলেন কালিকিঙ্কর। তিল তিল করে সারাজীবন ধরে গড়ে তোলা সাধনবিভূতি আজ সব নষ্ট হয়ে গেল। ইহজীবনে এই সাধন আর সম্ভব হবে না।

চোখ বন্ধ করলেন কালিকিঙ্কর। কোথা থেকে একটা হাসির শব্দ ভেসে আসছে না? হ্যাঁ, ওই তো। ওই তো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন তিনি। কে হাসে অমন করে?

চোখ খুললেন কালিকিঙ্কর। কোথাও কোনও আলো নেই। নীরব নিশ্ছিদ্র অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে নিরেট পাথরের মতো। ক্রমেই যেন যেই পাথুরে অন্ধকারের বুক চিরে আবার ভেসে এল সেই তীক্ষ্ণ, ছুরির মতো ধারালো হাসি।

এবার তার সঙ্গে মিশেছে আরও একটা শব্দ। খটখট, খটাখট। হাড়ের শব্দ।

সামনের অন্ধকার একটু নড়ে উঠল নাকি?

চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন কালিকিঙ্কর। দেবী বজ্রচর্চিকা জাগ্রত হয়েছেন। ব্যর্থ সাধকের জীবনপাশ ছিন্ন করতে এগিয়ে আসছেন তিনি। তবে তাই হোক। ওঁ বজ্রচর্চিকায় হুং।

* * *

নিখিল সেরে উঠেছে। ছুরির আঘাত তেমন গভীর ছিল না। নূপুর আবার আগের মতো হয়ে গেছে। অর্জুন সোফিয়াকে বলে দিয়েছে এই ডকুমেন্টারি সে করবে না। তার বদলে অন্য বিষয় বেছে নিয়েছে সে, ভারতের বিভিন্ন পরিত্যক্ত মন্দির ও তাদের ইতিহাস।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে ছাড়ার ইচ্ছে ছিল না অর্জুনের। কিন্তু তাঁকে তো যেতেই হবে। আবার কোথায় কোন গৌরী তার বাঙালিদাদুর পথ চেয়ে বসে আছে কে জানে?

ডাইনিবুড়ি

ভবতারণ চাটুজ্জে ক্লাবঘরে ঢুকেই থমকে গেলেন।

চাটুজ্জেমশাই এই পাড়ায় এসেছেন বছর দেড়েক হল। এই ক্লাবে তাঁর আড্ডা জমে নিত্যই। কিন্তু আজকের মতো এত থমথমে আবহাওয়া আগে দেখেননি তিনি। যে ক্লাবঘরে আড্ডা জমলে দূর দূর থেকে হইহই শোনা যায়, আজ সেখানে শ্মশানের স্তব্ধতা।

চাটুজ্জেমশাই তক্তপোশে বসে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার? আজ সবাই এত চুপচাপ যে?'

সবাই একটু সরে সরে চাটুজ্জেমশাইকে জায়গা দিল। ভজা মুখ ভেটকে বলল, 'কী আর করি বলুন, কেউ যদি ক্লাবে আসা ইস্তক গোটা সন্ধে ধরে কাঁদুনি গায়, হইহল্লা করার মেজাজ থাকে, বলুন?'

'এই রে,' আঁতকে ওঠার অভিনয় করলেন চাটুজ্জেমশাই, 'কার জীবনে এত দুঃখ শুনি?'

উত্তর দিল বিশুই। ধরা গলায় বলল, 'চাকরিটা ছেড়ে দেব চাটুজ্জেমশাই। আর সহ্য হচ্ছে না।'

চাটুজ্জেমশাই অবাক স্বরে বললেন, 'সে কী? এই তো ক-দিন আগেই এই মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের চাকরিটা পেলে হে। মাস চারেকও হয়নি, এখনই ছাড়ার কথা ভাবছ কেন?'

গদাই খিঁচিয়ে উঠে বলল, 'বাবুর নাকি এত খাটাখাটনি পোষাচ্ছে না। রোদ বৃষ্টিতে এত দৌড়দৌড়ি, রেগুলার টার্গেটের প্রেশার, এসব নাকি উনি নিতে পারছেন না। তার ওপর বাবুর নাকি হাসপাতাল বা



নার্সিংহোমে ঢুকলে ডিসইনফেকটেন্টের গন্ধে মনে হচ্ছে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। যত্ত সব ঢং।'

চাটুজ্জেমশাই মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'শোনো বিশু, চাকরিটা অমন বিনা কারণে ঝট করে ছেড়ো না। মেডিক্যাল লাইনে কাজ করা কিন্তু মহা পুণ্যের কাজ হে। কত লোকের রোগশান্তি নিবারণ করো। কত লোকের প্রাণ বাঁচাও। কত লোকের আশীর্বাদ কুড়োও। এসব কি কম পাওয়া হে?'

বিশু গোঁজ হয়ে বসে রইল। সেই দেখে কথা ঘোরানোর জন্য ভজা বলল, 'আচ্ছা চাটুজ্জেমশাই আপনিও তো শুনি এককালে সেলসে কাজ করেছেন কিছুদিন। তা এই মেডিক্যাল লাইনেও ছিলেন নাকি কখনও?'

চাটুজ্জেমশাই বললেন, 'না হে। দু-এক জায়গায় সেলসের চাকরি করে বুঝে গেছিলাম যে ওই লাইন আমার জন্য নয়। তারপর তো সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিয়ে জঙ্গল দেখভালের চাকরিতে ঢুকে পড়লাম। সে চাকরি এত ভালো লেগে গেল যে আর ফিরে তাকাইনি। তবে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেডিক্যাল লাইনে ছিল বটে। আর তার সঙ্গে আমার একটা আশ্চর্য গা ছমছমে অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার শুনবে নাকি?'

নেকি অওর পুছপুছ? ভজা ঝট করে চা আর ফুলুরির অর্ডার দিয়ে এল। বিশু নিজেই গিয়ে জানালা-টানালা বন্ধ করে একটা কছুয়া মার্কা কয়েল জ্বালিয়ে দিয়ে এল। আমরা ঘিরে বসলাম চাটুজ্জেমশাইকে। গলা খাঁকারি দিয়ে তাঁর ফেমাস গল্প বলা শুরু করলেন চাটুজ্জেমশাই।

'অনেকদিন আগেকার কথা। তখনও বিয়ে হয়নি, সবে চাকরি পেয়েছি। পোস্টিং বাঁকুড়া বর্ধমান রেঞ্জে। অফিস দুর্গাপুরে । অফিসে অবশ্য কমই হাজিরা দিতে হয়, জঙ্গলে জঙ্গলেই কেটে যায় বেশিরভাগ সময়। একটা দোতলা বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিয়ে থাকি। একটা ছোকরা গোছের ছেলে সঙ্গে থাকে, রান্নাবান্না করে, ফাই ফরমাশ খাটে, এটা-ওটা এনে দেয়। ঠিকে ঝি এসে দু'বেলা বাসন মেজে দেয় আর ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়।

আমি চাকরি করি, জঙ্গলের সৌন্দর্যে ডুবে যাই, আর শহরে ফিরে এসে আড্ডা মেরে বেড়াই।

এমন সময় আলাপ হল সংগ্রামের সঙ্গে।

সংগ্রাম ছিল শ্যামবাজারের বনেদি রায়চৌধুরী বাড়ির ছেলে। পড়াশোনা মিত্র ইনস্টিটিউশন আর সিটি কলেজে। চাকরি করে একটি নামী ফার্মা কম্পানিতে, অ্যাজমা ডিভিশনের মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ, অর্থাৎ এম আর হিসেবে। এরিয়া ছিল বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর বর্ধমান। হেড কোয়ার্টার দুর্গাপুর। তখন ওর ওই এলাকায় মাস দুয়েক হয়তো হয়েছে। বয়সে আমার থেকে পাঁচ-ছ'বছরের ছোট হলে কী হবে, বিলক্ষণ চতুর আর বলিয়ে কইয়ে বলে দু'দিনেই আলাপ জমে গেল।

আলাপ হওয়ার আরও একটা কারণ অবশ্য দুজনেরই ঘোরাঘুরির নেশা। সারা সপ্তাহ দুজনে কাজে কম্মে ব্যস্ত থাকি। আর উইক-এন্ড হলেই আশপাশের জায়গা ঘুরে বেড়াই। এই করে পুরো জঙ্গলমহল, মায় ঝাড়খণ্ডের আদ্ধেকটা ঘোরা হয়ে গেল। তখন অবশ্য ঝাড়খণ্ড হয়নি, জায়গাটা বিহারের অংশ ছিল।

একবার এরকমই ঘুরতে বেরিয়েছি। তখন শীতকাল, ঘুরে বেড়ানোর জন্য আদর্শ সময়। আমাদের এবারকার গন্তব্য পাঞ্চেত ড্যাম আর সংলগ্ন বন-জঙ্গল।

গাড়ি চলছে আশির ওপর। জানালার কাচ নামানো। জানালা দিয়ে দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া আসছে, অথচ সংগ্রামের মুখ দেখি ভার। হুঁ হাঁ ছাড়া কথাই বলছে না। কপালে চিন্তার ভ্রুকুটি। অন্যমনস্ক হয়ে আছে। দু-একবার জিজ্ঞেস করলাম কী হল। কিন্তু চাপাচাপিই সার, ছেলে দেখি কিছুতেই কিছু বলে না।

অবশেষে একজায়গায় চা খেতে বসে ছোকরাকে চেপে ধরলুম। তবে সে কি আর সহজ ছেলে? অনেক পীড়াপীড়ির পর মুখ খুলল। তারপরেই জানতে পারলাম তার দুঃখের কারণ কী।

কম্পানি নাকি ছোকরার ওপর হঠাৎ করেই বিপুল টার্গেট চাপিয়ে দিয়েছে। সে নাকি দুশো পার্সেন্ট গ্রোথ ডেলিভার করার মতো ভয়াবহ

ব্যাপার। ছোকরা সপ্তাহ ধরে পাগলের মতো ডাক্তার, হাসপাতাল, নার্সিং হোম ভিজিট ইত্যাদি করেও কিছু সুবিধে হচ্ছে না। এদিকে মার্চ্ এন্ড সামনেই। টার্গেট না করতে পারলে চোখে সর্ষেফুল দেখা নিশ্চিত।

ওর অবস্থা দেখে আমিই ওকে একটা পথ বাতলালাম।

সেই সময় একটা সরকারি স্কিম ছিল। সরকার থেকে গ্রামেগঞ্জে ওষুধ সাপ্লাই করার জন্য এলাকাভিত্তিক মেডিসিনের হোলসেলার বানানো হত। শুধু তাই নয়, সেই হোলসেলাররা রীতিমতো সাবসিডিও পেত সরকার থেকে। তার জন্য একটা আলাদা লাইসেন্স করাতে হত। তবে তখন সরকারের সঙ্গে এম আর'দের ইউনিয়নের হেবি দোস্তি। ঘাঁতঘোঁত জানা থাকলে অনেক এম আর'রাই ওই চ্যানেল ধরে রুরাল মেডিসিন স্টকিস্ট বানিয়ে টার্গেট করে নিত। লাইসেন্স টাইসেন্স কোনও ব্যাপারই না। ইউনিয়ন বললেই লাইসেন্স, ইউনিয়ন বললেই ব্যবসা।

তবে চাপ ছিল একটাই। সেক্ষেত্রে এম আর মশাইদের নিজেদের এরিয়ার গ্রামীণ এলাকা একেবারে নখদর্পণে রাখতে হত। নইলে অডিট হলে চাকরি নট হতে বেশি সময় লাগত না।

আমার বাতলানো রাস্তাটা শুনে ঘাড় নাড়ল সংগ্রাম, 'কথাটা কি আমার মাথায় আসেনি চাটুজ্জেদা? কিন্তু সবে দু'মাস হল এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছি। এখনও দুর্গাপুর বর্ধমানই ঠিকঠাক চিনে উঠতে পারলাম না। গ্রামগঞ্জের তো কথাই নেই। এই ক'দিনে তিন-তিনখানা জেলার কোথায় কোথায় কোন কোন বনেবাদাড়ে ঘুরব আর স্টকিস্ট অ্যাপয়েন্ট করব বলো তো?'

আমি মৃদু হেসে অভয় দিলাম, 'আরে ভাই, চিন্তা করছিস কেন? আমি তো আছি না কি?'

ততদিনে কাজের সুবাদে জঙ্গলমহলের অনেক গ্রামগঞ্জই চিনে ফেলেছিলাম। ভাবলাম ছেলেটাকে একটু হেল্প করি। বেশি কিছু না, চেনাজানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া, আলাপ করিয়ে দেওয়া, এই তো।

আগেই বলেছি, তখন সবে শীতকাল শুরু হয়েছে। তোমরা জানো নিশ্চয়ই, বর্ষার শুরু আর শীতকাল, এইসময়েই শ্বাসকষ্ট বাড়ে। বছরের

এই দুটো সময়টাই অ্যাজমা পেশেন্টদের জন্য অত্যন্ত প্রাণঘাতী। আমি এসব খুব ভালো করে জানি কারণ আমার ঠাকুর্দা ছিলেন ক্রনিক অ্যাজমার পেশেন্ট। প্রায়শই শ্বাসকষ্টে ভুগতেন। মাঝে মাঝে অবস্থা এমনই গুরুতর হত যে অ্যাস্থালিনের ইনহেলারেও শানাত না, ডেরিফাইলিন ইনজেকশনও দিতে হত। তাই অ্যাজমা পেশেন্টদের কষ্টের ব্যাপারটা বুঝি।

পাঞ্চেত ড্যাম থেকে ফিরে আসার পরের সপ্তাহেই সংগ্রামকে নিয়ে চললাম রুরাল স্টকিস্টের খোঁজে। সঙ্গী আমার অনেকদিনের সুখ-দুঃখের ল্যামব্রেটা স্কুটারটা। এই বুড়ি স্কুটারটা যে আমাকে কত সার্ভিস দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

এখনও দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর যাওয়ার সেই রাস্তাটার কথা মনে আছে। জঙ্গল ছাওয়া রাস্তা মায়ামেদুর রাস্তা। বড়জোড়া থেকে বেলিয়াতোড় হয়ে সোজা রাধানগরে ওঠে। সেখান থেকে জয়কৃষ্ণপুর হয়ে সোজা বিষ্ণুপুর। রাস্তায় একের পর এক ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় বাংলার গ্রাম। তাদের নামগুলিও বড় চমৎকার, কারসানি, হাসিগ্রাম, পাঞ্চাল ইত্যাদি।

প্রথম থামলাম কারসানিতে। একটানা গাড়ি চালিয়ে গলাটা শুকিয়ে গেছিল। তাই একটা ঝুপড়ি আর তার সামনে মাটির উনুনে বসানো কেটলি নজরে আসামাত্র স্কুটারটা দাঁড় করালাম। দোকানের সামনে একটা নড়বড়ে বেঞ্চ। সেখানে কয়েকজন স্থানীয় লোক বসে রাজা উজির মারছিল। আমাদের দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন বাবু, বসুন।'

আমরাও যথেষ্ট শহুরে গাম্ভীর্যের সঙ্গে ভাঙা বেঞ্চিতে অধিষ্ঠান করলাম।

চা আর লেড়ো বিস্কুট খেতে খেতে এদিক ওদিক তাকিয়ে মন প্রসন্ন হয়ে গেল। চারিদিকে উঁচু উঁচু শাল সেগুন গাছের সমারোহ। যতদূর চোখ যায় মাটি ছেয়ে আছে শুকনো পাতায়। বাতাসে একটা শিরশিরানি ভাব। রাস্তা দিয়ে আদিবাসী মেয়েদের দল মাথায় শুকনো কাঠকুটো চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

চায়ের দাম দিয়ে উঠে আসছি, এমন সময় একটা বুড়ি কাছে এসে

দাঁড়াল। মাথায় শন পাকানো চুল, সারা গায়ে কুঁকড়ে যাওয়া চামড়া, পরনে নোংরা শতচ্ছিন্ন শাড়ি। বুড়ি ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলল, 'ও ছেইলারা, একলাই যে খাঁইয়ে লিলি, বুড়িটাকে কিছু দিবি নাই?'

বুড়িকে দেখেই সংগ্রাম নাক কুঁচকোল। তার কারণ আছে জানি। ও একটু পিটপিটে ছেলে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। অমন শনের দড়ির মতো চুল, নোংরা হাত পা আর পিচুটিভরা চোখ নিয়ে সামনে যদি কেউ এসে দাঁড়ায়, তাহলে এমনিতেই অভক্তি আসতে বাধ্য। সংগ্রাম 'হেই বুড়ি হ্যাট হ্যাট' করে তাড়িয়ে দিতে চাইল মহিলাকে। আমি আবার চাপা গলায় বললাম, 'এসব কী অসভ্যতা হচ্ছে সংগ্রাম? এইভাবে কেউ কাউকে বলে?'

সংগ্রাম মুখটা বিচ্ছিরিভাবে বেঁকিয়ে বলল, 'তুমি চুপ করো। এইসব ডার্টি ফিলদি ভিখিরি-টিকিরি দেখলেই আমার ঘেন্না করে।'

আমি আর কিছু বললাম না। কারও পছন্দ-অপছন্দ তো আমি বদলাতে পারব না দশটা টাকা দোকানিকে দিয়ে বললাম, 'বুড়িমাকে কিছু খেতে দিও।'

সংগ্রাম হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বলল, 'দেখো কাকা, টাকাটা আবার মেরে দিও না যেন।'

দোকানি যেন কথাটা শুনে শিউরে উঠল। চাপাগলায় বিড়বিড় করে বলল, 'বাপ রি বাপ, ওই ডানবুড়ির টাকা মাইরে কি নিজের মরণ ডাইকে আনব ন কি গ?' তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে চাপাগলায় বলল, 'আর আপনার বন্ধুটাকে সাবধানে থাইকতে বলবেন বাবু। উ বুড়ি সিধা লোক লয়।'

কথাটা তেমন আমল দিলাম না। গ্রাম্য লোকেদের অনেক কিছু ফালতু কুসংস্কার থাকে। সবকিছুতে কান দিতে নেই।

স্কুটারে স্টার্ট দিয়েছি কি দিইনি, এমন সময় দেখি বুড়ি একটু দূরে এসে দাঁড়িয়ে রইল। আমি কিছু বলার আগেই থুতু ফেলে বলল, 'তুঁই ভাল ছেইলা বঠিস। তবে উ ভাল লয়। উয়ার কপালে দুঃখ আছে।'



* * *

বুড়ির কথাটা যে এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে কে ভেবেছিল? হাসিগ্রাম আসতে আসতে বুঝলাম সত্যিই কপালে দুঃখ আছে। অনেকক্ষণ থেকেই দেখছিলাম যে আকাশের মুখ ভার। এবার জঙ্গল ছাড়িয়ে খানিকটা খোলা রাস্তা পেতেই দেখলাম যে শীতের আকাশে অকালে জলভরা মেঘ। বৃষ্টি হবে হবে মনে হচ্ছে। গাড়ির গতিবেগ বাড়াতেই হল। এদিকে সময়টাও ভালো না, সন্ধে নেমে আসছে দ্রুত। এই সাইডে মাঝে মাঝেই রাস্তায় হাতিদের দল নেমে আসে, সেটাও একটা বড় চিন্তার কারণ।

গাড়ি চালাচ্ছি জোরেই। একটু এগোলেই জয়কৃষ্ণপুরের জঙ্গল, তারপরেই বিষ্ণুপুর। বৃষ্টি, সন্ধে আর হাতি, তিনটের যে কোনও একটা নেমে আসার আগেই বিষ্ণুপুর পৌঁছতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য।

কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হল না। ঠিক সন্ধের মুখে নামল প্রবল বৃষ্টি। আমরা তখন মাঝরাস্তায়। শীতের বৃষ্টি যে কী মারাত্মক সে আর তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমরা তড়িঘড়ি করে একটা মস্ত বড় নিমগাছের নীচে দাঁড়ালাম।

এখনও দিব্যি মনে আছে দৃশ্যটা। স্কুটার বন্ধ করে দুই বন্ধু ভূতের মতো ভিজে চুপচুপে হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নিমগাছটা মস্ত বড়, অত বড় নিমগাছ এই অঞ্চলে চট করে দেখা যায় না। গোড়াটা বেড় দিয়ে কোমরসমান উঁচু করে পাথরে বাঁধানো। সেখানে উঠে জবুথবু হয়ে বসলাম।

অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে দশহাতের দূরের কিছু দেখা যায় না। আমার যে খুব অসুবিধা হচ্ছে তা নয়। তবে সংগ্রামের অবস্থা ইতিমধ্যেই বেহাল। সে কলকাতার ছেলে, জন্মে গ্রামগঞ্জ দেখেনি। জঙ্গল দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাহারায় একলা আটকে পড়েছে, অথচ হাতে কম্পাস নেই।

শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি আর ভাবছি এখন বুনো হাতি চলে এলেই চিত্তির, এমন সময় কানে এল সাইকেলের বেলের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ।

ডাইনে ঘাড় ঘোরাতেই দেখি সুঁড়িপথ বেয়ে একটা লোক সাইকেল

চড়ে এদিকেই আসছে। তোমরা অনেকেই হয়তো জান না, তখন সাইকেলের পেছনের চাকার সঙ্গে ছোট্ট একটা ডায়নামো লাগানো থাকত আর সামনে হ্যান্ডেলে লাগানো থাকত একটা ছোট হেডলাইট। চাকা ঘুরলে হেডলাইট জ্বলত। গ্রামেগঞ্জের অন্ধকার রাস্তায় চলতে খুব কাজের জিনিস। এটাতেও দেখি তাই। বর্ষার অবিরল বারিধারার মধ্যে একটা ক্ষীণ আলো হেলতে দুলতে আমাদের সামনে এসে থাকল। লোকটা বাঁকড়োর উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল, 'কী বাবুরা এখানে আটক হই গেছেন ন কী?'

সংগ্রামকে দেখে মনে হল যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। সে তড়বড় করে পুরো ব্যাপারটাই খুলে বলল। এমনকি কীসের খোঁজে এসে আটকে পড়েছে সেটাও জানাল সাতকাহন করে।

লোকটার চোখদুটো অন্ধকারের মধ্যেই জ্বলজ্বল করে উঠল। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'ওষুধ বিকেন বাবু? শ্বাসের ওষুধ? তাহলে আমার সঙ্গে আসেন।'

আমি তো অবাক। অ্যাজমার ওষুধ বেচি শুনে লোকটার এত আনন্দিত হওয়ার কী হল? তবে ভাবনাচিন্তার আর সময় পেলাম না। লোকটা সামনের দিকে হাঁটা শুরু করতেই সংগ্রাম আমার পেটে একটা কনুইয়ের গুঁতো মেরে এগোতে লাগল। আমি চাপা গলায় বললাম, 'এ কী, কোথায় যাচ্ছিস? জানা নেই শোনা নেই, একটা লোকের কথায় শুনে...'

সংগ্রাম চাপা গলায় বলল, 'আহ, চুপ কর তো। কোথায় আর যাবে। নিশ্চয়ই ওর বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার থেকে কারও বাড়িতে বসা তো অনেক বেটার।'

অগত্যা আমিও পেছন পেছন চললাম। লোকটা এমন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যার মাথায় বড় বড় শালগাছের দল শাখাপ্রশাখা বিছিয়ে চাঁদোয়া বানিয়ে রেখেছে। ফলে অবিরাম ধারাপাত থেকে কিছুটা হলেও গা বাঁচিয়ে হাঁটতে থাকলাম। স্কুটারটা ওই নিমগাছের তলাতেই রয়ে গেল।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছুটা হাঁটার পর হঠাৎ করেই সামনেটা পরিষ্কার হয়ে এল। ততক্ষণে বৃষ্টি প্রায় ধরে এসেছে। সন্ধের নিভে আসা অন্ধকারে

সামনে ফুটে উঠল একটা ছোট্ট গ্রাম। বড়জোর দশ-বিশ ঘর বাসিন্দা। আর গ্রামের একদম সামনে একটা সাজানো গোজানো মাটির দোতলা বাড়ি, মাথায় টিনের ছাউনি। এরকম বাড়ি বাঁকুড়ার গ্রামেগঞ্জে হরবখত দেখা যায়।

লোকটা সেই বাড়ির দাওয়ায় উঠে একটা হাঁকার পাড়ল, 'ও বুল্টির মা, দ্যাখ কারা আইসেছেন।'

একটু পরেই এক মহিলার অবয়ব দেখা গেল ঘরের দাওয়ায়। গলা অবধি ঘোমটা টানা পেছনে পেছনে একটি বাচ্চা মেয়ে, বছর দশেক বয়েস। দাওয়ায় একটা হ্যাজাক জ্বলছিল। তার আলোয় দেখলাম ভারী মিষ্টি দেখতে বাচ্চাটি। বউটির পরনে ছাপা শাড়ি, মেয়েটির গায়ে ফুলফুল ছাপ ফ্রক। অল্প আলোয় দেখা যায় নিকোনো দাওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠোন। উঠোনের এক ধারে মস্ত ধানের গোলা। ঘরের ভেতরেও হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। তার মৃদু আলো জানলা পেরিয়ে উঠোনে দাওয়ায় এসে পড়ছে। বাড়ির পাঁচিল ঘিরে ফনিমনসা আর নয়নতারার ঝোপ। এক কোনায় একটা করবী গাছ, তার গা বেয়ে হাসনুহানার লতা উঠেছে বাড়ির সামনে একটা ট্রাক্টর রাখা। সব মিলিয়ে একটা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের চিহ্ন। সর্বত্র গ্রামবাংলার চিরপরিচিত লক্ষ্মীশ্রী ছড়িয়ে আছে।

গৃহস্বামীর আদেশে শুকনো গামছা এল। তাতে গা মাথা মুছে উঠতেই দেখি স্টিলের গ্লাসে করে দুই গ্লাস গরম ধোঁয়া ওঠা চা। আমি চা খাই না, তাই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। সংগ্রাম দু'গ্লাস চা একাই খেল।

চা শেষ হতেই লোকটা কাজের কথা পাড়ল, ও এই এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। টাকাপয়সার কমতি নেই। এখন চাষবাস ছাড়াও অন্য কিছু ধান্দাপানির ফন্দিফিকির খুঁজছে। এই এলাকায় ওষুধ-বিষুধের দোকানপত্তর বিশেষ নেই। বিপদে-আপদে বিষ্ণুপুর বা বাঁকুড়াই ভরসা। আমরা কি ওকে কোনও ওষুধের সাপ্লাইয়ের ব্যবসা দিতে পারি?

এ তো দেখি মেঘ না চাইতেই জল। সংগ্রাম তো পারলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে তড়বড় করে নিজের কম্পানি, কম্পানির ওষুধ, কী কাজে লাগে, এসব ব্যাপারে বিস্তারিত জানাল। তারপর এই ব্যবসায় নামতে গেলে

কত ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন এসবও বোঝাল লোকটাকে। লোকটা তুড়ি মেরে বলল, 'টাকার লাইগে চিন্তা করবেন নি বাবু। যে টাকা বইলছেন তার তিনগুণা টাকা সোবসময় আমার কোঁড়চে গুঁজা থাকে। বলেন, এখি্ন বের কৈরে দিব?'

সংগ্রাম ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলার আগেই ভেতর থেকে গরম গরম লুচি তরকারি এল। আমার যদিও বিশেষ ইচ্ছে ছিল না খাওয়ার। জানি না কেন কিছু আগে থেকেই কেমন যেন গা গুলোচ্ছিল। সেটা অবশ্য অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকার জন্যেও হতে পারে। তবে আশ্চর্য হলাম সংগ্রামকে সেই লুচি তরকারি গোগ্রাসে গিলতে দেখে। শ্যামবাজারের বনেদি রায়চৌধুরী বাড়ির একমাত্র শিবরাত্রির সলতে শ্রীমান সংগ্রামকুমার, যে নাকি 'প্রপার প্লেস অ্যান্ড অ্যামবিয়েন্স' না হলে কিছু খেতেই পারে না, সেও দেখলাম দিব্যি হাত না ধুয়েই মাটির দাওয়ায় বাবু হয়ে বসে ভারী তৃপ্তির সঙ্গে লুচি তরকারি খাচ্ছে। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতে একগাল হেসে বলল, 'তুমিও কিন্তু একবার খেয়ে দেখতে পারতে চাটুজ্জেদা। দুর্দান্ত টেস্ট।'

সংগ্রামের লুচি তরকারি খাওয়া শেষ হলে আমরা উঠে পড়লাম। ততক্ষণে লোকটা রেশন কার্ড ইত্যাদি নিয়ে এসেছে। সংগ্রাম সেসব দেখে জানাল দু'দিন পরেই সব পেপার টেপার নিয়ে চলে আসছে ও।

লোকটা সেই নিমগাছ অবধি আমাদের পৌঁছে দিল। স্কুটারটা সেখানেই ছিল যেমন রেখে গেছিলাম। পুরো রাস্তাটা সংগ্রাম আর লোকটা ব্যবসার ব্যাপারে বকবক করতে করতে এল। ওই কী কী কাগজপত্তর লাগবে, কবে কত টাকা দিয়ে প্রথম স্টকের লট কিনতে হবে সেসব নিয়ে আলোচনা।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ এখন পরিষ্কার। আমার বহু সুখ-দুঃখের সঙ্গী ল্যামব্রেটাটা এক কিকেই মৃদু গর্জন করে উঠল। আমরা লোকটাকে টা টা করে স্কুটারে চড়ে বিষ্ণুপুরের দিকে রওনা দিলাম।

* * *

এই ঘটনার পর প্রায় হপ্তা দুয়েক কেটেছে। ইতিমধ্যে অফিসের চৌহদ্দির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে কালান্তক সেকেন্ড কোয়ার্টার অডিটের দুন্দুভিধ্বনি। সেই বজ্রনির্ঘোষে আমাদের কান পাতা দায়। সবাই চাকরি বাঁচানোর তাগিদে ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটাছুটি করছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন অফিসের পিওন রমজান এসে বলল আমার নামে নাকি আর্জেন্ট ফোন কল। রিসেপশনে কে যেন ফোন করে বলেছে ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়কে এক্ষুনি চাই, যে করেই হোক।

বিরক্ত যে বেহুদ্দ হলাম সে বলাই বাহুল্য। একে অফিসের কাজের চাপ, তার ওপর এই উটকো উৎপাত। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ফোনের রিসিভার কানে তুলে বললাম, 'হু ইজ দিজ?'

ওপার থেকে ভেসে এল, 'আমি অ্যাজমাটেক কম্পানির দুর্গাপুরের ডিস্ট্রিবিউটর সুশীল আগরওয়াল বলছি। আপনি সংগ্রাম রায়চৌধুরীর বন্ধু ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় বলছেন কি?'

বললাম, 'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

ওপার থেকে কিছুক্ষণ সতর্ক নৈঃশব্দ্যের পর সুশীল আগরওয়াল বললেন, 'দাদা, আজ একবার আমার অফিসে আসতে পারবেন? আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। খুব জরুরি।'

বিরস স্বরে বললাম, 'কেন?'

সুশীলবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আপনার সঙ্গে সংগ্রামের লাস্ট কবে দেখা হয়েছে বলবেন একটু?'

খানিক ভেবে বললাম, 'এই তো হপ্তা দুয়েক আগেই। একসঙ্গে বিষ্ণুপুর গেছিলাম। সেখান থেকে নতুন একটা রুরাল স্টকিস্টের খোঁজ নিয়ে এলাম। তারপর থেকে আমি অফিসের কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে... কেন? হয়েছেটা কী?'

ফোনের ওপার থেকে খানিক ইতস্তত অস্বাচ্ছন্দ্যের পর চাপা গলায় ভেসে এল এই ক'টা কথা, 'সংগ্রাম ভালো নেই দাদা, একদম ভালো নেই। আপনি একবার আমার অফিসে আসবেন প্লিজ?'

সুশীল আগরওয়ালের গলায় এমন একটা চাপা ভয় ছিল যেটা আমার

কান এড়াল না। বলতে নেই, অজান্তেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'কেন বলুন তো? এনি প্রবলেম?'

'আপনি আসুন না। ব্যাপারটা খুব কমপ্লিকেটেড। ওর বাড়িতেও বলতে ভরসা পাচ্ছি না। এদিক ওদিক খোঁজখবর করে আপনার খোঁজ পেলাম। তাই ফোনটা করেই ফেললাম।'

কিছুক্ষণ দোনোমোনো করে সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললাম। সুশীল আগরওয়ালের স্টক পয়েন্ট বেনাচিতিতে। আমার অফিস থেকে খুব বেশি দূর নয়। আমার স্কুটারে করে যেতে লাগবে ঠিক কুড়ি মিনিট।

* * *

'সংগ্রাম কোথায় এখন?'

আমার প্রশ্ন শুনে অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসলেন সুশীল আগরওয়াল।

সুশীলজির গোডাউনটা মেন রোড ছেড়ে একটু ভিতরের দিকে, একটা গলির মধ্যে। একটা বিল্ডিংয়ের একতলা আর বেসমেন্ট নিয়ে।

বসেছিলাম একতলার অফিসঘরেই। প্রায়ান্ধকার ঘরটার অর্ধেক জুড়ে আছে দুটো টেবিল আর তিনটে চেয়ার। একপাশে একটা মানুষ সমান উঁচু লোহার ক্যাবিনেট। তার ওপর ধুলোটে কাগজের ফাইল ডাঁই হয়ে আছে। ঘরের কোণে একটা নীচু প্লাস্টিকের টুলের ওপর জলের কুঁজো রাখা।

আমি আর সুশীলবাবু ছাড়া ঘরের মধ্যে আছে আরও দুটো ছেলে। বোঝা যায় যে এরা এই ডিস্ট্রিবিউশন হাউসের কর্মচারী। দেওয়ালে একটা কালো রঙের হোল্ডারে লাগানো একটা হলুদ বাল্ব ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সেদিকে তাকিয়ে শীতের মিঠে রোদটাও কেমন যেন শিরশির করে উঠল।

খানিক ইতস্তত অস্বাচ্ছন্দ্যের পর সুশীল আগরওয়াল বললেন, 'সেটাই তো সবচেয়ে বড় রহস্য দাদা। সংগ্রাম যে কোথায় সেটাই কেউ জানে না।'

আশ্চর্য হলাম, 'কেউ জানে না মানে? ওর ভাড়াবাড়িতে খোঁজ নেননি?'

'নিয়েছিলাম দাদা,' শুকনো গলায় বললেন সুশীলবাবু, 'ওখানে ও নেই।'

'তার মানে?' অজানতেই আমার ভুরু কুঁচকে গেল, 'লাস্ট কবে দেখেছেন ওকে?'

'এই দিন দশ-বারো আগে। আমার অফিসেই।'

'তারপর আর দেখা পাননি?'

'না।'

'তাতে এত বিচলিত হওয়ার কী হল? ইন ফ্যাক্ট বিষ্ণুপুর থেকে ফিরে আসার পর ওর সঙ্গে আমারও যোগাযোগ হয়নি। হতেই পারে কলকাতা গেছে কোনও আর্জেন্ট মেসেজ পেয়ে। সে ফ্যামিলি ম্যাটার হতে পারে, বা অফিসের কাজেও যেতে পারে।'

সুশীলবাবু মাথা নাড়লেন, 'না দাদা। সংগ্রাম অফিসের কাজে কলকাতা যায়নি। কলকাতা অফিসে খোঁজ নিয়েছি।'

কিছু বললাম না। সুশীলবাবুর দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলাম।

সুশীলবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'সংগ্রাম ওর কলকাতার বাড়িতেও যায়নি। ওর বাড়ির ঠিকানা ফোন নাম্বার আমি জানি, একবার ওর কলকাতার ঠিকানায় লেখা একটা চিঠি আমার অফিসে রিডাইরেক্ট হয়ে এসেছিল। তাতে ওর বাড়ির ফোন নাম্বার লেখা ছিল। সেই নাম্বারে কল করে জানলাম যে গত দেড় মাস ধরে সংগ্রাম বাড়ি যায়নি। আর গত দু'হপ্তা ধরে যোগাযোগও করেনি।'

আলোটা একটু নিভু নিভু হয়ে এল। বাইরে মরা শীতের হাওয়া। জানি না কেন, আমার গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠল।

সুশীল আগরওয়াল আরও একটু ঝুঁকে এলেন। 'আপনাকে আরও কয়েকটা কথা বলা খুব জরুরি দাদা। তাই আপনাকে এখানে ডেকে আনা।'

সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে রইলাম।

'যেদিন আপনি আর সংগ্রাম ফিরে এলেন বিষ্ণুপুর থেকে, তার পরের

দিনের ঘটনা। সংগ্রাম এখানে এসেছে সকালে, দিনের টার্গেট একবার দেখে নিয়ে বেরোবে। এমন সময় বললাম, 'কাল নাকি তোমার কোন বন্ধুর সঙ্গে রুরাল স্টকিস্ট খুঁজতে গেছিলে? কিছু হল তার? পেলে কাউকে?' শুনে সংগ্রাম ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, একজনের সঙ্গে দেখা হল বটে। খুব ভালো পার্টি, পয়সাওয়ালা লোক। কাল যাব কাগজপত্তর আনতে' কথা বলার সময় দেখলাম সংগ্রাম সামান্য হাঁপাচ্ছে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হে, হাঁপাচ্ছ কেন? দৌড়ে এলে নাকি?' সংগ্রাম বলল, 'আরে তেমন কিছু না। কাল বৃষ্টিতে ভিজে বুকে একটু সর্দি বসেছে, আর কিছু না। রাতে গরম জলে দু'পেগ রাম মেরে দেব, সব সেট হয়ে যাবে, হ্যা হ্যা হ্যা।'

তার পরের দিন শুনলাম সংগ্রামের জ্বর এসেছে। আমি শুনে ঝটপট করে একটা ছেলেকে দিয়ে কয়েকটা ওযুধ পাঠিয়ে দিলাম... একা থাকে, বাড়ি থেকে খাবার দাবারও রান্না করে পাঠালাম।'

শুনে আমার নিজেকে একটু অপরাধী লাগল। সেদিনের পর থেকে কাজের চাপে ছোকরার আর বিশেষ খবর-টবর নেওয়া হয়নি। অথচ বন্ধু হিসেবে এসব আমারই করার কথা।

বললাম 'তারপর?'

'সংগ্রাম সেরে উঠতে সময় নিল দিন পাঁচ-ছয়। এই ক'দিন আমার অফিসের একটা ছেলে, নাম মানস, তার হাত দিয়ে নিয়মিত ওকে ওষুধ খাবার এসব পাঠিয়ে গেছি।

শেষের দিন মানস এসে একটা অদ্ভুত কথা বলল। এই ক'দিন সংগ্রাম নাকি ওষুধ বা খাবার ওর হাত থেকে নেয়নি। দরজার আড়াল থেকে বলেছে বাইরে রেখে যেতে। এমনকি কথা-টথাও বিশেষ বলেনি। আমি ভাবলাম হবেও বা, সর্দিকাশি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ। তাই হয়তো এই সতর্কতা।

সংগ্রাম কাজে জয়েন করল আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ আগে। দেখলাম একদম ফিট। অসুখ থেকে ফিরে ছোকরা একেবারে চনমনে ঝরঝরে হয়ে উঠেছে। আমারও দেখে ভালো লাগল। আমি পরের দিনই

মানস আর সংগ্রামকে ওই লোকটার খোঁজে পাঠিয়ে দিলাম।

দু'জনে যখন ফিরে এল তখন মানসের ধুম জ্বর। আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। একে তো শুনলাম দু'জনে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নাকি লোকটার বাড়িঘরের খোঁজ পায়নি। তার ওপর মানস অসুস্থ। মানস হচ্ছে আমার ডান হাত। ও বসে যাওয়া মানে আমার কাজকর্মের ভয়ানক ক্ষতি। রাগের মাথায় দুটো কথা শুনিয়ে দিলাম সংগ্রামকে। একে তো টার্গেট কীভাবে হবে সে নিয়ে কোনও রাস্তা দেখাতেই পারছে না। এমন এক স্টকিস্টের খোঁজ নিয়ে এল, যার বাড়িঘরের কোনও পাত্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে সেই বুনোহাঁসের পেছনে ছুটে আমার সবচেয়ে কাজের ছেলেটা বসে গেল। রাগ হবে না?

সংগ্রাম মাথা নীচু করে পুরোটা শুনছিল। একটা কথাও বলেনি। আমার কথা শুনে একবার ঘসঘসে স্বরে শুধু বলল, 'ওষুধ দাও সুশীলদা। ওষুধ চাই।'

আমার মেজাজ গেল আরও খাপ্পা হয়ে। একগাদা ওষুধ পথ্য খাবার-দাবার দিয়ে ঠিক করলাম ছেলেটাকে, তার জন্য একটা শুকনো ধন্যবাদ জানানো দূরস্থান, মানসকে কোথায় না কোথায় গিয়ে অসুস্থ করে নিয়ে এল, এখন আমার ওপরেই চোটপাট? টার্গেট কী করে হবে তার নাম-ঠিকানা নেই, মাঝখানে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে রইলি, এখন ওষুধ চাই, ওষুধ চাই বলে চোটপাট করছিস? যা দেব না তোকে কোনও ওষুধ।

শুনে মাথা নাড়লাম, বটেই তো। সুশীল আগরওয়াল ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যবসার ক্ষতি হলে তাঁর রাগ করার হক আছে বই কি। প্রশ্ন করলাম, 'সংগ্রাম কী বলল?'

সুশীলবাবু একটু এগিয়ে এলেন, 'সেটাই তো সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা চ্যাটার্জিসাহেব। আগেই বলেছি আমার বকাবকি করার সময় একেবারে সংগ্রাম চুপচাপ ছিল। একটা কথাও বলেনি। আপনি যে চেয়ারটায় বসে আছেন, ঠিক ওই চেয়ারটাতেই বসে ছিল ও। মাথা নীচু করে। যেভাবে হেডমাস্টারের বকা শুনে বাধ্য ছাত্র মাথা নিচু করে বসে থাকে, ঠিক



সেরকম। আমার শেষ কড়া কড়া কথাগুলো শুনে চোখ তুলল একবার। আর আমি চমকে গেলাম।'

ঘরের আলোটা ঠিক এইসময়েই ভোল্টেজ কমে একটু নিভু নিভু হয়ে এল। হঠাৎ করে শীতটাও একটু বেড়ে উঠল যেন। অজান্তেই আমার গলার স্বর নেমে এল, 'কী বলল সংগ্রাম?'

সুশীলবাবুও একটু ঝুঁকে এসে চাপা গলায় বললেন, 'কী বলব দাদা, সংগ্রামকে আমি ওই অবস্থায় কখনও দেখিনি। চোখ দুটো টকটকে লাল, নাকদুটো বুনো মোষের মতো ফুলে উঠেছে, ঠোঁটের কোণে ফেনা। ছেলেটার গলাটা হঠাৎই যেন পালটে গেল। একটা অজানা ঘষা ঘষা গলায় বলল, 'ওষুধ চাই আমার, ওষুধ দে।'

বলতে লজ্জা নেই দাদা, ধক করে বুকের মধ্যে একটা ভয়ের ঝাপটা এসে লাগল। মনে হল যে সংগ্রামকে আমি চিনি এ সেই সংগ্রাম নয়। ওর মধ্যে কী যেন একটা ভর করেছে। খুব ভয়ের কিছু একটা। খুব খারাপ কিছু একটা।

তবুও তার মধ্যেই ওর তুই-তাকারি অগ্রাহ্য করে সাহস জুটিয়ে বললাম, 'কীসের ওষুধ চাইছিস? যা, দেব না তোকে কোনও ওষুধ।'

সংগ্রাম সেই রক্তলাল চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সেই একই ঘষঘষে গলায় বলল, 'আমাকে ওষুধ দিবি না তুই? দেখ তাহলে তোর কী করি।'

জানি না সুশীলবাবুর বলা কথাটার মধ্যে কী ছিল, স্পষ্ট বুঝলাম আমার ঘাড়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেছে। শুকনো গলায় বললাম, 'তারপর?'

'তারপরই ছেলেটা দুদ্দাড় করে চেয়ার উলটে সেই যে বেরিয়ে গেল তারপর থেকে আর তার পাত্তা নেই। ওর ফ্ল্যাট তালাবন্ধ। অফিসে, বাড়িতে খোঁজ নিলাম, সেখানেও কেউ জানে না সংগ্রাম কোথায়। কম্পানির অফিসে বা ওর বাড়িতে বলতেও পারছি না কেসটা কী।'

'ওর বসকে তো নিশ্চয়ই চেনেন। তাঁকে জানাননি?'

'ওর বস মুখার্জি সাহেবকে আমি ভালো করে চিনি। খুব কড়া লোক। হাতে মাথা কাটেন।

তাঁকে তো কিছু খুলে বলাই যায় না। সংগ্রামের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না শুনে হয়তো ওর চাকরিটাই খেয়ে নিলেন। বেকার বেকার কেন সেই পাপের ভাগীদার হই?'

'আর ফ্যামিলি?' প্রশ্নটা করেই বুঝলাম ভুল করেছি। কারণ ওর পরিবার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। অথচ ওর বন্ধু হিসেবে আমারই জানা উচিত ছিল। এবং এই প্রথম অনুভব করলাম যে আমাদের সম্পর্কটা কতটা অগভীর ছিল। আমরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করেছি, হাসি ঠাট্টা করেছি, একসঙ্গে ঘুরতে গেছি, সপ্তাহান্তে মদের আসর বসিয়েছি, কিন্তু একে অন্যের জীবন সম্পর্কে জানার চেষ্টাই করিনি।

সুশীল আগরওয়াল অবশ্য এত কিছু খেয়াল করলেন না। তিনি আনমনে বলতে লাগলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সংগ্রামের তিনকূলে আত্মীয় বলতে একমাত্র ওর মা। বাবা মারা গেছেন অনেকদিন। ভাই-বোন কেউ নেই। এও নিশ্চয়ই জানেন যে ওরা অনেক পুরনো বনেদি পরিবার। এককালে নদিয়া চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিশাল জমিদারি ছিল। এখনও শ্যামবাজারের মোড়ে ওদের মস্ত বড় বাড়ি। যদিও সে বাড়ি এখন ছোট বড় মেজ সব শরিকদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। সংগ্রামের মা দুটো ঘর নিয়ে একাই থাকেন।

আমার কাছে সংগ্রামের মায়ের ফোন নাম্বার ছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কী, ওঁকে ফোন করার সাহস হয়নি। বয়স্ক মহিলাকে উতলা করে লাভ? সংগ্রাম কোথায় আছে তার উত্তর তো আমার নিজের কাছেও নেই।'

'পুলিশে খবর দেননি কেন?'

প্রশ্নটা শুনে সুশীল আগরওয়ালের মুখে অস্বস্তি আর ভয়ের ছায়া খেলে বেড়াতে লাগল। আর আমি এই প্রথম অনুভব করলাম যে সুশীলবাবুর গল্পের মধ্যে একটা মস্ত ফাঁক থেকে গেছে। আর সেই ফাঁকে অত্যন্ত অস্বস্তিকর কিছু একটা আছে যা লোকটা বলতে চাইছে না।

আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, 'পুলিশে খবর দেননি কেন?'

সুশীল আগরওয়াল কিছু বললেন না। উঠে আমার হাত টেনে বললেন, 'আসুন একবার।'

* * *

বিষ্ণুপুরের দিকে গাড়িতে যেতে যেতে অনেকগুলো চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বাইরে অলস দুপুর। রিক্ত বিষণ্ণ মাঠ শুয়ে আছে বিগতপ্রসবা নগ্ন নারীর মতো। আকাশে অকাল মেঘ। অ্যাম্বাসাডারের খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে আসছে শিরশিরে বাতাস। বাইরে জনমানুষ নেই।

পেছনের সিটে বসেছিলাম আমি আর সুশীল আগরওয়াল। গাড়ি চালাচ্ছিল মানস। হ্যাঁ, মানসকেই ওষুধ খাইয়ে চাঙ্গা করে আনা হয়েছে আমাদের সঙ্গে। কারণ জঙ্গলের মধ্যে ওই বাড়িটা কোথায় সেটা একমাত্র ওই-ই নির্ভুলভাবে বলতে পারবে। আমিও দেখেছি বটে, কিন্তু সে বর্ষার রাত্রে, অন্ধকারের মধ্যে। আমার পক্ষে ও জায়গায় চিনে যাওয়া সম্ভব না।

আবার সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। এখন আকাশ পরিষ্কার। বাতাসে শীতের কামড়। মাঝে মাঝেই একটা লাল ধুলোর ঝড় পাকিয়ে উঠছে রাস্তার পাশে। তাতে মিশে যাচ্ছে শুকনো পাতা কুটো, আর একটা অজানা ভয়। জানি না কেন বুকের ভেতরটা থমথম করছিল।

যেতে যেতে ফের কারসানির সেই চায়ের দোকানের সামনে এলাম। সেই একই দোকান, একই বেঞ্চ, তবে এবার দেখলাম দোকানের সামনেটা ফাঁকা। লোকজন নেই। দোকানি উনুনের সামনে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। তিনজনে নেমে এগিয়ে গেলাম। দোকানি ব্যাজার মুখে বলল, 'কী দিব?'

বললাম 'তিনটে চা দাও আপাতত। আর দুটো করে লেড়ো। তা আজ লোকজন নেই যে বড়?'

দোকানি বোধহয় এর অপেক্ষাতেই ছিল। ফ্লাডগেট খোলার মতো হুড়মুড় করে বলে গেল, 'আর বৈলবেন নাই বাবু। লোকের আক্কেল দেইখলে গা জ্বইলে যায়। বলি বুড়ি মইরবেক ন মইরবেক নাই তার ঠিক নাই ইদিকে লোকজন রাস্তায় বেইরানো বন্ধ কৈরে দিল। কী ভয়, ন বুড়ি সমর্থ লোক দেইখলেই উয়ার জান হাফটাই লিয়ে ফির বাঁইছে

উঠবেক। এখন বুড়ি কবে মইরবেক তার লাইগে হা কাড়্যে বইসে থাকা যায়? বলি তদের একটা আক্কেল নাই? বুড়ি না মরা তক্ক সোব কাজ কম্ম বন্ধ কৈরে বইসে থাকবি নকি?'

প্রথমে ঠিক বুঝলাম না। দোকানির পো খুব উত্তেজনায় মনের ভাব ঘেঁটে ফেলেছে। কথার পারম্পর্য নেই। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সুশীলদা বলল, 'কী কেস কাকা? খুলে বলো তো।'

'আমাদের গাঁয়ে একটা বুড়ি আছেন বাবু। উয়ার নকি নজর ভাল লয়। কবে পারা উয়ার আসে পাশের ঘর গিলায় গরু ছাগল মাইনষের মড়ক লাইগে গেইছল। তখন জানগুরু আইসে কড়ি চাইলে বৈলে দিঁয়ে গেইছিল উ ডাইন বঠে। সেদিন থাইকেই বুড়ি একঘইরা। কারো ঘর যাইতে পারে নাই, কারো বখুইল-এ উইঠতে পারে নাই। পেটের জ্বলন আমার দকানের কাছে ঘুইরে বুলে, খৈদ্দার-এর কাছে মাইগে খায়। বাবুরা কেউ দয়া কইরে কিছু মিছু কিনে দেই বা দুটা পইসা দেই। নাইলে রাইতে দকান বন্ধ করার সময় আমিয়েই একটা পাউরুটি নাইলে দুটা বিস্কুট দি।'

চট করে আগের দিনের কথাটা মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে বুড়ির?'

'চাইর পাঁচ দিন হইল বুড়ির অবস্তা ভাল লয়। মর মর প্রায়। আর ইদিকে প্রায়ই লোকের ঘরে মুরগি ছাগল হাপিস হৈ যাচ্ছে। জানগুরু বৈলছে ইটা পারা ওই বুড়িরই কাজ।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, যে বুড়ি মরো মরো সে রাতের বেলা ছাগল মুর্গি চুরি করছে? লোকে কী পাগল?'

দোকানি খানিক চুপ করে বসে রইল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'কী বৈলব দাদা, গত ক-দিন হইল বিষ্টুপুর থাইকে ইদিকে সাতটা গাঁয়ের লোক ডরে কাঁটা হইয়ে আছে। রাইত হইলেই ন কী গাঁয়ের পাশের জঙ্গল দিকের থিকে অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ আসছে। কখনু ছুটু বিটিছানার কাঁদার শব্দ, কখনু মরদ মায়া মানুষের বুক চাপড়াই কাঁদার শব্দ, কখনু চিৎকার। কুথা থাইকে এই আওয়াজ আইসছে কেউ জানে নাই। জুয়ান ছেইলা পেইলারা মিলে দিনের বেলায় যাইয়ে দেইখেছে কাঁচা হাড় মাংস ছইড়াই

আছে বনের ভিত্রে। আর দু-দিন আগে হাসিগ্রাম-এর নয়ন সরেন-এর লাতি রাতের বেলা বাজার থিকে গাঁ আসছিল। তখন পারা দেখেছে বনের ভিত্রে কে জানি আতিপাতি কইরে কী একটা খুঁইজছে। সে ছকরা ত মারাংবুরহুর নাম লিয়ে কাঁইপতে কাঁইপতে ঘর ঢুইকে বেহুঁশ। সেই থাইকে রটনা হই গেছে ওই ডাইন বুঢ়িই রাইতের বেলা শাল গাছে চাইপে আসেপাশের গাঁয়ে সমর্থ মরদ বা মাইয়া মানুষ খুইজে বুইলছে। জান হাফটাই লিয়ে ফের বাঁইছে উঠবেক বইলে।'

চা খেতে খেতে পুরো গল্পটা শুনলাম। বলতে নেই এসব গল্পগাছায় আমার কোনওদিনই আস্থা ছিল না। তবে সংগ্রামের কথাটা শুনে ইস্তক মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি খচখচ করছিল। দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বুড়ি যে মরতে বসেছে সে জানলে কী করে?'

'গত সম মঙ্গল দুদিন আসেনাই দেইখে বুঢ়ির ঘরে যাঁইয়ে দেখি বুঢ়ি বেদম জ্বরে পইড়ে আছে। কাঁথা-লাতা গু মুতে একাকার। পাড়ার একটা মায়ামানুষকে দিয়ে সব সাফ করালম। সেই গায়ে হাত দিঁয়ে বৈল্ল গা পুইড়ে যাইচ্ছে একদম। আমি ওঝা কে ডাকতে গেলম, ওঝা সিধা বলে দিল ডাইনের লাইগে কোন ওষুদ দিবেক নাই। সেই থিকে বুঢ়ি ওমনি পইড়ে আছে। ডাইকলে রা দেয় নাই। আমি যাই রুটি ফল পাকুড় দিঁয়ে আসি কোনদিন খায় কোনদিন খায় নাই।

বুঝলাম, দোকানির মনের মধ্যে খানিকটা মনুষ্যত্ব এখনও বেঁচে আছে। নইলে ডাইনিবুড়ির জন্য এত মানস! ঠাট্টার সুরে বলল, 'তা কাকা, তোমার তো দেখছি বুড়ির জন্য খুব দরদ।'

দোকানি ম্লান হেসে বলল, 'দোকানের সামনে কুকুর বিড়াল ঘুরে বুইল্লেও মায়াজাল হই যায় বাবু। আর ইটা ত দেখুত মানুষ।'

কথাটা বুকের মধ্যে ধক করে লাগল। তাই তো, কথাটা তো এভাবে ভেবে দেখিনি। মানুষের জন্য এটুকু না করলে আর নিজেকে মানুষ বলি কেন? উঠে পড়ে বললাম, 'বুড়ির কাছে নিয়ে চলো তো কাকা।'

* * *

বুড়ির কপালে হাত দিয়েই সুশীলদা আঁতকে উঠল, 'এর তো সাঙ্ঘাতিক অবস্থা. বেঁচে আছে কী করে?'

সুশীলদার কথাটা যে কথাটা যে নেহাত ফেলনা নয় সেটা বুড়ির অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। ভাঙা কুঁড়েঘরের মেঝেয় একটা শতচ্ছিন্ন নোংরা গদির ওপর বুড়ির শীর্ণ দেহটা মড়ার মতো পড়ে আছে। গায়ে একটা জীর্ণ মলিন কাঁথা। চোখ দুটো উলটে দেখল সুশীলদা, করমচা'র মতো লাল।

সুশীলদা মেডিকেল লাইনের লোক বলে কি না জানি না, দেখলাম যে ওর গাড়িতে একটা ফার্স্ট এইড বক্স আছে। তাতে অনেক কাটাছেঁড়ার ওষুধের সঙ্গে বেশ কিছু জ্বরজারির ওষুধপত্তরও আছে। সুশীলদা প্রথমেই বুড়ির মুখের মধ্যে সযত্নে একটা থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দিল। ততক্ষণ আমি ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

ঘরের মধ্যে ওই গদি ছাড়া আসবাবপত্র বলতে একটা পুরনো কুঁজো আর দু-চারটে আধভাঙা বাসনকোসন। এক কোণে ডাঁই করে রাখা একটা সানকির থালা, একটা নোংরা স্টিলের গ্লাস, দুটো পোড়ামাটির হাঁড়ি, আরও দু-চারটে ধূলিমলিন অকিঞ্চিৎকর সাংসারিক জিনিসপত্র। আরও এক কোণে একটা কেলেকুষ্টি চৌপায়ার ওপর একটা ফাটা ফ্রেমে আটকানো ছবি। তার ওপর এত তেল সিঁদূর আর নোংরার পুরু আস্তরণ যে কোন দেবতা বা দেবীর ছবি বোঝাই দায়। আমি, মানস, সুশীলদা ছাড়া সঙ্গে ছিল সেই দোকানি, আর এক মহিলা। এই মহিলাই আজকাল বুড়ির ঘরদোর পরিষ্কার করে দেন, সাধনদা কিছু টাকাপয়সাও দেয় তার জন্য। মহিলা দেখলাম ফটোটার দিকে সভয়ে একটা প্রণাম ঠুকেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কিছুক্ষণ পর বুড়ির মুখ থেকে থার্মোমিটারটা বার করেই আর্তনাদ করে উঠল সুশীলদা, 'আরে বাপরে... এ তো ১০২ ডিগ্রি জ্বর দেখাচ্ছে। এ তো অ্যাকিউট নিউমোনিয়া মনে হয়। এক্ষুনি হাসপাতালে ভর্তি না করলে আজকের রাত্তিরটা কাটবে না।'

মানস আমি কাজে লেগে গেলাম। মানসের তত্ত্বাবধানে সঙ্গে আসা

মহিলাটি ঝটপট ঘর পরিষ্কার করা শুরু করে দিল। আমি আমাদের সঙ্গে আনা খিচুড়ি অতি যত্নে বুড়িকে কিছুটা খাইয়ে দিলাম। এর বেশি কিছু খাওয়াতে সাহস পেলাম না, ভয় হচ্ছিল যে বুড়ি বমি না করে ফেলে। খাওয়ানো শেষ হলে পর সুশীলদা দুটো ট্যাবলেট গুঁড়ো করে অল্প জলে মিশিয়ে চামচে দিয়ে অল্প অল্প করে বুড়িকে খাইয়ে দিল।

তারপর সুশীলদা মানসকে দিয়ে গাড়ি থেকে একটা ব্যাগ আনাল। সেখান থেকে বেরোল একটা সিরিঞ্জ আর অ্যাম্পুল। তারপর টোকা দিয়ে অ্যাম্পুলের মাথা ভেঙে সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে বুড়ির হাতে পুশ করাতে টাইম লাগল ঠিক দু'মিনিট।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'তুমি ইঞ্জেকশন দিতে জানো নাকি?'

'না জানার কী আছে। এই লাইনে আছি পনেরো বছর। প্রেশার মাপা, ইঞ্জেকশন দেওয়া অনেক কাজই পারি। সবই ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে শেখা।'

'কী ওষুধ দিলে সুশীলদা?'

সুশীলদা ওষুধের ব্যাগ গুছোতে গুছোতে বললো, 'জ্বরের ট্যাবলেট দিলাম আর অ্যাজমার ইঞ্জেকশন। তবে এতে শানাবে না। এখন বুড়ির দরকার অ্যান্টিবায়োটিকের কড়া ডোজ, ঠিকঠাক বিশ্রাম আর নিয়মিত নজরদারি।'

কথাটা শুনে দোকানি ম্লান হাসল, 'সেসব ইখেনে কুথায় পাব বাবু? এই বন ধারে ডাক্তার হাসপাতাল কুথায়? ছোটমোট কিছু হইলে বনের পাতা শিকড় দিয়ে কাজ চালাই। আরটুকু বেশি হইলে ওঝা জানগুরু এরাই ভরসা।'

'পার্টির লোকেদের বলো না কেন?'

দোকানির ঠোঁটের কোণে একটা ম্লান বাঁকা হাসি দেখা গেল, 'পাটির লোক আসে শুধু ভোটের আগেটয়। হাসপাতাল ডাক্তারঘর এইসব লিয়ে অনেক কথা বইলে যায়। কিন্তু অবস্তা যেই কে সেই। কাউকে সাপে কাটলে সেই বিষ্টুপুর সদরে ছুট। বেশিরভাগ রোগী ত পৌঁছাতে পৌঁছাতেই মরে যায়। তারপর ধরেন পুয়াতি মেইয়ারা। এই পাড়া গাঁয়ে বাচ্চা হইলে

দাই মা-ই ভরসা। একটু জটিল কেস হলে শহরের হাসপাতালে লিয়ে যাইতে হয়। অথচ লিয়ে যে যাবেক তার উপায় কৈ? ভাঙাচুরা খানাখন্দ ভরা রাস্তা দিঁয়ে যেতে গিয়ে যে কত মেইয়ার রাস্তায়েই বাচ্চা হইয়ে গেছে যে কী বইলব।'

কথাটা যে মিথ্যে নয় সে আমিও জানি। তাই আর কথা বাড়ালাম না। মানসদা কয়েকটা ওষুধ দোকানিকে বুঝিয়ে দিল। সঙ্গে থাকা মহিলাটি সেই তেল সিঁদূর মাখা পটের দিকে তাকিয়ে একবার নমো করে নিল। অস্ফুটে বলল, 'ডাইনবুড়ি মরার আগে ওষুধ পাচ্ছে গো মা, সবই তুমার ইচ্ছা।'

বেরিয়ে আসার আগে কী মনে হতে নীচু হয়ে একবার বুড়ির কপালে হাত ছোঁয়ালাম। আর তখনই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির চোখ খুলে গেল, আর ডান হাতটা হঠাৎ করে উঠে এসে আমার হাতটা চেপে ধরল। আর দুর্বল ঘরঘরে গলায় বলল, 'বুধন কই?! বনে কুথায় দিঁয়ে আলি উয়াকে?'

ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক যে প্রথমে কেঁপে উঠলাম। মহিলার গলা দিয়ে একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। বাকিরাও চমকাল বিলক্ষণ। দোকানি অবশ্য সামলে উঠল দ্রুত। তাড়াতাড়ি এসে বুড়ির হাত ধরে বলল, 'এ বুড়ি, কার সঙ্গে কথা কইছুস? বুধন আইসবেক কুথা থাইকে? ই ত কৈলকাতার বাবু রে। দেখ তোর লাইগে ওষুধ আইনেছে। তোর ত কপাল ভাল রে বুড়ি।'

বুড়ি সেসব কথায় কান দিল না। আমার দিকে লাল টকটকে চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বুধন সেদিন তোর সঙ্গে ছিল ন? কুথায় উ? কুথায় দিঁয়ে আলি উয়াকে? বনের ভিতর থাইকে বুধন ডাকে কেনে আমাকে?! উয়ার ডাক শুইনে আমার জ্বর আসে কেনে?'

দোকানি আরও ঝুঁকে এল বুড়ির ওপর, বলল, 'ও বুড়ি মা, চিনতে লারছুস? ই তোর বুধন লয় রে। শহরের বাবু বঠে। খুব ভাল মানুষ। তুই যাতে সাইরে যাস তার লাইগে ওষুধ নিয়ে আইছে।'

বুড়ি সেসব কথায় কান দিল না। আমার চোখে চোখ রেখে বলল,

'দুধের ছানাটাকে সেইদিন ভোকের জ্বালায় শাপ-শাপান্ত কইরেছিলম। তার লাইগেই আমার আইজ এই অবস্তা। বুধন কে আইনে দে, উয়ার মাথায় হাত না বলাই যে মইর্তে পাইর্ব নাই রে। ভোকের জ্বলনে আমার বুধনকে শাপ দিঁয়েছি, তাই ত ছানাটার উপরে ডাইন ভর হইছে। ছানা টা আমার বনে বনে ঘুইরে বুলে, আর কষ্ট পায়। বুধন কে আইনে দে বাছা, তোর ভাল হবেক। আমি ডাইনবুড়ি বলছি, আমার ছানা টাকে আইনে দে। বাছা আমার কত কষ্ট পাইচ্ছে। এরে, উয়াকে না দেইখে আমার শান্তি নাই রে, আমার মরণ নাই...' বলতে বলতে বুড়ির হাত নিস্তেজ হয়ে এল। চোখ দুটো ফের বুজে গেল।

সাবধানে বুড়ির হাত ছাড়িয়ে কুঁড়েঘরের বাইরে এলাম। গাড়ির দিকে যেতে যেতে দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বুধনটা কে?'

দোকানি খানিক চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'বুধন ছিল এই বুড়ির ব্যাটা। বিধবা মায়ের একটি ই ব্যাটা। পাশের ঘরের ছেইলা দের সঙ্গে জমি লিয়ে বুড়ি আর উয়ার ব্যাটার সঙ্গে গন্ডগোল ছিল। উয়ারাই এক পরব দিনে বুধনকে ভুলাই ভালাই ভাঁকু খাওয়াই জঙ্গলে লিয়ে যাইয়ে মাইরে পুঁতে দিঁয়েছিল। বুধন তখন পনর বছরের জুয়ান ছানা। সেই শোকে ই বুড়ি খেপে গেছে। আইজওউ সে মাঝে মধ্যেই বনে যাঁইয়ে বুধনকে ডাকে।'

শুনে চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম। এরকম কত ঘটনাই যে বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে ঘটে তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

দোকানি আরও একটু থেমে বলল, 'তবে একটা কথা বাবু। উই ঘটনার পর থিকেই পাশের ঘরে সব গরু বাছুর মইরতে শুরু করে। এক এক কইরে উয়াদের ছানা পানা গুলাও মইরে যায়। কেউ সাপে কাইটে, কেউ ওলাউঠায়, কেউ বা হাঁতিঠাকুরের পায়ের তলে। আর একটা ছিল্যা তো হাইরিয়েই যায়। সেই থাইকে বুড়িকে ডাইন বলে সবাই।'

শুনে থেমে গেলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, 'এ কবেকার ঘটনা?'

'ধরেন আইজ থাইকে তিরিশ বছর আগের থাইকে।'

'তারপর থেকে এই গাঁয়ে বুড়ির সঙ্গে শত্রুতা করে কেউ মরেছে?'

মাথা নাড়ল দোকানি, 'না বাবু।'

'তাহলে লোকে বুড়িকে ডাইনি বলে কেন? পড়শির ছেলে বা গরু ছাগল তো স্বাভাবিক ভাবেই মরতে পারে।'

ম্লান হাসল দোকানি, 'ইটা কইলকাতা শহর লয় বাবু। ইটা সানতাল গাঁ। ইখেনে জানগুরুই সব। একবার যাকে উ ডাইন বইলে দিবেক তার গা থিকে সেই দাগ তুলার ক্ষমতা কারুর নাই।'

কী মনে হতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী নাম ছিল বুড়ির পড়শিদের?'

'ওরা মাঝি ছিল বাবু। সনাতন মাঝি।'

শুনে আমার মাথায় কী যেন একটা টিকটিক করে উঠল। মানস আর সুশীলদা গাড়িতে গিয়ে বসল। আমি দোকানিকে দু-একটা কথা বলে গাড়ির দিকে চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম। মন শুধু বলতে লাগল, ও বুড়ি ডাইনি নয়। হতে পারে না।

* * *

গাড়ি চলতে চলতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ ব্রেক কষল মানস। তারপর গাড়িটা সাবধানে সাইড করে বলল, 'আপনারা নামুন। গাড়িটা পার্ক করে আসছি।'

গাড়ি থেকে নেমে গা হাত-পা ছাড়িয়ে নিলাম একটু। সুশীলদা মানসকে জিজ্ঞেস করল, 'এইটাই সেই জায়গা? তুই ঠিক জানিস তো?'

মানস কিছু বলল না, শুধু ঘাড় নাড়ল তারপর রুকস্যাকটা পিঠে নিয়ে আঙুল তুলে একটা গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞে করল, 'চাটুজ্জেদা, চিনতে পারছেন?' এই বলে একটা মস্ত বড় নিমগাছের মাথার দিকে দেখাল। এবার আমিও দেখে চিনতে পারলাম। এই সেই নিমগাছ যার নীচে আমি আর সংগ্রাম আশ্রয় নিয়েছিলাম।

যেখানে মানস গাড়ি পার্ক করল সেখান থেকে জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে নিমগাছটার গোড়ায় পৌঁছতে সময় লাগল তিন মিনিট। যদিও আকাশে আলো আছে এখনও, তবুও সন্ধে নামার মুখে অত বড় নিমগাছটা দেখে গা ছমছম করছিল।

সুশীলদা বলল, 'হুম। এবার ওই লোকটার বাড়ি যাওয়া যাক।'

মানস একটা সরু জঙ্গুলে রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। দু'পাশে মস্ত মস্ত পলাশ, সেগুন আর শালগাছের দল। তাদের শুকনো পাতায় জঙ্গলের মাটি ছেয়ে আছে। কয়েকদিন আগের বৃষ্টি হয়েছিল। তাই বাতাসে একটা ভ্যাপসা ভিজে গন্ধ। ঘরে ফিরে আসা পাখিদের ডাকে কান পাতা দায়। ইতিমধ্যেই ঝিঁঝিঁ ডাকতে শুরু করেছে।

পাঁচ মিনিট হাঁটার পরেই ঝুপ করে অন্ধকারটা নেমে এল। গ্রামদেশে শীতের রাত নাকি তাড়াতাড়ি নামে। কিন্তু এমন হঠাৎ করে নামে বলে জানা ছিল না। ঝিঁঝির ডাক শতগুণে বেড়ে উঠল। সুশীলদা হতাশ সুরে বলল, 'যাহ, এবার কী হবে? সামনে তো পুরো অন্ধকার, রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না যে।'

যেন সুশীলদার কথার জবাব দিতেই সামনে একটা জোরালো টর্চের আলো জ্বলে উঠল। মানস ওর রুকস্যাক থেকে একটা মিলিটারি গ্রেডের টর্চ বার করে জ্বালিয়েছে। তখন পানাগড়ের কাছে কিছু কিছু দোকানে এই জিনিস পাওয়া যেত। মানস দেখছি তারই একটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

টর্চের আলোয় সামনেটা দিনের মতোই পরিষ্কার। আমরা এগোতে লাগলাম। মানস বলল, 'বেশি না, মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। আশা করছি এবার লোকটাকে ঘরেই পাওয়া যাবে।'

যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে তাকালাম। কেন জানি না মনে হল আমরা যেমন একটু একটু করে আলোর স্রোত বেয়ে এগোচ্ছি, তেমনই আমাদের ছেড়ে আসা রাস্তাটা একটু একটু করে তরল অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে নিলাম। একটা অস্বস্তিতে গা'টা শিরশির করে উঠল।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর টর্চের আলোয় দূর অন্ধকারের স্লেটে একটা খোড়ো বাড়ির অবয়ব ফুটে উঠল। মানস টর্চ নিভিয়ে দিল। আমাদের চাপা গলায় বলল, 'আসুন।'



আমরা অন্ধকারের মধ্যেই ধীরে ধীরে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। নিঝুম নিষ্প্রাণ একটা বাড়ি। কোথাও কোনও আলোর আভাস নেই। মনে হল বাড়িটা যেন একগলা নিঝুম অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে।

আমি এদিক-ওদিক তাকালাম। সেদিন যে ধানের মরাই, ট্রাক্টর দেখেছিলাম, একটু দূরে তাদের অবয়ব দেখা যাচ্ছে বটে। কিন্তু এই তারার আলোয় তাদের কেমন যেন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে।

মানস পায়ে পায়ে এগিয়ে কোমরসমান উঁচু বেড়ার দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। সবার শেষে ছিলাম আমি। কেন জানি না মনে হল আমি ভেতরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে যেন বেড়ার দরজাটা সজোরে বন্ধ হয়ে গেল।

মানস অবশ্য ওসব দেখছিল না। ও একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল দাওয়ার দিকে। আমরা তিনজনে দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ালাম। সুশীলদা একবার বলল, 'টর্চটা জ্বাল মানস।'

মানসের ডান হাতের তর্জনীটা সাপের ছোবলের মতো ওর ঠোঁটে উঠে এল। সঙ্গে একটা শিসের মতো আওয়াজ। আমাদের চুপ করতে বলছে মানস।

মনে পড়ে গেল কালকের কথাটা।

সুশীল আগরওয়ালকে কাল যখন প্রশ্ন করেছিলাম, 'পুলিশে খবর দেননি কেন?' সুশীলদা কিছু বলেনি। শুধু আমার হাত ধরে নিয়ে গেছিল তার গোডাউনে।

দেখেছিলাম গোডাউনের দেওয়ালে এবড়োখেবড়ো ভাবে লেখা আছে একটা কথা।

'ওসুদ দে, আমার বিটির ওসুদ দে। নাইত তোদিক্কে জীয়ন্ত ছিঁড়ে খাব।'

ওই প্রায়ান্ধকার গোডাউনের দেওয়ালে এই কথা লেখা দেখে যতটা না ভয় লেগেছিল, তার দ্বিগুণ আতঙ্কিত হয়েছিলাম ওটা কী দিয়ে লেখা সেটা বুঝতে পেরে।

রক্ত। শুকিয়ে যাওয়া রক্ত। আর মনের ভেতরে কে যেন ফিসফিস করে বলছিল, 'ওটা তোমার বন্ধুর রক্ত। সংগ্রামের রক্ত। ও বিপদে আছে,

ভীষণ বিপদে আছে। যাও, ওকে বাঁচাও।'

হুঁশ ফিরে এল একটা ক্যাঁচ শব্দে। মানস ঘরের দরজাটা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকল। তারপর সুশীলদা। সুশীলদা ঢোকার পর দরজাটা ফিরে এসে বন্ধ হয়ে গেল।

একটুও দুলল না।

আমি এগোতে যাব, এমন সময় মেঘ সরিয়ে ক্ষীণ চাঁদের আলো বারান্দায় এসে পড়ল। আর মেঝের দিকে তাকিয়ে আমি থমকে গেলাম।

কোথায় সেই নিকোনো তকতকে বারান্দা, যেখানে আমরা বসে চা, লুচি তরকারি খেয়েছিলাম? এ তো ফুটিফাটা ভাঙা দাওয়া। এখানে ওখানে গর্ত। মাটি থেকে দাওয়ার ওপর অবধি বেয়ে উঠেছে লতানে গাছের জঙ্গল। বাঁশে ঘুন ধরেছে, তার ফুটিফাটা গা থেকে ঝুর ঝুর করে খসে পড়ছে গুঁড়ো।

পিছন ফিরে তাকালাম। কোথায় সে গোলাভরা ধানের মরাই? যেন একটা ভুতুড়ে কাঠামো প্রকাণ্ড হাঁ করে অট্টহাসি হাসছে। আর তার পাশে হাড় পাঁজর বার করে দাঁড়িয়ে থাকা ওটা কী? সেই ট্রাক্টরটা? দেখে শিউরে উঠলাম। মনে হল যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক বৃদ্ধ যন্ত্রদানবকে একটু একটু করে পিষে ফেলেছে এই সর্বগ্রাসী বুভুক্ষু জঙ্গল।

ঘরের দরজার দিকে তাকালাম। আর ঠিক তখনই জঙ্গলের দিক থেকে একটা হাহাকার ভেসে এল, পথ নাই, পথ নাই, ঘুইরবার পথ নাই।

মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিলাম। হ্যালুসিনেশন হচ্ছে নাকি?

ঘরের ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না। সেদিন বৃষ্টিস্নাত সন্ধেবেলা যে মায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় দেখে মন তৃপ্ত হয়েছিল, তার সঙ্গে এই সর্বগ্রাসী রিক্ত কুঁড়েঘরের কোনও মিলই নেই। সব যেন মিলিয়ে গেছে ভোজবাজির মতো। যেন একটা মহামারী এসে শুষে নিয়ে গেছে একটা মস্ত জনপদ। তার হাসি নেই, শ্বাস নেই, প্রাণ নেই, বেঁচে থাকা নেই, এমন কি শান্তিতে মরে যাওয়াও নেই!

দরজাটা খুলে সাবধানে ভেতরে বাঁপাটা রাখলাম। পায়ে একটা এবড়োখেবড়ো মেঝে ঠেকল। সামনে ঘন নিঃসীম অন্ধকার। নিকষ, জমাট,

পাথুরে অন্ধকার। তার গায়ে যেন আঁচড়ও কাটা যাবে না, এত কঠিন সেই তমসা। চাঁদের আলো এই ঘরের চৌকাঠে এসে থেমে গেছে। ভেতরে উঁকি দিতে তারও যেন বড় ভয়।

একবার মৃদুস্বরে ডাকলাম, 'সুশীলদা, মানস।'

কোনও উত্তর এল না। কোনও প্রতিধ্বনিও ফিরে এল না। মনে হল নিঃসাড় গাঢ় অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে আমার উচ্চারিত শব্দগুলো ভারী পাথরের মতোই নিঃশব্দে ডুবে গেল।

ধীরে ধীরে ডান পা'টাও ভেতরে রাখলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চমকে দিয়ে পেছনের দরজাটা সজোরে বন্ধ হয়ে গেল। আমি চকিতে পিছনে ফিরে একবার ঠেললাম। কিন্তু কোনও ফল হল না।

এবার ওই শীতের মধ্যেই আমি দরদর করে ঘামতে লাগলাম। জোরে চেঁচালাম, 'সুশীলদা, মানস।' কিন্তু কোনও উত্তর নেই। আরও গলা চড়ালাম। কিন্তু প্রতিটা অক্ষর, শব্দ, বাক্য যেন গলে গেল, মিশে গেল, ডুবে গেল সেই অন্তহীন অন্ধকারের মধ্যে।

একটু একটু করে পা বাড়াতে লাগলাম। ঘর যখন, কিছু না কিছু তো হাতে ঠেকবেই।

কিন্তু না, কিচ্ছু না। থরথর কাঁপতে থাকা দুটো হাত শূন্যে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে লাগল বার বার....

পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে হঠাতই মনে হল পায়ের নীচে মাটিটা যেন একটু দুলে উঠল। থেমে গেলাম।

ঠিক তখনই কানে এল একটা ক্ষীণ আওয়াজ। কে যেন ক্ষীণ বালিকাকণ্ঠে বলছে, 'বাবা, বেদম কষ্ট হইচ্ছে গ। ওষুদ আইনেছ, ওষুদ?'

কোথা থেকে আসছে আওয়াজটা? বুঝতে পারলাম না।

আর এক পা এগোতেই সেই আর্তি, 'ও বাবা, বড় কষ্ট হইচ্ছে গ। দম আটকাই আইসছে। ওষুদ দাও না বাবা, একটু ওষুদ দাও না।'

কোথা থেকে আসছে এই আওয়াজ? আমি এবার মৃদুস্বরে ডাকলাম, 'সংগ্রাম।'

মনে হল পাথুরে অন্ধকার যেন একটু সচল হল। এবার একটা অন্য

আওয়াজ পেলাম। প্রথমে বুঝলাম না কীসের আওয়াজ....

তারপর শব্দটা বাড়তে লাগল। প্রথমে ধীরে। তারপর আরও একটু উচ্চকিত।

নিঃশ্বাসের শব্দ। কেউ যেন ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে। ধীরে, অতি ধীরে। নিঃশ্বাস নিতেও যেন কত কষ্ট। আর প্রতি শ্বাসের সঙ্গে ভেসে আসছে সেই করুণ আর্তনাদ, 'বাবা, ও বাবা, দাও একটু ওষুদ। আর যে পাচ্ছি নাই।'

কে এই মেয়ে? কোথায় আছে সে? আমি উঁচু গলায় বললাম, 'কে! কে! কে তুমি?'

কেউ উত্তর দিল না। শুধু সেই অন্ধকারে মাথা কুটতে লাগল একটা গাঢ় শ্বাস জড়ানো কষ্টের ডাক, 'ও বাবা, বড় কষ্ট গো বাবা, বড় কষ্ট।' মনে হল সেই ঘরটাই যেন একটা মরণাপন্ন মেয়ের ফুসফুস। একটু খানি বাতাসের জন্য সেই আকুতি যেন ঘুরে মরছে ঘরের ভেতর, পাক খাচ্ছে, গুমরে মরছে।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'কে তুমি, সাড়া দাও। ওষুধ এনেছি আমি। আমার কাছে ওষুধ আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসের শব্দটা অনেক কমে গেল। এবার ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে একটা আবছা আলো জেগে উঠল। কোথা থেকে আসছে!

ওপরে তাকালাম। কুঁড়েঘরের ছাদ। সেখানে ফুটিফাটা হয়ে অল্প আলো আসছে। সূর্যের আলো নয়, ম্লান নিভু নিভু প্রদীপের আলো যেমন হয়, তেমন। বিষণ্ণ, মৃদু, অস্তপ্রায়।

সেই আলোয় ঘরের অবস্থা দেখে শিউরে উঠলাম। সে ঘর আর ঘর নেই। দেওয়াল খসে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। সারা ঘরে ঝুলে, নোংরায় ভর্তি। ওপাশের জানালা দিয়ে উঁকি মারছে জংলি লতা। কেউ নেই। কিচ্ছু নেই। সুশীলদাও নেই। মানসও নেই।

আমার মাথার মধ্যে যেন জট পাকিয়ে গেল। এই তো ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকল আমার চোখের সামনে। ওদিকে দরজা নেই। লোকদুটো কি ঘরের মধ্যে থেকে উবে গেল?

মেঝের দিকে আরেকবার চোখ গেল আমার। মেঝেতে পড়ে আছে....

কী ওগুলো? কী পড়ে আছে?

একটু পর চোখ সয়ে এলে বুঝতে পারলাম ওগুলো কী। হাড়। মুরগি আর ছাগলের হাড়।

'ওষুদ আইন্যেছু? আমার বেটির ওষুদ আইন্যেছু তুঁই?'

কথাগুলো এমন হঠাৎ ভেসে এল যে আমি চমকে গেলাম। চোখ গেল জানালার দিকে। আর আমার হৃৎপিণ্ডটা এক লাফে গলার কাছে উঠে এল।

জানালায় একটা মুখ। একটা জংলি মুখ। ঘন জট পাকানো চুলে, নোংরা দাড়িতে তাকে সভ্য মানুষ মনে হয় না। আর তার জ্বলজ্বলে চোখে কীসের যেন একটা উদগ্র বুভুক্ষু খিদে।

একটু তাকিয়ে থাকার পর চিনলাম ও কে। কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না। দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, 'সংগ্রাম! তুই?'

সংগ্রামের চোখ দুটো আরও জ্বলজ্বল করে উঠল। ঠোঁটের কোণে একটা দুর্বোধ্য হাসি। একটা সম্পূর্ণ অচেনা স্বরে সে বলে উঠল, 'ওষুদ দে রে, আমার বিটির ওষুদ দে।'

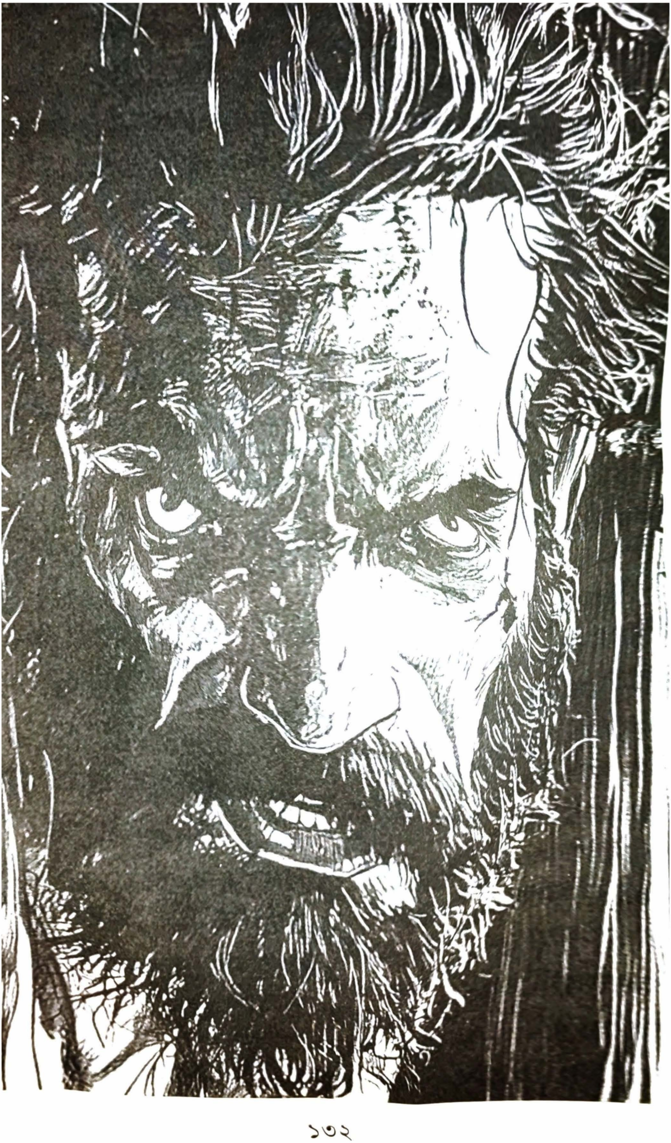
আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ তো সেই লোকটার স্বর যে সেই বর্ষার রাতে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছিল। তারই তো বাড়ি, ঘর, সংসার ছিল এটা! সংগ্রামের গলায় তার স্বর এল কোথা থেকে?

আমার মাথার মধ্যে সব জট পাকিয়ে গেল। কী হচ্ছে এসব? আমি কি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি?

আবার সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, 'সংগ্রাম, এ কী হয়েছে তোর? কোথায় ছিলিস এতদিন?'

এবার ঘরের মধ্য থেকে নয়, জঙ্গলের মধ্য থেকে ভেসে এল এক রমণীকণ্ঠের বিলাপ, 'এ গো তুমার পায়ে পড়ি। মেইয়্যেটাকে একটুকু ওষুদ আইন্যে দাও... আর যে দেইখতে পাচ্ছি না। দোহাই তুমার...'

সংগ্রামের চোখ ঘোলাটে হয়ে এল। আবার সেই অচেনা স্বরে বলে



উঠল, 'ওষুদ দে রে, ওষুদ দে। আমার বিটিটা যে মইরে যাইচ্ছে। ওষুদ দে, ওষুদ দে...'

বলতে বলতে সংগ্রাম জানালার ওপর ভর দিয়ে উঠে দেহটা ঢুকিয়ে দিল ঘরের ভেতর গোবরাটে পেট ঠেকিয়ে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ নামিয়ে দিল জানালার নীচের দেওয়ালে। তারপর চার হাতে পায়ে দেওয়াল বেয়ে নামার চেষ্টা করতে লাগল মেঝেতে। দেখে মনে হল যেন একটা মস্ত বড় অজগর সাপ জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

সেই ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য দেখে আমার অন্তরাত্মা অবধি কেঁপে উঠল। আমি পেছোতে থাকলাম। পেছোতে পেছোতে ঠেকলাম দরজায়। ঘুরে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেই পোড়ো কুঁড়েঘরের দরজা তখন শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে। আমি পাগলের মতো দরজায় ধাক্কা মারতে লাগলাম। তখন আমার হাত পা থরথর করে কাঁপছে। বুকটা খালি খালি লাগছেঞ্চ দরদর ঘামে ভেসে যাচ্ছে আমার সারা দেহ। আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'কে আছ, বাঁচাও।'

পেছন থেকে সেই অচেনা ঘরঘরে স্বরে ফের ভেসে এলো, 'ওষুধ দে রে...আমার বিটিটা যে মইরে যাইচ্ছে। ওষুদ নাই... কুথাও কুনও ওষুদ নাই... কত ঘুইরলম, কত মাথা কুইটলম, কত লোকের হাতে পায়ে ধইরলম... কেউ কিছু কৈরতে পাইল্ল নাই রে...একটুকু ওষুদের লিগে ফুলের মত বিটিটা আমার মইরে গেল রে...'

আমার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। আতঙ্কিত হয়ে পেছনে তাকালাম। সংগ্রামের অর্ধউলঙ্গ দেহটা ততক্ষণে ঘরের মধ্যে নেমে এসেছে। জন্তুর মতো সে চার হাত পায়ে এগোচ্ছে আমার দিকে....

এবার নিঃশ্বাসের শব্দটা যেন আরও জোর হয়ে উঠল। তার সঙ্গে মিশল একটা কান্নার রোল। আকাশ পেরিয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে, সমস্ত বিশ্বচরাচর জুড়ে বাজতে লাগল সেই অশরীরী আর্তস্বর, 'ওষুদ দাও ন বাবা, আর তো পাচ্ছি নাই...বুকটা ফাইটে যাইচ্ছে...এগো আমার বিটিটা যে মইরে যাবেক... দোহাই তুমার, যেখেন থিকে পার একটুকু ওষুদ আইনে দাও না...'

সেই প্রথম অনুভব করলাম তীব্র আতঙ্কের মধ্যেও মানুষের ঘুম পায়। প্রবল ঘুম। আমার সমস্ত চৈতন্য যেন অসাড় হয়ে এল। হাতে পায়ে আর কোনও শক্তি অবশিষ্ট নেই। শরীরে বিষ ক্লান্তি। আমি কোনওক্রমে জানালার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়লাম। একটু দূরে একটা শীর্ণ উলঙ্গ দেহ। সে ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসছে জ্বলজ্বলে উন্মত্ত দুটো চোখে যেন কীসের ইশারা। আমি জানি না...আমি জানি না আমার কী হবে।

চোখটা সম্পূর্ণ বুজে আসার ঠিক মুখে আমার কেমন যেন মনে হল আরও একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমি কি ঠিক শুনলাম? ওই তো, আবার। কে যেন দরজায় ঠক ঠক করছে। হ্যাঁ, আমি নির্ভুল শুনেছি। কে যেন জোরে জোরে ঠোকা মারছে দরজায়।

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। শুধু আমি নয়। ও-ও শুনেছে। ওর দু'চোখে এখন বিভ্রান্তি।

আমার হাতে পায়ে সামান্য হলেও সাড় ফিরে এলা। কেউ এসেছে, দরজার ওপারে দাড়িয়ে আছে সে। কে যেন আমার মাথার মধ্যে গেঁথে দিল, ওর কাছেই আছে আমার মুক্তির চাবিকাঠি।

চারিদিক নিঃস্তব্ধ। থেমে গেছে সেই বালিকার আর্তস্বর, সেই নারীকণ্ঠের ত্রস্ত আর্তচিৎকার। সেই আলো অন্ধকারের মধ্যে, স্তব্ধ শ্বাসশব্দের মধ্য দিয়ে ভেসে এল ক্ষীণ স্বর, 'বুধন, বাপ আমার, কুথায় আছু বাপ?'

এসেছে! দোকানি তার কথা রেখেছে! আমার বুকটা আশায় আনন্দে ধক করে উঠল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বুড়িমা, এসেছ? তুমি এসেছ?'

এবার আরও জোরে ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। দোকানির স্বর শোনা গেল, 'হেই বুড়ি, কপাট থাইকে সেইরাই দাঁড়া। ইটা না ভাঙলে খুইলবেক নাই।'

ফের সেই ডাইনিবুড়ির স্বর, 'না না বাপ আমার, কিচ্ছু কইত্তে হবেক নাই। কপাট আপসেই খুইল্লে যাবেক। বুধন, এ বুধন, বুকে আয় বাপ আমার। শাপ দিঁয়েছি বলে রাগ কৈরেছু বাছা? আয় বাপ, বুকে আয় দিকি। গায়ে মাথায় হাত বুলাঁই দি। অনেক কষ্ট পাঁয়েছু বাপ আমার। মায়ের কাছে আয় দেখি...'

সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখি হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়েছে। তার রুগ্ন পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। সংগ্রাম কাঁদছে!

আস্তে করে দরজাটা খুলে গেল। নিজে নিজেই। প্রথমে ঢুকল সেই ডাইনিবুড়ি আর দোকানি। তারপর হুড়মুড় করে ঢুকল সুশীলদা আর মানস! দু'জনে এসে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল। সুশীলদা বলল, 'উফ, চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। আরেকটু হলে পুলিশে খবর দিতে যাচ্ছিলাম। তোমাকে ওভাবে আচ্ছন্নের মতো ঘরে ঢুকতে দেখেই বুঝেছিলাম কিছু একটা গড়বড় আছে। তারপর যত ধাক্কা দিই কিছুতেই দরজা খোলে না।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'মানে? এসব কী বলছ কী? তুমি আর মানস তো আমার আগে ঢুকলে ঘরে।'

একে অন্যের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল মানস, 'না চ্যাটার্জিদা। আমরা দাওয়াতে উঠিইনি। তোমাকে দেখলাম কেমন আচ্ছন্নের মত দাওয়াতে উঠলে। তারপর এদিক-ওদিক তাকালে তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লে। আমাদের উচিত ছিল তোমাকে বাধা দেওয়া। সেটা কেন দিইনি নিজেরাই বুঝতে পারছি না।'

সুশীলদা বলল, 'তুমি ঢুকে যাওয়ার পরেই দেখি দরজাটা নিজে নিজে বন্ধ হয়ে গেল। তখন আমাদের টনক নড়েছে। আমরা দৌড়ে গেলাম। কিন্তু গেলে কী হবে, ধাক্কাধাক্কি করেও দেখি খোলে না। লাথি মেরেও দেখলাম, যে কে সেই।'

চুপ করে রইলাম। কীসের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম নিজেই জানি না।

সুশীলদা বলল, 'ভাবছি থানায় যাব কি না, দেখি একটু পরে সাইকেল নিয়ে দোকানি এসে হাজির। দেখে ধড়ে প্রাণ এল। শুনলাম তুমিই নাকি ওকে বলে এসেছিলে এমন কিছু একটা হতে পারে। দোকানি তাই ভাবছিল একবার দেখে যাবে কি না। সাইকেল নিয়ে বেরোবে, এমন সময় বুড়ি এসে হাজির। তার নাকি জ্বর এক্কেবারে সেরে গেছে। বুড়ির মন বলছে শাপমন্যির প্রায়শ্চিত্ত না করলে নাকি তার বুধনের আত্মা শান্তি পাবে না। জোরজার করে বুড়ি এসে হাজির। তারপর তো খেল দেখলেই।

যে দরজা এতক্ষণ গায়ের জোরে খুলছিল না, বুড়ির দুই টোকাতেই কেমন অনায়াসে খুলে গেল।'

ওদিকে তাকিয়ে দেখি বুড়ি সংগ্রামকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, আর বলছে, 'আহা রে, ভোকের জ্বলনে দুধের ছানাটাকে কত কিছুই বৈলেছি। বাপ আমার, সনা আমার, জাদু আমার, ঘরে চ বাপ।' তাকিয়ে দেখি বুড়ির চোখেও জল।

চোখ মুছলাম। এক মেয়ে হারানো বাপের দুঃখ ধুয়ে যাচ্ছে মরা ছেলেকে ফিরে পাওয়া এক ডাইনিবুড়ির ভালোবাসায়। ভালোবাসার কাছে আর কেই বা জিতেছে বলো। ভালোবাসাও তো একরকমের হেরে যাওয়াই।

বলে নিজেই নিজেকে চুপ করালাম। ধুস, ডাইনি ফাইনি আবার কী! মা তো মা'ই হয়।'

* * *

চাটুজ্জেমশাই থামতেই আমরা হইহই করে উঠলাম। 'এটা কেমন হল? পুরো গল্পটা তো বললেন না।'

চাটুজ্জেমশাই তো অবাক, 'এই তো বললাম। আর বাকিটা রাখলাম কী?'

'ওই লোকটা কে? মানে যার কাছে গিয়ে আপনারা বিপদে পড়েছিলেন?'

চাটুজ্জেমশাই চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'পরে জেনেছিলাম বছর বিশেক আগে সত্যিই ওখানে একটা পরিবার ছিল। তাদের মেয়েটির বোধহয় হার্টের কিছু একটা গন্ডগোল ছিল। আর ছিল ভয়ানক শ্বাসকষ্ট, ক্রনিক অ্যাজমার পেশেন্ট। ওদিকে তখন ডাক্তার হাসপাতাল কিছুই ঠিকঠাক পাওয়া যেত না। এমন সময়ে এক শীতকালের বৃষ্টির রাতে মেয়েটি প্রবল শ্বাসকষ্টে হার্টফেল করে মারা যায়। মেয়ের মা সেই শোকে গলায় দড়ি দেয়। শোকে তাপে বাপের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে অনেকেই শীতের রাতে ওখানে বাপকে দেখেছে মেয়ের জন্য একটু ওষুধ চেয়ে বেড়াতে।'

বিশু একটা ফোঁত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গদাই বলল, 'আর আপনার সেই বন্ধু, সংগ্রাম, সে এক্কেবারে ঠিক হয়ে গেল? তার হয়েছিলটা কী?

চাটুজ্জেমশাই বললেন, 'আমাকে পরে বলেছিল যে রাতে ও লুচি তরকারি খেয়ে ফিরে আসে, সেই রাত থেকেই ও নাকি শুনতে পায় মাথার মধ্যে কে যেন সর্বক্ষণ একটানা কেঁদে চলেছে, 'বাবা, ওষুধ এনে দে, ওষুধ এনে দে, করে। তারপর জ্বরের সময় একদিন টানা অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই। আমাদের অবশ্য দুইয়ে দুইয়ে চার করতে অসুবিধা হয়নি। খিদের জ্বালায় গ্রামের ছাগল মুরগি চুরি যে ওরই কাণ্ড সেটা বলাই বাহুল্য... সেটা অবশ্য আর চাউর হতে দিইনি। নইলে গ্রামের লোকেরা ওকে আস্ত রাখত না। ডাইনের কালাজাদুতে এসব করেছে, এসব বললে শুনতই না কেউ।'

ভজা জিজ্ঞেস করল, 'তিনি করেন কী এখন?'

'এই ঘটনার পরপরই সে চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসে। তবে সে তার কুড়িয়ে পাওয়া মা'কে ভোলেনি। বুড়ি যদ্দিন বেঁচে ছিল, নিয়মিত দেখা করে আসত। টাকাপয়সা চাল-ডাল দিয়ে আসত। বলত কয়েক দিনের কষ্ট গেছে বটে। কিন্তু তার বদলে একটা আস্ত মা কুড়িয়ে পেলাম, সেটাই বা কম কী!'

সমাপ্ত

দেওয়ানগঞ্জের রাস্তাটা

ক্লাবের নড়বড়ে তক্তাটার ওপর বসে চাটুজ্জেমশাই বলল, 'বিশু গেল কোথায়? দেখছি না যে অনেকদিন।'

বিশু ওরফে বিশ্বনাথ সদ্য একটা চাকরি পেয়েছে সেলসের। নতুন চাকরি, কম্পানি উদয়াস্ত খাটাচ্ছে। প্রায়ই ট্যুরে থাকে, ফেরে এক-দুদিন পর। আজ আসার কথা।

শুনে চাটুজ্জেমশাই চুপ রইলেন। আমরা শীতের সন্ধেটা দিব্যি ক্যারম খেলে আর গজল্লা করে কাটাচ্ছিলাম।

ভবতারণ চাটুজ্জে হচ্ছেন আমাদের ক্লাবের প্রবীণতম সদস্য। চাকরি করতেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে। ছেলেমেয়ে নেই, স্ত্রী মারা গেছেন বছর দুয়েক হল। কাজ থেকে ভি আর এস নিয়ে এ পাড়ায় মুখুজ্জেদের পোড়ো বাড়িটা কিনে সংস্কার করে বসবাস করছেন।

চাটুজ্জেমশাই এককথায় চমৎকার মানুষ, বিশু'র ভাষায়, গ্রেট ম্যান। শান্ত, ধীর স্থির মানুষ। চট করে বাজে বা হালকা কথা বলতে শুনিনি। কথার মধ্যে ওজস্বী ভাব আছে। আর কথা বলেনও চমৎকার। এসেই আমাদের একজন ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছেন। এখন তো ক্লাবের সমস্ত কাজকর্ম, পিকনিক, কুইজ, লাইব্রেরি, বৃক্ষরোপণ, স্বাধীনতা দিবস পালন, সরস্বতীপুজো এসব চাটুজ্জেমশাইকে ছাড়া ভাবাই যায় না।।

এহেন চাটুজ্জেবাবুর সবচাইতে বড় গুণ হচ্ছে যে ভদ্রলোক খুব ভালো গল্প বলতে পারেন। উনি বলেন সবই ওঁর জীবনের সত্যি ঘটনা। সে হোক না হোক, চাটুজ্জেমশাইয়ের গল্প মানেই গা শিউরে ওঠা, হাড় হিম করা সব ঘটনা।

বিশু সেলসে জয়েন করেছে শুনে চাটুজ্জেমশাই সামান্য হাসলেন। তারপর বললেন, 'তাহলে তো আড্ডার পরের গল্পটা বিশুই বলবে।'

ভজা বলল, 'কেন খুড়ো, সেলসে চাকরি পেলেই কি গল্পের প্লট আসে নাকি মাথায়?'

'প্লট নয়, সত্যি ঘটনা। আসলে সেলসের চাকুরেদের এত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, এত জায়গায় যেতে হয় আর এত বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয় যে সেসব গুছিয়ে লিখলেই একটা চমৎকার চিত্তাকর্ষক উপন্যাস হয়ে যায়।'

বংশী বলল, 'সে আমাদের বিশু বলিয়ে কইয়ে ছেলে, লিখলে খারাপ লিখবে না বলেই বিশ্বাস। তা আপনি কখনও এই লাইনে কাজ করেছেন নাকি?'

মাথা নাড়লেন চাটুজ্জেমশাই, 'ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ঢোকার আগে বছর দুয়েক একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ কম্পানির মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে কাজ করেছিলাম বই কি। তখনই এরকম এক শীতের রাতে আমার সঙ্গে যা ঘটেছিল আজ অবধি বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা পাইনি।'

আড্ডা আর ক্যারম ছেড়ে সবাই ঝট করে চাটুজ্জেমশাইকে ঘিরে বসলাম। বোঝাই যাচ্ছে যে ভদ্রলোক আজ গল্প বলার মুডে আছেন। শিবু ঝট করে ক্লাবের বাইরে মুখ বাড়িয়ে চা ওয়ালাকে এক কেটলি চা বলে দিল।

'অনেক বছর আগেকার কথা। তখন আমি চাকরি করি মৃত সঞ্জীবনী আয়ুর্বেদ কম্পানিতে। টেরিটোরি হচ্ছে গিয়ে সাউথ সেন্ট্রাল বেঙ্গল, মানে বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি। খাই দাই আর টো টো করি। গাড়ি আমার, আর হোটেল ভাড়া, খাওয়াদাওয়া, তেলের খচ্চা সব কম্পানির। আমিও সুখেই আছি। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াই আর কাজের ফাঁকে সব দ্রষ্টব্যস্থান দেখে বেড়াই।

এই করে করে বছর দুয়েক কেটেছে। এমন সময় ঘটল একটা ঘটনা।

তখন জুন মাস, বর্ষা সবে শুরু হয়েছে। আমাদের একটা প্রোডাক্ট

ছিল, নোকাফ। মানে কাশির অব্যর্থ ওষুধ। বর্ষা আর শীতের সময় তার মারকাটারি সেল ছিল। ডিস্ট্রিবিউটরদের স্টক সাপ্লাই করে কুলিয়ে উঠতে পারতাম না। এমনও হয়েছে আমাদের কলকাতার গোডাউন খোলার আগেই দেখি ডিস্ট্রিবিউটররা এক-একটা করে টাটা চারশো সাত নিয়ে দাঁড়িয়ে।

আমাদের বর্ধমানের ডিস্ট্রিবিউটের নাম ছিল হরগোপাল তরফদার, ওরফে হাবুলদা। সদাহাস্য অমায়িক লোক। বয়েস গোটা পঞ্চাশের কাছাকাছি, দেখতে ফর্সা মোষের মতো, মাথা বিলকুল ন্যাড়া। হাবুলদা কম্পানির অনেকদিনের পুরনো দিনের ডিস্ট্রিবিউটর। উপরমহল অবধি জানাশোনা আছে।

এহেন হাবুলদাকে নিয়ে বাধল বিশাল ঝামেলা। বেঙ্গল ডিপো'তে নোকাফ-এর স্টক এসেছে কম। এদিকে ডিপো ম্যানেজারের ভুলে সেই স্টক অন্য কাউকে না দিয়ে পুরোটাই বিল করা হয়ে গেছে কলকাতার ডিস্ট্রিবিউটরকে।

সে নিয়ে চারিদিকে অসন্তোষ। ওপর মহলে ফোন যেতে লাগল। ডিস্ট্রিবিউটরদের কেউ কেউ কড়া চিঠিও লিখলেন। আর তার নেতৃত্বে আর কেউ নয়, আমাদের হাবুলদা।

অবস্থা বেগতিক দেখে আমাকেই মাঠে নামতে হল।

বেরিয়েছিলাম দুপুর নাগাদ। তখন নতুন হাইওয়ে সবে তৈরি হচ্ছে। দুপাশে ধানের খেত আর গাছপালা। চারিদিকে মনোরম বাতাস। হাইওয়ে প্রায় ফাঁকা। দূর থেকে দেখা যায় তার ওপর ঝুঁকে আছে জলভরা মেঘ। সে দৃশ্য দেখেও শান্তি।

হু হু করে গাড়ি ছোটালাম একশো কিলোমিটার স্পিডে।

বর্ধমান পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল চারটে হল। আগেই পৌঁছতে পারতাম যদি এয়ারপোর্টের জ্যামে আর শক্তিগড়ের ল্যাংচায় না আটকাতাম। তবে ওই রাস্তায় গেলে শক্তিগড়ের ল্যাংচা একটিবার টেস্ট না করাটা পাপ।

হাবুলদা'র কাছে পৌঁছে দেখি ব্যাপার খুব গুরুতর। যে লোকটা

আমাকে ভাই ভবতারণ ছাড়া অন্য কোনও নামে কোনওদিন সম্বোধন করেনি, সে মিস্টার চ্যাটার্জি ছাড়া কথাই বলছে না। গলা গম্ভীর, মুখ হাঁড়ির মতো, চোখ ছলোছলো। মনে মনে প্রমাদ গনলাম। টার্গেট ফার্গেট পরের কথা, অমন বিশ্বাসী ডিস্ট্রিবিউটর বিগড়ে গেলে তো মুশকিল। তবে আমিও তখন এই লাইনের ঘাঁতঘোঁত জেনে গেছি। বিগড়ে যাওয়া ডিস্ট্রিবিউটরকে কীভাবে লাইনে আনতে হয় সেটা যাকে বলে সেলসের অ আ ক খ'র মধ্যেই পড়ে।

সময় লাগল অনেক। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বরফ টরফ গলিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সময় লাগল ঠিক ঘণ্টা চারেক। তার মধ্যে অনেক রাগারাগি, অভিমান, দুঃখ সব একবার করে হয়ে গেল।

শেষে যখন উঠলাম তখন প্রায় আটটা বাজে। আমার আবার সেদিনই বর্ধমান থেকে ঘাটাল যাওয়ার কথা, পরেরদিন সকালে মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে মিটিং আছে। এখান থেকে ঘাটাল পৌঁছতে কম করে হলেও ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। রাস্তা ফাঁকা থাকলেও রাত এগারোটা-সাড়ে এগারো'টার আগে পৌঁছতে পারব না। তার ওপর বর্ষার রাত। মাঝরাতে রাস্তায় গাড়ি খারাপ হলে দেখবে কে? ফলে হাবুলদা'কে বিদায় জানিয়ে সেই যে গাড়িতে উঠে থার্ড গিয়ারে স্টিয়ারিং ধরলাম, নেক্সট বিশ কিলোমিটারের আগে গিয়ার চেঞ্জ করিনি!

* * *

বর্ধমান থেকে ঘাটালের রাস্তাটা যায় আরামবাগ হয়ে। বর্ধমান থেকে আরামবাগ প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা। দিনের বেলা সময় লাগে দেড় ঘণ্টা। রাতের বেলা সামান্য বেশি। আরামবাগ থেকে ঘাটাল আরও চল্লিশ কিলোমিটার। সে পেরোতে ঘণ্টা দুয়েকের একটু বেশি লাগে। কারণ রাস্তার অবস্থা কহতব্য নয়।

দামোদর নদীর ব্রিজ পেরিয়েই গাড়ি ছোটালাম জোরে। ঘাটালে একটা বাঁধা গেস্ট হাউস আছে, গেলে ওখানেই উঠি। এতদিন গিয়ে গিয়ে প্রায় পরিবারের মতো হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানেও রাত এগারোটার পর গেলে পেটে কিল মেরে ঘুমোতে হবে।



বর্ষার রাত। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। প্রথম অনেকটা রাস্তা হুড়মুড়িয়ে চলে এলে কী হবে, এখন গাড়ি চালাচ্ছি খুব সাবধানে, যাটের ওপর কাঁটা উঠতেই দিচ্ছি না। এমনিতে খানাখন্দভরা রাস্তা, তার ওপর ড্রাইভ করছি গ্রামগঞ্জের রাস্তায়। ব্রেকডাউন হলে আর দেখতে হবে না। এদিকে এমনিতেই রাত আটটার পর লোকজন বিশেষ থাকে না। আর এখন বর্ষার রাতে তো রাস্তাঘাট আরও নিঝুম। নেড়ি কুত্তা অবধি দেখা যাচ্ছে না।

আরামবাগ পৌঁছতে পৌঁছতে রাত দশটা। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেবল উল্টোদিক থেকে আসা লরি আর প্রাইভেট গাড়ির ঝাঁটার মতো আলো ছাড়া আর কোথাও কোনও সাড়া শব্দ নেই। তারই মধ্যে আরামবাগের বাজার চত্বরে গাড়িটা দাঁড় করালাম। সেখানে দেখি একটা চায়ের গুমটি এত রাতেও খোলা। মালিক উদাস মুখে নিভু নিভু উনুনের পাশে বসে আছে।

একটা বড় ভাঁড়ের চা অর্ডার করলুম। সঙ্গে একটা বাপুজি কেক আর দুটো লেড়ো বিস্কুট। দুপুরে লাঞ্চ হজম হয়ে এখন পেটে ছুঁচোরা রীতিমতো ডনবৈঠক দিচ্ছে।

আমার গোগ্রাসে খাওয়া দেখে লোকটার বোধহয় মায়া হল। ঘরঘরে গলায় বলল, 'একটু ঘুগনি আছে বাবু, খাবেন? দুটো পাউরুটি সেঁকে দিই?'

এরকম উত্তম প্রস্তাবে না বলে এমন আহাম্মক আমি নই। একটু পরেই ঠান্ডা ঘুগনি আর দুটো সদ্য সেঁকা টোস্ট এল। সেসব খেয়ে পেটটা ঠান্ডা হতে বার করে যেই লোকটাকে ধন্যবাদ দিতে যাব, লোকটা দেখি আমার দিকেই ঘোলাটে চোখে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম, বললাম, 'কিছু বলবে কাকা?'

লোকটা সেই ঘরঘরে গলায় বলল, 'কোথায় যাবেন?'

ঘাটাল যাব শুনে লোকটা আরও খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'কামারপুকুর হয়ে যাবেন তো?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'ওটাই তো একমাত্র রাস্তা। অন্য রাস্তা আছে নাকি?'

'আছে বই কি। দেওয়ানগঞ্জ, বালিহাটপাড়া, দামোদরপুর হয়ে একটা রাস্তা আছে বটে। আপনি কিন্তু বাবু ভুলেও ওই রাস্তাটা ধরবেন না।'

কৌতূহলী হলাম, 'কেন বলো তো?'

লোকটা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আজ শনিবার, তায় অমাবস্যা। রাস্তাটা ভালো নয় বাবু, যাবেন না।'

শুনে খটকা লাগল। রাস্তা খারাপ হলে বারণ করার কারণ বুঝি। কিন্তু শনিবার অমাবস্যার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?

লোকটা একটু দোনোমোনো করল, তারপর বলল, 'রাস্তাটা পুরোটাই গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেছে বাবু। অনেক পুরনো মন্দির, বটগাছ এসব পাবেন। ওই রাস্তাটা নিয়ে অনেক গল্পকাহিনী আছে। অনেকেই বলেছে নিশুতি রাতে ওখানে নাকি কিছু অনেক দেখা যায়, অনেক কিছু শোনা যায়।'

আমি কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলাম। একে আমি ভূত-ভগবানে ঘোর অবিশ্বাসী, তার ওপর শরীরে তখন জোয়ান রক্ত। চা আর খাবারের দাম মিটিয়ে বললাম, 'চিন্তা কোরো না কাকা, এই শর্মাকে ভয় দেখাবে এমন ভূত এখনও জন্মায়নি, থুড়ি, মরেনি।'

তখন যদি জানতাম, পরের কয়েক ঘণ্টায় আমার সঙ্গে কী হতে চলেছে!

* * *

আরামবাগ ছাড়ার একটু পরেই বেজায় ঘুম পেতে লাগল। তোমরা তো জানো, ড্রাইভারের পক্ষে ঘুম জিনিসটা কত মারাত্মক। তবে ঘুমেরও দোষ নেই। সারাদিন ধকল তো কম যায়নি। তবে রক্ষে এই যে রাস্তা ফাঁকা। অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স নেই বললেই চলে। মোটামুটি স্টিয়ারিং ধরে চল্লিশ-পঞ্চাশ স্পিডে গাড়ি চালাতে লাগলাম। বৃষ্টি একটু ধরে এসেছে।

একটু পর একটা কালভার্ট পার হওয়ার সময় একটা স্পিড ব্রেকারে আটকে গাড়িটা একটু ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চটকা ভেঙে সজাগ হয়ে উঠলাম।

এই রাস্তায় তো বহুবার যাতায়াত করেছি। কালভার্ট আসার তো কথা নয়। রাস্তা ভুল হল নাকি?

রাস্তার একপাশে সাবধানে গাড়িটা পার্ক করলাম। সামনেই একটা সিমেন্টের ফলক। ফলকের ওপরের লেখাটা রোদে জলে আবছা হয়ে এলেও দিব্যি পড়া যাচ্ছে এখনও, 'দেওয়ানগঞ্জ পঞ্চায়েত এলাকায় আপনাকে স্বাগত।'

এটা কীরকম হল? আমার তো রাস্তা ভুল হয় না। কামারপুকুরের রাস্তা আমার মুখস্থ। তার বদলে এই রাস্তাটা ধরলাম কী করে?

ভাবলাম কী করব? এই রাস্তাটাই নেব নাকি গাড়ি ফিরিয়ে কামারপুকুরের রাস্তাটা ধরব?

খানিক দোনোমোনো করে সামনে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিলাম। হাজার হোক, একটা নতুন রাস্তা তো চেনা হবে।

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে। গ্রামের রাস্তা হলে কী হবে, কাঁচা নয়, পিচের রাস্তা। যদিও জায়গায় জায়গায় রাস্তা ভেঙে এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে। তার মধ্যেই ধীরে ধীরে গর্ত বাঁচিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলাম।

এতক্ষণ গাড়ির কাচ বন্ধ ছিল, এসি চলছিল বলে। এবার এসি বন্ধ করে কাচ নামিয়ে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে জোলো বাতাস আর ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ ঢুকে পড়ল গাড়ির ভেতর। সঙ্গে ব্যাঙেদের সমবেত গ্যাঙর গ্যাং আর উদ্দাম ঝিল্লীরব। ছোটবেলায় ঝিল্লি টিল্লি নিয়ে কত্ত ভালো ভালো কবিতা পড়েছি। সেসব নির্ঘাত শহুরে কবিদের লেখা। এই দেড়শো ডেসিবেলের আর্তনাদ শুনলে কবিরা কানে হাত চাপা দিয়ে দৌড় দিতেন সন্দেহ নেই।

ভাঙাচোরা রাস্তায় গাড়ি চলছে আস্তে আস্তে আর হেডলাইটের আলোটা সামনের জমাট অন্ধকারের গায়ে আঁচড় কাটার চেষ্টা করছে। দুপাশে ঘন গাছপালা। গাড়িতে একটা টর্চ ছিল। সেটা জ্বালিয়ে একবার ডানদিকে ফেললাম। মনে হল আলোটা যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল, জঙ্গল এতই ঘন আর অন্ধকার জঙ্গল।



একটু পর জঙ্গল একটু পাতলা হয়ে এল। আর ঠিক তার পরেই একটা বিশাল বটগাছ।

বলতে নেই, বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁত করে উঠল। এত বড় বটগাছ জন্মে দেখিনি। যেমন উঁচু, তেমনই গুঁড়ির বেড়। কত পুরনো কে জানে। চারিদিকে গোল করে শান দিয়ে বাঁধানো।

তবে চমকানোর আরও একটু বাকি ছিল।

বড় বটগাছটা সরে যেতেই একটা মস্ত বড় পুরনো, পরিত্যক্ত জমিদারবাড়ি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তিনতলা জমিদারবাড়ি, সামনেটা বিশাল লম্বা। তার প্রায় শেষের দশা। একটা দিক হেলে পড়েছে, ইট খসে পড়েছে, দরজা-জানলা বলে আর কিছু নেই। ভাঙা জানলা থেকে বেরিয়ে আছে অশ্বত্থ পাকুড়ের চারা। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় কঙ্কালের করোটি থেকে যেন সাপের ফণা উঁচিয়ে আছে।

ভীতু মানুষ বলে আমার কোনওদিনই কোনও দুর্নাম ছিল না। কিন্তু বিশ্বাস করো, বুকটা ভয়ে ঠান্ডা হয়ে এল। চারিদিকে জনমনিষ্যি তো দূরের কথা, একটা কুকুর অবধি নেই। হু হু করে বইছে ঠান্ডা জোলো হাওয়া। আকাশ ঢেকে আছে মেঘে। সেই পরিবেশে চোখের সামনে এই প্রাচীন বটগাছ আর পোড়ো জমিদারবাড়ি দেখে বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠল।

তবে জনমনিষ্যি যে একদম নেই সে কথাটা ভুল বলে তক্ষুনি তক্ষুনি প্রমাণ পেয়ে গেলাম। ভয়টাও ঝুপ করে কমে গেল।

গাড়ি জমিদারবাড়ি ছাড়িয়ে একটু এগিয়েছে কি এগোয়নি, দেখি এক বয়স্ক বিধবা মহিলা সামনে সামনে হেঁটে যাচ্ছেন। পরনে সাদা শাড়ি, মাথা ঘোমটায় ঢাকা, আর হাতে প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগে মোড়া কিছু একটা। দেখে প্রাণে জল এল। যাক, একেবারে নির্জন জায়গা নয় তাহলে। ভাবলাম একবার ডাকি। তারপর ভাবলাম থাক, গ্রামগঞ্জের মানুষ, কোন কথাটা কীভাবে নেবেন কে জানে।

এরপর গাড়ির স্পিড একটু বাড়ালাম। দুপাশে ফের ঘন জঙ্গল শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে জঙ্গল একটু পাতলা হয়ে এলে দেখতে পাচ্ছি যে রাস্তার পাশে নয়ানজুলি। নয়ানজুলির ওপাশে চাষের খেত।

গাড়ি চালাতে চালাতে বুঝতে পারছিলাম কী যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু সেটা কী বুঝতে পারছিলাম না।

গাড়িটা চালাতে চালাতে আবার ওরকম একটা মস্ত বড় বটগাছ দেখতে পেয়েছি, অমনি একটা কথা বিদ্যুতের মতো মাথায় খেলে গেল।

সোজা রাস্তা। দুপাশে কোথাও গলি গলতা নেই, মহিলা হঠাৎ করে উদয় হলেন কোথা থেকে?

বুকের মধ্যে সেই ভয়টা এবার জমে বসল। কপালে অল্প অল্প ঘাম জমতে লাগল। প্রশ্নটা ক্রমান্বয়ে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সোজা রাস্তা, আমি গাড়ি চালিয়ে আসছি, মহিলাকে আগে কোথাও দেখতে পেলাম না, হঠাৎ করে রাস্তায় এলেন কোথা থেকে।

ভাবতে ভাবতেই একটা বাঁক নিয়েছি, দেখি সেই মহিলা! আবার! সেই সাদা শাড়ি, কপাল অবধি টানা ঘোমটা, আর হাতে সেই প্লাস্টিকের মোড়ানো ক্যারি ব্যাগ।

দেখে স্টিয়ারিং ধরা হাত কেন, অন্তরাত্মা অবধি কেঁপে গেল। কোন অলৌকিক মন্ত্রে সেই একই মহিলা এতটা পথ উজিয়ে আবার আমার সামনে চলে এলেন?

পরের কয়েকটা মুহূর্তের কথা তোমাদের কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না। হঠাৎ মনে হল পেটের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। নিমেষে গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনও শব্দ কানে আসছে না। হাত দুটো থর থর করে কাঁপছে। পায়ে জোর নেই।

ওই অবস্থাতেও কী করে জানি না গাড়ির অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিলাম। বোধহয় ওখান থেকে পালাবার ইচ্ছেটা জোরদার হয়ে উঠেছিল বলেই, যাকে বলে সারভাইভাল ইনস্টিংক্ট।

পরের দশটা মিনিট কীভাবে ওই খানাখন্দভরা বর্ষার রাস্তায় আশির ওপর স্পিডে গাড়ি চালিয়েছি সে আমিই জানি। মাথার মধ্যে আর কিছু নেই, শুধু কে যেন বলছে, পালাও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাও এখান থেকে।

একটু পর একটা বড় বাঁক। রাস্তাটা প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে ডানদিকে বেঁকে

গেছে। স্পিড কমাতে হল। বাঁকের জায়গাটা পেরোবার সময় দেখলাম রাস্তার বাঁদিকে দিগন্তবিস্তৃত দীঘি। দূরে পাহাড়ের মতো অন্ধকার মেঘ সেই দিঘির জলের ওপর ঝুঁকে আছে।

এর পর আরও একটা পুরনো ভাঙা মন্দির পেরোলাম। এবার আর রাস্তার পাশে জঙ্গল নেই। দূরে গ্রামের টিমটিমে আলো দেখা যাচ্ছে।

এবার একটু একটু করে সাহস ফিরে আসছে। গাড়ির গতি ধীর করলাম। বুক ধড়ফড়টা একটু কমেছে। মাথাটাও মোটামুটি কাজ করছে। খেয়াল করলাম যে গেঞ্জি জামা ঘামে একেবারে সপসপে ভিজে।

একটু একটু করে এগোচ্ছি। একটু পরেই আবার একটা বাঁক। এবার বাঁদিকে। আস্তে আস্তে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছি। হেডলাইটটাও আস্তে আস্তে ঘুরছে। বাঁকটা শেষ হবে, এমন সময় হলদেটে আলোর মধ্যে ধীরে ধীরে একটা অতি প্রাচীন টেরাকোটা শিবমন্দির জেগে উঠল। তার ইট পাথর খসে পড়েছে, মন্দিরের চাতাল অর্ধেক নেই। মন্দিরের মাথা জুড়ে সাপের মতো জড়িয়ে আছে একটা বুড়ো বটগাছ। মন্দিরের দরজাটা অন্ধকারে হা হা করছে।

বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ ভাবটা আবার ফিরে এল। কিন্তু আর একটু এগোতেই পরের যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল তাতে হৃৎপিণ্ডটা একলাফে আলজিভের কাছে এসে আটকে গেল।

মন্দিরের ঠিক ওপাশে ভেসে উঠেছে একটা অবয়ব। আর তাকে চিনে নিতে আমার এক মুহূর্ত সময় লাগল না।

সেই বুড়িটা! সেই সাদা শাড়ি, সেই কপাল অবধি টানা ঘোমটা আর হাতে মোড়ানো প্লাস্টিক ব্যাগ।

ঠিক তক্ষুনি যে আমার হার্টফেল হয়নি সে আমার পূর্বপুরুষদের অনেক পুণ্যফল। মরেই যেতাম যদি না ঠিক তক্ষুনি একটা অন্য ঘটনা ঘটত।

বুড়িকে দেখতে দেখতেই গাড়িটা চলে এল মন্দিরের সামনে আর বাঁদিকের চাকাটা একটা গর্তে পড়ে একরাশ নোংরা জল বুড়িটার গায়ে ছিটিয়ে দিল।



গাড়িটার স্পিড কমানোর প্রশ্নই ওঠে না, কারণ আমার পা ইতিমধ্যেই অবশ। হাতও তাই। স্টিয়ারিং চলছে নিজের মতো। শুধু যেতে যেতে দেখলাম বুড়ি তার ঘোমটা পড়া মাথাটা আমার দিকে ঘোরাল। আর এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে আমি বুড়ির মুখে একটা বীভৎস ভ্যাচকানো হাসি দেখতে পেলাম।

আগেও অনেকবার লক্ষ্য করেছি যে চূড়ান্ত বিপদের মুহূর্তে মাথা সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে গেলেও, কোনও এক দৈবী আদেশে হাত পায়ের পেশিগুলো একদম সচল সজাগ হয়ে ওঠে, তাদের কোনও নির্দেশ প্রয়োজন হয় না। এবারেও তাই হল। মগজের সক্রিয় নির্দেশ ছাড়াই গাড়ির অ্যাক্সিলরেটরে পা চলে গেল। আর আমার দশ বছরের পুরনো গাড়িটা যেন উড়েই চলল সামনের দিকে।

কতক্ষণ ড্রাইভ করেছিলাম জানি না। এক-একটা মুহূর্ত অনন্তকাল মনে হচ্ছিল। ততক্ষণে গ্রামের রাস্তা শেষ করে একটা হাইওয়েতে উঠেছি। হাতে পায়ে সাড় ফিরে পেয়েছি। মগজও কাজ করছিল একটু আধটু। একটু এগোতেই দেখি একটা চায়ের গুমটি। তার সামনে কোনওমতে গাড়িটা দাঁড়করিয়ে কোনওমতে টলতে টলতে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম, গাড়ির দরজাটা খুলে রেখেই।

দোকানি বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা ঘটেছে। সে শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'কী হয়েছে বাবু, শরীর খারাপ লাগছে?'

তখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হইনি। মুখে কোনও কথা ফুটল না। লোকটা চট করে এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এসে বলল, 'আস্তে আস্তে খেয়ে নিন।'

গরম দুধটা খেয়ে হাতে পায়ে বল এল। তখন মোটামুটি লোকজন দেখতে পাচ্ছি। হাইওয়ে দিয়ে সাঁই সাঁই করে ভিন রাজ্যের লরি চলে যাচ্ছে। একটু আগের অবশ করে দেওয়া ভয়টা আর নেই। ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, 'কোনওমতে বেঁচে ফিরে এসেছি দাদা।'

লোকটা বলল, 'সে কী? কী হয়েছে?'

বললাম, 'আপনাদের এই পাশের গ্রামের রাস্তাটা খুব খারাপ দাদা। আপনারা জানেন না?'

লোকটা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে গ্রামের রাস্তা একটু ভাঙাচোরা হবেই। কিন্তু তাতে বাঁচা-মরার কথা উঠছে কেন?'

আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভাঙা রাস্তার কথা বলছি না।'

'তাহলে?'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'একটু আগে ওই রাস্তায় একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হল দাদা। ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'সে কী? কী হয়েছে?'

'আপনাদের গ্রামের রাস্তায় রাতের বেলায় কাদের কাদের দেখা যায় জানেন না?'

লোকটা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কাদের আর দেখা যাবে। মানুষজনই হবে।'

লোকটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'না দাদা, যাদের দেখা যায় তারা সবাই মানুষ নয়।'

লোকটা এবার বোধহয় বুঝতে পারল। সন্দিগ্ধস্বরে বলল, 'কী হয়েছে খুলে বলুন তো।'

পুরো গল্পটা খুলে বললাম। শেষে বললাম, 'দাদা, সেই বীভৎস হাসিটা জীবনেও ভুলতে পারব না।'

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আমি দেওয়ানগঞ্জ থেকে ঢুকেছিলেন?'

বললাম 'হ্যাঁ।'

কোথাও কিছু নেই, লোকটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। সে হাসি আর থামতেই চায় না। আমি তো অবাক। এতে হাসির কী হল?

হাসি থামলে লোকটা বলল, 'ধুর, ওসব ভুতটুত কিছু নয় বাবু। দেওয়ানগঞ্জে আজ বয়স্ক বিধবাভাতা দেওয়ার ক্যাম্প বসেছিল। আশপাশের সব ক'টা গ্রামের বয়স্ক বিধবারা গেছিল ভাতা নিতে। সন্ধে অবধি ভাতা দিয়েছে। তারপর সবাই গ্রামে ফিরে আসছিল। আপনি তাদেরই দেখেছেন নিশ্চয়ই। সবাই বুড়ি, সবারই সাদা শাড়ি, আর সবার হাতেই ভাতা'র

কাগজপত্র। আর আপনার মনে হয়েছে আপনি একই লোক দেখেছেন।'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'কিন্তু একটাই রাস্তা, কাউকে আসতে দেখলাম না, হঠাৎ করে আমার সামনে উদয় হচ্ছিলেন কী করে?'

'বাবু, মোটর গাড়ি চলার রাস্তা একটা হতে পারে। গ্রামের ভেতর ভেতর দিয়ে কত পায়ে হাঁটার রাস্তা আছে জানেন? ওসব শর্টকাট গাঁয়ের লোকেরাই জানে। বুড়িরা ওই রাস্তা দিয়েই এসে আপনার সামনে উপস্থিত হচ্ছিল আর আপনার মনে হয়েছে একই বুড়িকে বারবার দেখছেন। সত্যি বাবু, আপনাদের শহরের লোকদের দেখছি ভূত দেখার বাই আছে। এই দেখুন না, আমার মা নিজেই গেছিল ভাতা আনতে। এই তো একটু আগে ফিরে এসে দোকানে বসে আছে। এই দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরব।

এতক্ষণ খেয়াল করিনি, এখন দেখি দোকানের ভেতরে এক কোণে এক বয়স্কা বিধবা মহিলা বসে। সাদা শাড়ি, কপাল অবধি ঘোমটা। কোলে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে কাগজপত্র নিয়ে বসে আছেন।

এর পর আর কথা চলে না। অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম।

গল্পটা এখানেই শেষ হত। হল না অন্য কারণে।

এর মাস খানেক বাদে ফের হাবুলদা'র কাছে গেছি কাজে। কথায় কথায় সেই রাতের কথাটা উঠল। আমি নিজের বেকুবির কথাটা ফলাও করে বলে নিজেই একচোট হাসলাম। কিন্তু হাবুলদা হাসল না।

আমি বললাম 'কী হল?'

হাবুলদা গম্ভীরমুখে বলল, 'কিছু একটা গড়বড় আছে ভব। আমার মাসতুতো ভাই রাইটার্সে চাকরি করে। আগে তার কাছ থেকে একটা জিনিস জেনে নিই। তারপর বাকিটা বলছি।'

পাশের ঘরে গিয়ে কাকে যেন ফোন করল হাবুল। ফোন শেষ করে যখন ফিরে এল তখন তার মুখ গম্ভীর। বলল, 'বয়স্ক বিধবা ভাতা বলে গভর্নমেন্টের কোনও ভাতা বা স্কিম নেই ভব। আর তুমি যে গল্পটা বললে সে কাহিনী আমি হুবহু শুনেছি আরও দু'একজনের মুখে। সেদিন যা দেখেছিলে, তার মধ্যে মস্ত কিছু গন্ডগোল আছে। তুমি ভুল কিছু দেখোনি।'

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'গাড়ি তো আছেই। চলো, একবার স্বচক্ষে দেখেই আসি জায়গাটা, আর সেই চায়ের দোকানির সঙ্গে কথা বলে আসি।'

ফের গেলাম সেই রাস্তায়। সেই একই রাস্তা, সেই বটগাছ, পোড়ো জমিদারবাড়ি, ভাঙা শিবমন্দির পেরিয়ে হাইওয়েতে উঠলাম।

কই সেই চায়ের দোকান? সব ভোঁ ভাঁ। এমন নয় যে দোকান ছিল, উঠে গেছে। তাহলে তার চিহ্ন থাকত।

একটা লোক সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, এখানে একটা চায়ের দোকান ছিল না?'

সে অবাক হয়ে বলল, 'চায়ের দোকান? কই না তো?'

আমি দোকান আর দোকানদারের বর্ণনা দিলাম। লোকটা বলল, 'ও, এবার বুঝলাম। এখানে চায়ের দোকান একটা ছিল বটে, বিধবা মা আর ছেলে মিলে চালাত। একবার এক বর্ষার রাতে একটা লরি ব্রেক ফেল করে দোকানে ঢুকে পড়ে। দুজনেই স্পট ডেড। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগেকার কথা। এখন খুঁজছেন কেন?'

আমি আর হাবুলদা চুপচাপ ফিরে এলাম। তারপর থেকে আমি আর কোনওদিন রাতের বেলা অজানা গ্রামের রাস্তা ধরিনি।'

চাটুজ্জেমশাই চুপ করলেন। আমরাও।

দ্রোলমার খড়্গ

আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগের কথা। বীরভূম জেলার একটি ছোট গ্রাম চণ্ডীপুর। এক গ্রীষ্মের সকালে গ্রামের জমিদার বাড়ির কুলপুরোহিত পণ্ডিত রামনারায়ণ মিশ্র মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছিলেন কাছারির দিকে। জমিদারবাড়িতে দেবী কিরীটেশ্বরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রামনারায়ণই তার নিত্যপূজা করে থাকেন।

যখনকার কথা বলছি তখন ভারতবর্ষে আকবর বাদশার রাজত্বকাল চলছে। সুবে বাংলা'র শাসনকর্তা হয়ে এসেছেন খান ই জাহান মুনিম খান। তখন দেশগাঁয়ে অনেক ছোটবড় জমিদার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাজত্ব করতেন। বিনিময়ে তাঁরা সরকারবাহাদুরকে খাজনা দিতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী। আবার ভালো জমিদারও কম ছিলেন না। তাঁরা প্রজাদের সন্তানস্নেহে লালনপালন করতেন, বিপদে আপদে সবার পাশে থাকতেন। প্রজারাও এমন জমিদারকে নিজের অভিভাবক হিসেবে মানত, প্রয়োজনে তাদের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াত।

চণ্ডীপুরের জমিদার প্রতাপনারায়ণ রায়চৌধুরী ছিলেন এমনই এক জমিদার। জনশ্রুতি ছিল প্রতাপনারায়ণের পূর্বপুরুষরা নাকি ডাকাতি করে সেই সব লুটের টাকায় এই জমিদারি কেনেন। প্রতাপনারায়ণের বাবা আর ঠাকুর্দা দুজনেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুরুষ ছিলেন, তাঁদের ভয়ে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত। প্রতাপনারায়ণ আবার তার উলটো। সুদর্শন মানুষটি সংস্কৃত আর ফার্সি, দুই ভাষাতেই সুপণ্ডিত। গুণীর আদর করতে জানেন। অন্তত দুটি পাঠশালার ব্যয় নির্বাহ করেন। পুকুর কাটানো, মন্দির প্রতিষ্ঠা, গরিবকে অন্নদান, নিয়মিত দান ধ্যান, এসবে তাঁর জুড়ি নেই। লোকে



বলে বহুপুণ্যফলে রায়চৌধুরী পরিবারে এমন মহাপুরুষ জন্মেছেন।

এই রায়চৌধুরীদেরই ইষ্টদেবী হলেন মা কিরীটেশ্বরী। জনশ্রুতি আছে যে এককালে এই এলাকার রাজা খড়্গেশ্বরের রাজপ্রাসাদে দেবী কিরীটেশ্বরী পূজিতা হতেন। তারপর যবন আক্রমণে রাজা খড়্গেশ্বরের রাজবংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, মূর্তিটি রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে।

এর বহু বছর পর ওই অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হলে সেই প্রলয়ঙ্করী বন্যায় মূর্তিটি ভেসে এসে আটকা পড়ে বারুনী নদীর ঘাটে। রামনারায়ণ মিশ্র'র কোনও এক পূর্বপুরুষ নদীতে স্নান করতে গিয়ে মূর্তিটির সন্ধান পান। তিনি দেবী কিরীটেশ্বরীকে উদ্ধার করে গ্রামের জমিদার রায়চৌধুরীর হাতে সমর্পণ করেন। জমিদার মশাই দেবীকে কুলদেবীরূপে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করতে থাকেন। আর সেই থেকে মিশ্ররা এই মূর্তির বংশানুক্রমিক পূজারি।

পথ চলতে চলতে একবার আকাশের দিকে চাইলেন পণ্ডিতমশাই। আজ ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়েছে। সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। ওদিকে ব্রাহ্মণীর শরীর ভালো না। সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে আসতে তাই একটু দেরি হয়ে গেল। ফিরতেও হবে তাড়াতাড়ি। যদিও চিন্তা নেই, মেয়ে সর্বমঙ্গলা মায়ের দেখভাল করছে।

সর্বমঙ্গলার কথা মনে পড়তেই নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল পণ্ডিতমশাইয়ের বুক চিরে। দেখতে দেখতে মেয়ের এগারো বছর বয়েস হয়ে গেল, অথচ এখনও মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারলেন না তিনি। এ নিয়ে যে দেশগাঁয়ের প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবার মধ্যে কানাকানি শুরু হয়েছে সে তিনি ভালো করেই জানেন, সবই তাঁর কানে আসে। ব্রাহ্মণীও নিত্য গঞ্জনা দিচ্ছেন মেয়ের বিয়ে নিয়ে। সোমত্থ মেয়ে, তাও ব্রাহ্মণ ঘরের, এত ধেড়ে বয়েস অবধি কেউ ঘরে রাখে?

আর মেয়েও হয়েছে তেমনি। রূপ যেন একেবারে ফেটে পড়ছে। একমাথা কোঁকড়া চুল, পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ, আর গায়ের রংটি যেন পাকা সোনা। তাকে দেখে দেখে পণ্ডিতের আর আশা মেটে না। মেয়ে তাঁর সাত রাজার ধন এক মাণিক, চোখের তারা, বুকের পাঁজর। সে পরের বাড়ি যাবে ভাবলেই তাঁর বুক হু হু করে ওঠে। কিন্তু কিছু

করার নেই। মেয়ে হল গচ্ছিত ধন। তাকে আজ না হয় কাল বিয়ে দিতেই হবে।

পাত্র যে পণ্ডিতমশাই একেবারে পাচ্ছেন না তা নয়। তবে তারা যৌতুক হিসেবে যা চাইছে সে দেওয়া তাঁর সাধ্যের বাইরে। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, জমিদারমশাইয়ের দয়ায় আর ছাত্র পড়িয়ে গ্রাসাচ্ছদনটুকু চলে যায়। মেয়ের বিয়ের অত পণ দেওয়ার সামর্থ্য তাঁর নেই। তাই দিনে দিনে তাঁর চিন্তা ক্রমে বেড়েই চলেছে।

কয়েকদিন আগে গাঁয়েরই নাপিত হারু একটা ভালো সম্বন্ধ এনেছে। চণ্ডীপুরের দশ ক্রোশ উত্তরে তালকোঠরি গ্রাম। সেখানকার হরিসাধন বন্দ্যঘটী তাঁর ছোট ছেলের জন্য একটি পাত্রী খুঁজছেন। হরিসাধন সম্পন্ন গৃহস্থ। জমিজমাও কম নেই। তাছাড়া একটি চতুষ্পাঠী চালান। তাতে ছাত্র প্রচুর। ছেলেটি নিজেও বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। হরিসাধন চতুষ্পাঠীর ভার ছোট ছেলের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। তার ওপর পালটি ঘর। এমন সম্বন্ধ লাখে একটা মেলে। কিন্তু হারু নাপিত পণের যা ফিরিস্তি দিয়েছে, দেখে রামনারায়ণের বুক ভরা আশা ধুক করে নিভে গেছে।

চলতে চলতে ফের একবার মাথার ওপর সূর্যটাকে দেখে নিলেন পণ্ডিতমশাই। এবার একটু তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে। নইলে ফেরার সময় দেরি হলে মেয়েটা চিন্তায় থাকবে।

চিন্তার অবশ্য যথেষ্ট কারণও আছে।

দিগন্তবিস্তৃত এই মাঠের নাম হচ্ছে বাঘার মাঠ। বাঘা ডাকাত এককালে এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিল। তার নামে বুক কাঁপত না এমন লোক এদিগরে একটিও ছিল না। সে নাকি এক কোপে দু'জন লোকের মাথা কাটতে পারত, এমনই ছিল তার গায়ের জোর। মাঠের পাশে এক বিশাল ঘন জঙ্গল। তার নামও বাঘা ডাকাতের নামেই, বাঘার জঙ্গল।

জঙ্গলের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তি ছিল। বাঘা ডাকাত সে লোকজন ধরে সেই মূর্তির সামনে নরবলি দিয়ে ডাকাতি করতে যেত।

এখন বাঘার জঙ্গলে দিনমানেই লোক যায় না, সন্ধের পর তো কথাই

নেই। জন্তুজানোয়ার সাপখোপ তো আছেই। তাছাড়াও বাঘার জঙ্গলের অন্য একটাও দুর্নাম আছে।

এই এলাকার সব্বাই জানে বাঘা ডাকাত যাদের নরবলি দিত তাদের আত্মা নাকি এখনও জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তাই এই জঙ্গলে ঢোকা মানা। অনেক দিন আগে নাকি কয়েকজন কাঠুরে মোড়লের মানা না শুনে কাঠ কাটতে বাঘার জঙ্গলে ঢুকেছিল। তাদের কেউ ফেরেনি। তারপরেও অবশ্য লোকে জঙ্গলের কাছাকাছি যেত, কাঠকুটো কুড়োতে। কিন্তু বেশি ভেতরে ঢোকার সাহস কারও হয়নি কোনওদিনও।

তবে তাও বন্ধ হয়ে গেছে মাসখানেক আগের একটা ঘটনায়। ইদানীং নাকি জঙ্গলের মধ্যে এক কাপালিক এসে বসবাস করছে। দুএকজন দূর থেকে দেখেছে সেই কাপালিককে। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করার আগেই সে জঙ্গলে মধ্যে মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেই শুনে গ্রামেরই একটি ডানপিটে ছেলে, নাম জগাই, বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে ঢুকেছিল বাঘার জঙ্গলে। অনেকক্ষণ পর সে ফিরে আসছে না দেখে কয়েকজন সাহসী লোক জঙ্গলের কাছে গিয়ে দেখে জগাইয়ের অচৈতন্য দেহটা জঙ্গলের বাইরে একটা বড় বটগাছের নীচে পড়ে আছে। তার মুখ থেকে তখন গ্যাঁজলা উঠছে। তুলে আনার পরেও স্বাভাবিক হয়নি সে। দিন দুয়েক ওভাবেই পড়ে থাকার পর এক রাতে হঠাৎ করে বিছানায় ছটফটিয়ে ওঠে জগাই। তখন তার দু'চোখে ভয়, গলার স্বরে আতঙ্ক। যেদিকে জঙ্গল সেদিকে আঙুল তুলে একটাই কথা বলে যাচ্ছে সে, 'দানো এসেছে, ওই দেখো দানো এসেছে। খেয়ে ফেললে রে, আমাকে খেয়ে ফেললে রে..'। আর প্রতিটা বাক্যের সঙ্গে তার শরীর মুচড়ে উঠছিল আগুনে দেওয়া সাপের মতো।

অশেষ কষ্ট পেয়ে মারা যায় জগাই। সেই মরণান্তিক আর্তনাদ এখনও গ্রামের লোকেদের কানে বাজে।

গা'টা শিউরে উঠল পণ্ডিতমশাইয়ের। দ্রুত হাঁটতে থাকলেন তিনি।

* * *

রামনারায়ণ মিশ্র জমিদারবাড়িতে ঢুকে দেখলেন সেরেস্তায় একেবারে এলাহি ব্যাপার। নায়েব, খাজাঞ্চি থেকে শুরু করে বাকি পাত্রমিত্ররা তো আছেনই, পাইক লেঠেলদের সর্দার কালু ডোমও এসেছে। গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত। পণ্ডিতমশাই বুঝলেন কোনও উত্তেজিত আলোচনা চলছে। একটু অবাকই হলেন তিনি। এমন কী হল যে এত লোক জড়ো হয়েছে এখানে?

পণ্ডিতমশাই মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন। তার আগেই জমিদারবাবুর আহ্বান ভেসে এলো, 'পণ্ডিতমশাই, পুজো করে একটু এদিকে আসুন। কথা আছে।'

আজকের পুজোটা বেশ একটু চিন্তিতভাবেই সম্পন্ন করলেন রামনারায়ণ। এতদিন হয়ে গেল এই বাড়িতে যাওয়া আসা আছে তাঁর, কই, এত লোকের জমায়েত তো কোনওদিন দেখেননি তিনি।

পুজো শেষ করে প্রসাদ বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা করে ফের সেরেস্তায় এলেন রামনারায়ণ। দেখলেন ভিড় তো কমেইনি, বরং আরও বেড়েছে সবার মুখ গম্ভীর, আবহাওয়া যথেষ্ট থমথমে।

রামনারায়ণ এসে দাঁড়াতে একজন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কুশাসনটি এগিয়ে দিল। রামনারায়ণ তাতে বসে প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার বাবা প্রতাপ, এত লোকজন কী জন্য? খুব গুরুতর কিছু ঘটেছে?'

প্রতাপনারায়ণ চিন্তিতমুখে বললেন, 'হ্যাঁ ঠাকুরমশাই। ব্যাপার গুরুতরই বটে। কয়েকদিন ধরেই খবর আসছিল যে আশপাশের কয়েকটা জমিদারি মিলিয়ে ছোটখাটো চুরিচামারির সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তবে সে যে এত বড় আকার ধারণ করবে সে ভাবিনি।'

'কীরকম?'

উত্তর দিলেন নায়েবমশাই রজনীকান্ত সরকার। প্রবীণ মানুষটি প্রতাপনারায়ণের বাবার আমল থেকেই চণ্ডীপুর জমিদারবাড়ির নায়েবের দায়িত্বপালন করছেন। তিনি গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'যেগুলোকে আমরা ছোটখাটো চুরিচামারি বা ছিনতাই ভাবছিলাম, সেগুলো ছিল

আসলে সলতে পাকানো। এখন বোঝা গেছে যে একটা বেশ বড় ডাকাতের দলের আবির্ভাব হয়েছে এই অঞ্চলে। পাশের গ্রামের ভুবন সরখেলকে তো চেনেন?'

চেনেন বইকি রামনারায়ণ। ভুবন সরখেল হেঁজিপেঁজি লোক নয়। গঞ্জে বাজারে তার তিনখানি চালের আড়ত আছে। পাট আর তুলোর ব্যবসা থেকেও তার উপার্জন কম নয়। এছাড়াও তেজারতি কারবার করে সে বেশ ফুলেফেঁপে উঠেছে। গৃহে প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব আছেন, নিত্যই ধুমধাম সহ তাঁর পূজার্চনা চলে।

'গত সপ্তাহে ভুবন সরখেল মুর্শিদাবাদে এগারো নৌকো বালাম চাল আর আট নৌকো ফুটি কাপাসের তুলো পাঠায়। আপনারা তো জানেন, মসলিন তৈরিতে একমাত্র ফুটি কাপাসের তুলোই লাগে। সেই সূত্রে তার প্রচুর ধনলাভ হয়। কিন্তু সংবাদ এসেছে যে দুদিন আগে তার বাড়িতে ডাকাত পড়ে সমস্ত সোনার গহনা আর মোহর অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে ডাকাতরা কখন কীভাবে ঢুকল, কীভাবে সব লুট করে নিয়ে গেল কেউ বুঝতে পারছে না।'

বুদ্ধিমান এবং ঠান্ডা মাথার মানুষ বলে অনাথবন্ধু মুখুটির নাম আছে। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'শুধু কি তাই? আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি গত মাস খানেক ধরে আলাইপুর, তেলেনিপাড়া, মোষডোবা, বাহিরগাছি, চক গঙ্গাপুর এসব অঞ্চলে ছিনতাই, ছোটখাটো ডাকাতি এসব প্রচুর বেড়ে গেছে। চোর ছিনতাইবাজরা আসছে একেবারে নিঃসাড়ে, আর সর্বস্ব লুটে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে যাচ্ছে। সন্ধের পর লোকে পথে যাতায়াত করতে ভয় পাচ্ছে।'

'তবে একটা কথা কি জানেন মুখুটি মশাই, 'চিন্তিতস্বরে বলেন রজনীকান্ত সরকার,' শুনেছি এরা নাকি শুধু সোনাদানা লুট করে। আর কিছু না। ভুবন সরখেলের বাড়ি থেকেও শুধু সোনার মোহর আর গহনা নিয়ে গেছে। আর কিছুতে হাত দেয়নি। এদের শুধু সোনার ওপরেই যত লোভ।'

প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'সে কী? সোনা ছাড়া রুপো বা অন্য কোনও বহুমূল্য রত্ন, মণি কিছুতেই এদের আগ্রহ নেই?'



'না বাবা প্রতাপ। শুধু সোনা।'

'চাল ডাল শস্য আনাজ মশলা এসব কিছু?'

'নাহ, আজ অবধি এদের এসবও কিছু লুট করতে দেখা যায়নি।'

উঠে বসলেন প্রতাপনারায়ণ, 'তাহলে নিশ্চয়ই গঞ্জ বা হাট থেকে কিনে নিয়ে যায়। কোনও না কোনও আড়কাঠি তো আছেই যে ওদের হয়ে এসব শস্য সংগ্রহ করার জন্য। তার খোঁজ করলেই তো হয়।'

অনাথবন্ধু মাথা নাড়লেন, 'সে কথা আমরাও ভেবেছি জমিদারমশাই। গঞ্জের সমস্ত পাইকার, দোকানদার সবাইকে বলা আছে, হঠাৎ করে কেউ যদি অনেক চাল ডাল আনাজ কেনা শুরু করে তবে আমাদের সংবাদ দিতে। কিন্তু সেরকম কারও সন্ধানও পাইনি।'

রামনারায়ণ প্রশ্ন করলেন, 'নবাবের পাইক বরকন্দাজরা কিছু করছে না?'

সরকারমশাই মাথা নেড়ে বললেন, 'তারা চেষ্টা করছে কম না। এমনকি পাশের গ্রামের জমিদারমশাই রতন সিঙ্গিও লোক লাগিয়েছেন এদের ধরবার জন্য। কিন্তু হলে কী হবে, এদের কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।'

'কেন? ধরা যাচ্ছে না কেন?'

'তার কারণ এরা কে, এদের আস্তানা কোথায়, কেউ জানে না। আর আগেই বলেছি, এরা ডাকাত হলে কী হবে, একদম শোরগোল করে না। হা রে রে বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। যেন বাতাস থেকে উদয় হয়, আর লুট করে ফের বাতাসে মিশে যায়। আর এত নিঃশব্দে ডাকাতি করে যে গলায় ফাঁস এঁটে বসার আগের মুহূর্ত অবধি শিকার বুঝতে পারে না যে তার শিয়রে সর্বনাশ। এমনকি আজ অবধি এদের কাউকে কেউ দেখতেও পায়নি।'

সবাই চুপ করে গেলেন। একটু পর অনাথবন্ধু যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে উপায়?'

প্রতাপনারায়ণ হুঁকোর নল মুখ থেকে নামিয়ে চিন্তিতমুখে বললেন, 'উপায় তো আমার মাথাতেও কিছু আসছে না মুখুটি মশাই। আমি ঘরে ঘরে লোক পাঠিয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে বলছি। শুধু তাই নয়,

সরকারমশাইকে বলেছি গাঁয়ে গাঁয়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে বলে দিতে কারও কাছে যদি দামি গয়নাগাঁটি বা সোনার মোহর কিছু থাকে, তারা চাইলে আমার কাছারিতে এসে রেখে যেতে পারে।'

রামনারায়ণ কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'কিন্তু বাবা প্রতাপ, সেক্ষেত্রে ওরাও তো জেনে যাবে যে তোমার জমিদারির সব অলঙ্কার, মোহর এই কাছারিতে জমা আছে। সেক্ষেত্রে ওরা দলবল জুটিয়ে কাছারি আক্রমণ করলে?'

প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'সে সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। তবে কাছারিতে পাইক বরকন্দাজ কম নেই। আমি আরও লেঠেল আনাচ্ছি কাছারিবাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য। আর কালু ডোম তো আছেই।'

কালু ডোম তার পর্বতপ্রমাণ শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠাকুরমশাই, যতক্ষণ কালু ডোমের দেহে প্রাণ আর হাতে লাঠি আছে, ততক্ষণ কাছারিবাড়ি লুটে নিয়ে যাবে এমন সাধ্য কোনও ডাকাতের বাবার নেই।'

কালু ডোমের বীরত্বের কথা সবাই জানেন। তার হাতে লাঠি থাকলে সে স্বয়ং যমরাজকেও ডরায় না। কথাটা শুনে রামনারায়ণ একটু স্বস্তি পেলেন।

প্রতাপনারায়ণ উঠে বসে বললেন, 'তাহলে ওই কথাই রইল। আমি ঢেঁড়া পিটিয়ে দিচ্ছি। আর সবাইকে বলছি একটু সাবধানে থাকবেন।'

* * *

দুধপুকুরের কাকচক্ষু জল তিরি তিরি করে কাঁপছিল। তার পাড়ে বসে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়েছিল সর্বমঙ্গলা।

সে জানে তাকে নিয়ে তার বাবা-মায়ের চিন্তার অন্ত নেই। তার সমস্ত সইদের বিয়ে হয়ে গেছে। মণিমালা, লক্ষ্মী, আমোদী, সব্বার। শুধু সেই একা বসে আছে আইবুড়ি হয়ে। মায়ের কাছে গাঁয়ের মাসিপিসিরা আসে, নিত্য গঞ্জনা দেয়। বলে বামুনের বাড়িতে এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে আইবুড়ো বসে থাকা নাকি ভালো লক্ষণ না, ওতে গাঁয়ের অমঙ্গল হয়।

সর্বমঙ্গলা সবই বোঝে। সে আর কচি খুকিটি নয়। এই অঞ্চলে পাঠান

পাইকদের খুব উৎপাত। তারা সুন্দরী মেয়ে দেখলেই অপহরণ করে। কখনও নিজের মালিককে নজরানা দেয়, কখনও নিজেরাই ভোগ করে। তাই তো বাপ-মায়েরা চায় যত তাড়াতাড়ি করে সম্ভব মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিতে। তাহলে আর মেয়েকে রক্ষার ভার তাদের নিতে হয় না।

বুকের ভেতর থেকে হিলহিলে সাপের মতো কান্না উঠে আসছিল সর্বমঙ্গলার। তার মোটেও বাড়ি ছেড়ে থাকতে ভালো লাগে না। এই গ্রাম, গ্রামের বুড়ো অশ্বত্থ গাছটা, মিষ্টি তেঁতুলের গাছ, দুধপুকুর, আমগাছ, ইতুপুজো, মাঘমণ্ডল ব্রত, পুন্যিপুকুর ব্রত, এসব ছেড়ে যেতে হবে ভাবলেই তার কান্না পায়। আর বাবা মা'কে ছেড়ে যেতে হবে ভাবলে তো তার বুকই ফেটে যায় কষ্টে।

তার বাবাঠাকুর খুব গরিব। আর সে জানে বাবাঠাকুর গরিব বলেই তার বিয়ে হচ্ছে না। মা ঠারেঠোরে বাবাকে অনেক করে বলেছে জমিদার মশাইকে জানাতে। সে এও জানে যে জমিদারমশাইকে বললে তিনি হয়তো কিছু অর্থসাহায্য করবেনও। কিন্তু তার বাবার আত্মসম্মানবোধ প্রচণ্ড। তিনি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য কারও কাছে এক পয়সা হাত পাতবেন না।

একবার ফের দুধপুকুরের স্থির জলের দিকে তাকায় সর্বমঙ্গলা। সেখানে একটা যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের ছবি ভেসে উঠল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে একটু কেঁদেও নিল সে। তারপর চোখের জল মুছে বাড়ির রাস্তা ধরল।

* * *

রাতে স্বামীকে ভাত বেড়ে দিয়ে তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করছিলেন গিরিসুন্দরী দেবী। রাতের এই সময়টায় স্বামী-স্ত্রী'র কিছু সাংসারিক কথা হয়। তাছাড়া গিরিসুন্দরী জানেন তিনি নিজের হাতে ভাত বেড়ে না দিলে স্বামী তৃপ্তি করে খান না।

আজ গিরিসুন্দরী লক্ষ্য করলেন তাঁর স্বামী যেন খুব অন্যমনস্ক। খেতে খেতে কী যেন ভাবছেন। একবারের বেশি দুবার ভাত চাইলেন না। খাওয়া শেষ করে শেষপাতের দুধটুকু রেখেই উঠে গেলেন।



হাত ধুয়ে এসে দাওয়ায় একটু বসলেন ঠাকুরমশাই। সাঁঝের পর নদীর দিক থেকে একটা ঝিরিঝিরি হাওয়া আসে। আকাশে এখন বৃশ্চিকরাশিতে অনুরাধা নক্ষত্র দৃশ্যমান। ওদিকে ধনুরাশিতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। আরও কয়েকটি নক্ষত্রকে দেখা মাত্র চিনলেন রামনারায়ণ, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা।

গিরিসুন্দরী রাতের খাওয়া শেষ করে স্বামীর পাশে এসে বসলেন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজকে আপনাকে বড় অস্থির দেখছি। জমিদারবাড়িতে কিছু হয়েছে?'

রামনারায়ণ সব কথাই গিন্নিকে জানালেন। তারপর চিন্তিতমুখে বললেন, 'এ তো বড় চিন্তার ব্যাপার হল গিন্নি। এমন দুর্দান্ত ডাকাতদল, যাকে জমিদার মশাই অবধি সমঝে চলছেন, সে যদি আমাদের বাড়িতে চড়াও হয়...'

গিরিসুন্দরী বুঝলেন তাঁর স্বামীর উদ্বেগের কারণ। তাঁদের বাড়িতে ধনসম্পদ কিছু নেই বটে কিন্তু পরমাসুন্দরী কন্যা আছে। ডাকাতদল যদি তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় তাহলে রামনারায়ণ আর গিরিসুন্দরীর আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ থাকবে না।

রামনারায়ণ জমিদারমশাইয়ের প্রস্তাবটা জানালেন। তারপর গিন্নিকে বললেন, 'আমাদের তেমন কিছুই তো নেই জমিদারবাড়িতে রেখে আসার মতো। ভাবছি একটা সড়কি চেয়ে নিই, কী বলো?'

হেসে ফেললেন গিরিসুন্দরী। বললেন, 'বাড়িতে ডাকাত পড়লে আপনি সড়কি চালাতে পারবেন তো?'

মৃদু হাসলেন রামনারায়ণ। তিনি শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ। জীবনে কখনও শস্ত্রধারণ করেননি। বাড়িতে ডাকাত পড়লে তিনি সড়কি চালিয়ে ডাকাত তাড়াবেন এ বড় কষ্টকর দুরকল্পনা। বললেন, 'তাও, হাতে থাকলে একটু মনে বল আসে, এই আর কী।'

গিরিসুন্দরী একটু ইতস্তত করে বললেন, 'তালকোঠরির বন্দ্যঘটীদের ছোট ছেলের ব্যাপারে কথা কিছু এগোল?'

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রামনারায়ণ, 'না গিন্নি। হরিসাধনমশাই

যা পণ হেঁকে বসেছেন তা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। ও আশা তুমি ছাড়ো। হরু নাপিত তো আছেই, আমি দেবানন্দ ঘটককেও কাজে লাগিয়েছি। দেখি আমার মায়ের ভাগ্যে কেমন পাত্র জোটে।'

গিরিসুন্দরী ম্লানমুখে বসে রইলেন। সেই দেখে কষ্ট পেলেন রামনারায়ণ। স্ত্রীর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'চিন্তা কোরো না। মা আমাদের সর্বগুণসম্পন্না, অতি সুলক্ষণা। মা কিরীটেশ্বরী নিশ্চয়ই কোনও সুপাত্র জুটিয়ে দেবেন।'

গিরিসুন্দরী বললেন, 'হ্যাঁ, সেই আশাতেই বসে থাকুন। পাত্র তো পুকুরপাড়ের হাঁস কী না, যে মেয়ে মাঠঘাট থেকে নিজেই ধরে আনবে।'

সশব্দে হেসে উঠলেন রামনারায়ণ। সর্বমঙ্গলা তখন ঘুমোচ্ছিল। একবার চটকা ভেঙে উঠে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

তারপর একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখতে শুরু করল সে। দেখল সে যেন গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে এক অন্ধকার পিণ্ডের মধ্যে। যেভাবে মায়ের পেটে বাচ্চারা থাকে, ঠিক সেভাবে। আর তাকে ঘিরে যতদূর চোখ যায়, দাউ দাউ করে জ্বলছে মস্ত বড় সব চিতার আগুন।

* * *

বেহারাদের হুম হুম না হুম হুম না ডাকে অল্প দুলতে দুলতে পালকিটা যাচ্ছিল তালকোঠরি থেকে চণ্ডীপুর। ছয়জন বেহারা পালকি বইছে আর তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জনা আষ্টেক মুশকো চেহারার লাঠিয়াল।

দুপুরের সূর্য এখন পশ্চিমমুখী। পাহারাদারদের সর্দার রঘু একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সবাই তাড়াতাড়ি পা চালা রে। ঈশান কোণে মেঘ জমেছে। লক্ষণ ভালো বুঝছি না। অন্ধকার হওয়ার আগেই বাঘার জঙ্গল আর মাঠ পেরোতে হবে। আর যদি কালবৈশাখী আসে তো কথাই নেই।'

রঘু সর্দার যা বলছে তা মিথ্যে নয়। জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিকে প্রায়ই ভয়ানক কালবৈশাখী ঝড় ওঠে। আর বাঘার জঙ্গলের ঘটনা শোনেনি এমন

লোকজন এই অঞ্চলে নেই বললেই চলে। সবাই মিলে একটু জোরে দৌড়তে লাগল।

একটু পর পালকির দরজায় একটি তরুণের মাথা উঁকি দিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে হাঁক দিল, 'রঘু।'

রঘু দৌড়ে এল, 'বলুন ছোটকত্তা।'

'চণ্ডীপুর আর কতক্ষণ?'

'আর প্রায় আড়াই ক্রোশ মতো ছোটকত্তা। বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছে যাওয়া উচিত। কেন, কিছু চাই?'

'পালকি থামাও। আমার জল তেষ্টা পেয়েছে। সঙ্গে আনা জল শেষ।'

রঘু প্রমাদ গনল। এই গ্রীষ্মের দুপুরে বার বার তেষ্টা পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ছোটকত্তা হলেন তালকোঠরি গ্রামের বন্দ্যঘটী বংশের কুলপ্রদীপ। ঘোর কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁর খাওয়াদাওয়া ছোঁয়াছুঁয়ির অনেক বাছবিচার মেনে চলতে হয়। এহেন ছোটকত্তার জলের ব্যবস্থা সে এখন করবে কোথা থেকে?

পালকি থামল। সেখান থেকে এক অনিন্দ্যসুন্দর তরুণ পা রাখল মাটিতে। বয়েস খুব বেশি হলে সতেরো-আঠেরো হবে। দোহারা ফর্সা চেহারা, একমাথা কোঁকড়ানো চুল। ফতুয়া ধুতি পরিহিত তরুণকে কন্দর্পকান্তি বললেও কম বলা হয়। তবে তার উপস্থিতির সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন অংশ হচ্ছে তার চোখদুটি। এমন টানাটানা উজ্জ্বল চোখ কমই দেখা যায়।

সে মাটিতে পা রেখেই একবার কোমর বেঁকিয়ে, লাফালাফি করে শরীরের জড়তা দূর করে নিল। তারপর বলল, 'তা আমরা কতদূর এলাম রঘু?'

রঘু ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'বাঘার জঙ্গল এল বলে ছোটকত্তা। বেলাবেলি এই মাঠ পেরিয়ে যেতে পারলেই সন্ধে নামার মুখে আমরা চণ্ডীপুর পৌঁছে যাব।'

'আর যদি বেলাবেলি না পেরোতে পারি?'

রঘু আঁতকে উঠল, 'ভুলেও ও কথা উচ্চারণ করবেন না ছোটকত্তা।

এই মাঠ আর ওই জঙ্গল বড় অলুক্ষুণে। আমাদের উচিত হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মাঠ পেরিয়ে যাওয়া। আপনি দয়া কয়ে পালকিতে চড়ে বসুন ছোটকত্তা। বেহারাদের পালকি ছোটাতে বলি।'

রঘুর এত সতর্কবাণী সত্ত্বেও কিন্তু দেখা গেল যে ছোটকত্তার তেমন হেলদোল নেই। সে খানিক এদিক ওদিক বেড়াল। আড়মোড়া ভাঙল। তারপর রঘুর কাছে ফিরে এসে বলল, 'জল দাও।'

রঘু আমতা আমতা করে বলল, 'কাছেপিঠে তো পুকুর বা দিঘি নাই ছোটকত্তা। একটু অপেক্ষা করে যান। চণ্ডীপুর ঢুকেই আপনাকে জল খাওয়াব। মিঠে জল, ক্যাওড়া আর কর্পূর দেওয়া।'

তরুণ হেসে বলল, 'অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না বাপু। তোমার ভিস্তিতে তো জল আছে? তাই দাও।'

রঘু শুনে শিউরে উঠল। জিভ কেটে বলল, 'অমন কথা বলবেন না কত্তা, শুনলেও পাপ হয়। আপনারা কুলীন ব্রাহ্মণ, আর আমরা হলাম গিয়ে নীচু জাত। আপনাকে জল খাইয়ে শেষে নরকবাসী হব নাকি?'

তরুণ সামান্য চোখ টিপে বলল, 'আর যদি জল না পেয়ে আমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে? বলি ব্রাহ্মণহত্যার জন্য রৌরবে কত বছর থাকতে হয় সেটা জানা আছে?'

রঘু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেহারাদের বলল, 'ওরে তোল তোল, পালকি তোল। ইশ, অনেক দেরি হয়ে গেল। সন্ধে নামার আগেই চণ্ডীপুর পৌঁছতে হবে।'

ততক্ষণে তরুণটি রঘুর ভিস্তি কেড়ে নিয়ে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে বলল, 'আহ, শান্তি। প্রাণটা জুড়োল।'

রঘু একেবারে হায় হায় করে উঠল, 'এ কী করলেন কত্তা? শেষে আমাকে নরকবাসী করলেন? বড়কত্তা জানলে আমাকে খড়মপেটা করবেন যে।'

তরুণ ভিস্তি ফেরত দিয়ে বলল, 'আরে জানলে তো করবেন। এই যে তোমরা, আমাকে কেউ রঘুর ভিস্তি থেকে আমাকে জল খেতে দেখেছ?'

বেহারা আর বাকি লাঠিয়ালরা সবাই ইতিউতি তাকাতে লাগল। কেউ আকাশের দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে কাক গুনতে লাগল। কেউ বা খুব মন দিয়ে মাটি ঘাঁটতে লাগল। একজন তো বেশ জোরে বলে উঠল, 'ছোটকত্তাকে দেখছি না যে? কত্তামশাই গেলেন কোথায়?'

তরুণটি মুচকি হেসে পালকিতে উঠে বলল, 'জলের আবার জাতধর্ম হয় নাকি রঘু? চলো চলো, পালকি ওঠাতে বলো। অনেক দূর যেতে হবে।'

পালকিবেহারারা আবার সেই হুম হুম না করতে করতে পালকি কাঁধে দৌড়তে লাগল। রঘু একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল ঈশান কোণের সেই মেঘ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে। সে মনে মনে একবার ঠাকুরকে স্মরণ করে দৌড়তে লাগল।

কিন্তু ঠাকুর বোধহয় তখন অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। রঘুর প্রার্থনা তাঁর কানে পৌঁছল না। কিছুদূর এগোতে না এগোতেই সেই মেঘের দল দ্রুত আকাশ ছেয়ে ফেলল। দ্রিমি দ্রিমি বজ্রহুঙ্কারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাঠের মাঝখানের জেগে উঠল ধুলোর ঘূর্ণিস্রোত। হু হু করে ধেয়ে এল ঠান্ডা হাওয়ার দল। মাঠের ধারে বাঘার জঙ্গল। সেখানে গাছেদের দল মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল পাগলের মতো। রঘু চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে তোরা পালকি জঙ্গলের দিকে নিয়ে চল। এই ফাঁকা মাঠে বাজ পড়লে আর রক্ষা নেই।'

* * *

প্রতাপনারায়ণের কাছারিবাড়িতে লোকে লোকারণ্য। সবাই এসেছে তাদের সোনার গয়না আর সঞ্চিত মোহর কাছারিবাড়িতে জমা রাখতে। একদিকে নায়েব রজনীকান্ত সরকার বসে সবকিছুর তদারকি করছেন। সঙ্গে খাজাঞ্চি রতনলাল ঘোষ। হরিহর সাহা হল গিয়ে আশপাশের চারটে গাঁ মিলিয়ে সবচেয়ে বড় সোনার কারবারি। সে নিজে এসেছে কষ্টিপাথর আর নিক্তি নিয়ে। গয়নাগাঁটি সব পরখ করে গুনে গেঁথে সে খাজাঞ্চি মশাইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে। আর নায়েবমশাই একটি তুলোট কাগজে

সেসব গয়নার বিবরণ, ওজন, পরিমাণ, সব লিখে জমিদারমশাইয়ের মোহর মেরে কাগজটি তুলে দিচ্ছেন গয়নার মালিকের হাতে।

দিগম্বর মুখুটি এসেছিলেন ছোট ছেলের হাত ধরে। তিনি গজেন হালুইকে দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী ব্যাপার গজেন। তুমি তো সর্বত্র বলে বেড়াও তোমার নাকি একেবারে হাঁড়ির হাল, বাড়িতে একবেলার বেশি রান্না হচ্ছে না? তাহলে আজ কী জমা দিতে এলে? হাঁড়িকড়াই নাকি হাতাখুন্তি?'

গজেন হালুই টুক করে সরে পড়লেন।

ওদিকে গৌরীচরণ বাচষ্পতি ভারী খাপ্পা হয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন হরিহরের সঙ্গে, 'ছেলের বিয়ে দেওয়ার সময় সময় বেয়াইমশাই গীতায় হাত রেখে বললেন পাকা সোনার মান্তাসা আর চন্দ্রমুখী হার দিয়েছেন, আর এখন তুমি বলছ সোনায় খাদ আছে? বললেই হল?'

হরিহর ঠান্ডা মাথায় বলল, 'পাকা সোনায় গহনা হয় না কত্তা, ওতে শুধু মোহর বানানো যায়। গহনা বানাতে গেলে পাকা সোনায় অন্তত এক আনা খাদ দিতেই হয়। আমি আপনার বেয়াইমশাইয়ের অসম্মান করছি না। তবে তিনি খুব একটা ভুল বোধহয় বলেননি। এক আনা খাদের গয়নার সোনাকে পাকা সোনা বললেও চলে।'

ওদিকে কালিপদ ভট্টাচার্য আর ভবানীপ্রসাদ সান্যালের মধ্যে ভারী গোল বেঁধে উঠেছে। দুইজনেই চণ্ডীপুরের স্বনামধন্য তার্কিক। আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচল, অমাবস্যা-দ্বাদশীতে কুষ্মাণ্ডভক্ষণ, একাদশীতে বালবিধবার অবশ্যকরণীয় কর্তব্য, সতীদাহের পুণ্য, এসব বিষয়ে দুজনেই মস্ত জ্ঞান রাখেন। কালিপদ এনেছেন তাঁর মৃতা মাতৃদেবীর হাতের হাতের সোনার কাঁকন, ভবানীপ্রসাদ এনেছেন তাঁর স্বর্গতা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর সাতনরী হার। এই দুই ভদ্রমহোদয়াই তাঁদের স্বামীদের দেহাবসানের পর সহমৃতা হয়েছিলেন। আপাতত নবাবের অন্নে প্রতিপালিত দুই ব্রাহ্মণ ব্যস্ত কালী বড় না কৃষ্ণ বড়, এই কুতর্কে।

কাজ শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে এল। একে একে অতিথি অভ্যাগতরা বিদেয় হলেন। নায়েব আর খাজাঞ্চিমশাই সমস্ত গহনা মোহর

ইত্যাদি অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। ওখানে একটি বিশেষভাবে সুরক্ষিত গুপ্তকক্ষ প্রস্তুত করা হয়েছে এসব ধনসম্পদ গচ্ছিত রাখার জন্য।

একে একে প্রায় পঞ্চাশ জন ঢাল তলোয়ারধারী মল্লবীর এসে প্রতাপনারায়ণকে প্রণাম করে দাঁড়াল। এরা পশ্চিমদেশের জঙ্গলের যুদ্ধব্যবসায়ী অধিবাসী। এরা যেমন শূরবীর, তেমনই নৃশংস। একমাত্র প্রভুর আদেশ ছাড়া কারও কথা শোনে না। প্রতাপনারায়ণ বহু অর্থব্যয়ে এদের নিয়োগ করেছেন।

কালু ডোম বলল, 'কত্তা, আদেশ দিন। এদের কাছারিবাড়ি পাহারার কাজে লাগাই?'

প্রতাপনারায়ণ মুখ থেকে হুঁকো নামিয়ে বললেন, 'লাগিয়ে দে। বাড়ির সব দরজা, সিংহদুয়ার, পাছদুয়ার, খিড়কি সব জায়গায় এদের মোতায়েন কর। আর বাড়িতে যারা যাতায়াত করেন, নায়েবমশাই, খাজাঞ্চিমশাই, ঠাকুরমশাই, সব্বার সঙ্গে মুখচেনা করিয়ে দে, যাতে এঁদের কাছারিতে ঢুকতে কোনও অসুবিধা না হয়। ও, হ্যাঁ, তালকোঠরি থেকে হরিসাধন বন্দ্যঘটীর ছোট ছেলে শশিশেখর আসছে। দুদিন থাকবে আমার কাছে। তার অভ্যর্থনার যেন কোনও ত্রুটি না হয়, দেখিস।'

'যে আজ্ঞা কত্তামশাই,' প্রণাম করে কালু বিদায় নিল।

কাছারিবাড়ির একটু দূরে বটগাছের নীচে উড়নি দিয়ে মুখ ঢেকে একটা লোক বসেছিল। সবাই চলে যাওয়ার পর সে একটু দ্রুত পা চালাল। আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টি নামল বলে।

* * *

কড়কড়াৎ শব্দে পৃথিবী কাঁপিয়ে বাজ পড়ল একটা। পালকির মধ্যে বসে থাকা শশিশেখর কেঁপে উঠল সেই প্রলয়ঙ্করী শব্দে। এদিকে তখন মুষলধারে শিলাবৃষ্টি নেমেছে। আর সেই সঙ্গে তুমুল ঝোড়ো হাওয়া। মনে হচ্ছে স্বয়ং ভোলা মহেশ্বর যেন ত্রিশূল হাতে এই পৃথিবী সংহারে উদ্যত হয়েছেন।

পালকি বেহারা আর লাঠিয়ালের দল জলে ভিজে একেবারে জবুথবু।

চারিদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। এরই মধ্যে কোনওমতে জঙ্গলের ঠিক বাইরে একটা বিশাল বড় বটগাছের নীচে পালকি নামিয়েছে তারা, আর এই ঠান্ডা ধারাস্রোতে ঠকঠক করে কাঁপছে। আর প্রার্থনা করছে, 'হেই মহাদেব, হেই শিবশম্ভু, এই শিল যেন আমাদের মাথায় না পড়ে।' এক-একটা শিল প্রায় ছোটখাটো পাথরের সমান। বটগাছের ঘন ডালপালায় আটকে তারা এদের মাথায় পৌঁছতে পারছে না বটে। তবে ভয়ে একেবারে কাবু করে দিয়েছে। এর ওপর তাদের সঙ্গে আনা মশালও ভিজে একসা, জ্বালানোর উপায়ই নেই।

একটু পর রঘু পালকির দরজার কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'ছোটকত্তা, একটা কথা আছে।'

শশিশেখর পালকির মধ্যেই প্রায় আধভেজা ভিজে গেছিল। এই শীতল ঝোড়ো বাতাস তার অঙ্গে ঘোর কাঁপন ধরাচ্ছিল। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল 'কী হয়েছে রঘু?'

'জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। কারা যেন এদিকেই আসছে।'

শশিশেখর কথাটা শুনল বটে, কিন্তু বুঝল না। এই প্রবল বৃষ্টিতে মশাল জ্বলার কথাই নয়। আর এত বৃষ্টি মাথায় করে আসছে কারা?

বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। একটু পরে একদল ডাকাত মশালহাতে ঘিরে দাঁড়াল ছোট্ট দলটিকে। প্রত্যেকের হাতে ধারালো খড়্গ। তাদের পাথুরে লাল চোখ, শীতল দৃষ্টি, আর ঝাঁকড়া চুল দেখে ভয়ে বুক উড়ে গেল রঘুর সে বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তোমরা? কী চাও?'

ডাকাতদের দলপতি গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'পালকি তোল। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। সর্দার ডেকেছেন।'

* * *

ডাকাতের দল ঘন জঙ্গলের মধ্যে যেখানে পৌঁছল সেটি একটি ফাঁকা জায়গা। বোঝা যায় যে অনেক পরিশ্রমে জায়গাটি মানুষের বাসযোগ্য

করে তোলা হয়েছে। পুরো স্থানটির ওপর গাছের ঝাঁকড়া মাথারা মিলে চাঁদোয়ার মতো করে রেখেছে। তার নীচে ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি কুটির। একটি কুটির অপেক্ষাকৃত বড়। তার পেছনে একটি বিশাল বটগাছ।

কুটিরের সামনে একজন দীর্ঘদেহী মানুষ রক্তাম্বর পরে নরকপাল থেকে অল্প অল্প করে কারণবারি পান করছিল।

পালকি এসে সেই মানুষটির সামনে থামতেই শশিশেখর বেরিয়ে এল। আর চারিদিকে চেয়ে বুঝল অবস্থা খুব একটা সুবিধের নয়। তাদের কপালে বিস্তর দুঃখ আছে।

পুরো জায়গাটি বড় বড় মশালের আলোয় আলোকিত। বৃষ্টির জল মশালের আলোর ওপর পড়ে ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ করছে। কিন্তু মশালগুলি নিভে যাচ্ছে না। দলে আরও অনেক ডাকাত আছে, তারা বিভিন্ন কাজে কাজে ব্যস্ত। কেউ খড়্গে শান দিচ্ছে। কেউ রান্নার আয়োজন করছে। কেউ বল্লমের ধার পরীক্ষা করছে।

লোকটি কারণবারির পাত্রটা নামিয়ে বলল, 'আসতে আজ্ঞা হোক। বসতে আজ্ঞা হোক। ওরে কে আছিস, ছোট কত্তাকে পাদ্যঅর্ঘ্যটা একটু এগিয়ে দে।'

ডাকাতের দল যন্ত্রের মতো হেসে উঠল এই কথা শুনে। শশিশেখর কিন্তু ঘাবড়ালও না, উত্তেজিতও হল না। ঠান্ডা মাথায় বলল, 'কে আপনারা? এখানে আমাদের ধরে এনেছেন কেন?'

সর্দার হো হো করে হেসে উঠল, 'কেন ধরে এনেছি? ওরে তোরা কথা শোন। ছোটকত্তা জিজ্ঞেস করছেন ওঁকে আমি কেন ধরে এনেছি।'

ডাকাতের দল আবার হেসে উঠল। কেন জানি না শশিশেখরের কানে হাসির রোল খট করে বাজল। মনে হল হাসিটা ঠিক স্বাভাবিক নয়।

'বলি তোমার পিতাঠাকুর তো কম অর্থসম্পত্তি জমাননি। সবই যদি তিনি ভোগ করবেন, তাহলে আমাদের মতো গরিবরা যায় কোথায় বলো দেখি ছোটকত্তা?'

শশিশেখর কিছু বলল না।

'আপাতত আমাদের এখানে থাকো কয়েকদিন। তোমার পিতাঠাকুরকে

সংবাদ দিই। দেখি তিনি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের জন্য কতটা ব্যয় করতে সম্মত হন।'

শশিশেখর বলল, 'আপনি আমাকে, আমার পিতাঠাকুরকে চেনেন? আমি আজকে এখন এই পথ দিয়ে যাব জানলেন কী করে? আর আপনাকে কে বলল যে আপনি চাইলেই পিতাঠাকুর আপনাকে অর্থ দেবেন?'

'হা হা হা। আমি কী করে জানলাম সে প্রশ্ন থাক। আর তুমি কী ভাব, তোমার পিতাঠাকুর যে তোমাকে বাঁচাবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতে পারেন, সে আমি জানি না?'

'তাই? কী করে জানলেন শুনি? গুপ্তচর লাগিয়েছেন?'

'সে গুপ্তচর আমার আছে বটে। তবে গুপ্তচরের থেকেও ভালো কাজ কীসে হয় দেখবে? এই দেখো।'

এই বলে সর্দার একটি বড় কাঁসার থালা সামনে রেখে সেটি কারণবারিতে কানায় কানায় পূর্ণ করল। তারপর ডান হাতের তর্জনী আর কনিষ্ঠা তাতে ডুবিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত পর শশিশেখর বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল ধীরে ধীরে সেই জলের ওপর ছবি ফুটছে। ওই তো, ওই তো তার পিতা, দাওয়ায় বসে কার সঙ্গে যেন আলোচনা করছেন। একটু পরে মা'কে দেখা গেল, তিনি মুংলী গাইকে জাবনা দিতে গোহালে ঢুকলেন। ধীরে ধীরে সে ছবি অস্পষ্ট হয়ে গেল। এবার অন্য ছবি। তাদের গ্রামের পথঘাট, আমবাগান, গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া শীর্ণকায় নদীটি। নদীর ওপরে মেঘ জমেছে। ঝড় এল বলে।

শশিশেখরের গরম লাগতে লাগল। কাঁপা কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'এ কী? এখানে আমার বাড়ি ঘরের চিত্র ফুটে উঠছে কী করে?'

পাশ থেকে একটি ডাকাত কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'আমাদের প্রভু মহাসিদ্ধ ভৈরবসাধক, জানেন না হেন বিদ্যে নেই। মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হতে পারেন, শরীর পাহাড়ের মতো ভারী আবার পালকের মতো হাল্কা করে ফেলতে পারেন, জলের নীচে বেঁচে থাকতে পারেন, ইচ্ছেমতো ঝড়বৃষ্টি আনতে পারেন। এসব তো ওঁর বাঁ হাতের খেলা।'

শশিশেখর লক্ষ্য করল ডাকাতটির স্বর কেমন যেন যান্ত্রিক ধরনের। চোখের মণিগুলোও নিষ্প্রাণ, পুতুলের যেমন হয়। কিন্তু কথাবার্তায়, বলার ভঙ্গিতে একটা উগ্র হিংস্র ক্ষুধার ভাব ফুটে বেরোচ্ছে। যেন এতগুলো মানুষকে দেখে তার হাত নিশপিশ করছে ছিঁড়ে ফেলার জন্য।

এবার সে বাকিদের দিকে তাকাল। সবারই মুখচোখের একই রকমের ভাব। চোখ নিষ্প্রাণ, বসার ভঙ্গিমা যান্ত্রিক। কিন্তু সারা দেহে খেলে বেড়াচ্ছে বন্য উন্মাদনা। যেন কোনও অদৃশ্য বন্ধন তাদের সবলে বেঁধে রেখেছে, সেই বাঁধন সরে গেলেই হিংস্র তীক্ষ্ণ শ্বদন্ত নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ওপর।

মাথা ঠান্ডা করল শশিশেখর, এখন তার ভয় পেলে চলবে না। সে জিজ্ঞেস করল, 'আর আমার পিতা যদি অর্থ দিয়ে দেন, তাহলে আমাদের ছেড়ে দেবেন তো?'

হা হা করে হেসে উঠল সর্দার আর তার দলবল। উদ্দাম কালবৈশাখী ঝড়ের শোঁ শোঁ আওয়াজ পেরিয়ে সেই হাসির শব্দ শুনে শিউরে উঠল বাঘার বন। যেন কোনও এক ভয়ের করালগ্রাস নেমে আসতে লাগল এই চত্বরটি জুড়ে।

হাসি থামলে উঠে দাঁড়াল সর্দার। তারপর বলল, 'ছেড়ে তো দেবই। তোরা তো মুক্তি চাস, সেই মুক্তির ব্যবস্থাই করে দেব তোদের।'

কথাটা শুনে রঘু আর তার ছোট কত্তা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। রঘু করজোড়ে বলল, 'কোন মুক্তির কথা বলছেন সর্দার?'

সর্দার একটা মশাল তুলে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল বটগাছের অন্ধকার গোড়ার দিকে। জায়গাটি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। শশিশেখর আর বাকিরা দেখল সেখানে বেদির ওপর একটি তিন হাত উচ্চতার প্রস্তরনির্মিত দেবমূর্তি। দেবমূর্তির আকৃতি কোনও কুমার বা বালকের। দেবমূর্তি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, সর্পাবরণে ভূষিত এবং মুখমণ্ডল মহাক্রোধে উদ্ভাসিত। ডানহাতে একটি নরকপাল, দেবমূর্তির চোখ সেই কপালে নিবদ্ধ। বামহাতে একটি মূষিক গোত্রের প্রাণী। দেবমূর্তির পায়ের কাছে

একটি হাড়িকাঠ। আর তার পাশেই রাখা আছে একটি ভয়ঙ্করদর্শন বিশালাকৃতির খড়্গ।

শশিশেখর ভয়ার্তস্বরে বলল, 'আপনি আমাদের বলি দেবেন? আপনি কি কাপালিক?'

সর্দার ব্যঙ্গের স্বরে বলল, 'এই তো ঠিকঠাক ধরতে পেরেছ দেখছি। আপাতত তোমরা আমার অতিথি। বিশ্রাম করো। খাও দাও। আর কয়েকদিন পর কৌশিকী অমাবস্যা। সেদিন তোমাদের চিরমুক্তির ব্যবস্থা করছি।'

চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল সর্দার, 'আর হ্যাঁ, ভুলেও কিন্তু পালাবার চেষ্টা কোরো না। ওই ওদের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওরা কিন্তু না বললেও সব বুঝতে পারে, অন্ধকারেও সব দেখতে পায়, আর ওদের হাতের মশাল কিছুতেই নেভে না। আমার আদেশ ভিন্ন এই জঙ্গল থেকে বেরোবার কারও ক্ষমতা নেই। আর তোমরা যদি সেই আদেশ অমান্য করো, তাহলে কিন্তু ওরা তোমাদের জ্যান্ত ছিঁড়ে খাবে। মনে থাকে যেন।'

রঘু চারিদিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কারা সর্দার?'

'আজ অবধি আমি যাদের বলি দিয়েছি, ওরা তারাই।'

* * *

রাতের দিকে প্রতাপনারায়ণ খেয়ে দেয়ে শুতে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় গৃহভৃত্য কানাই এসে সংবাদ দিল, 'কত্তামশাই, আপনার সঙ্গে কারা যেন দেখা করতে এয়েছে।'

প্রতাপনারায়ণ ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, 'কে? শশিশেখর? সে এসে পৌঁছতে পেরেছে তাহলে? আমি তো ভাবলাম এই ঝড়জল দেখে রাত্রে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে বোধহয়।'

কানাই বলল, 'আজ্ঞে না কত্তামশাই, একজন সাধু আর একজন ব্রাহ্মণ এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

প্রতাপনারায়ণ বিস্মিত হলেন। সাধু আর ব্রাহ্মণ? এত রাতে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কালু জানে?'

'আজ্ঞে জানে বই কি। সেই তো সদর দেউড়িতে আটকাল। এখন তো পাহারাদারেদের চোখ এড়িয়ে মাছিটি গলবার উপায় নেই কী না। কালুই বলল আপনাকে খবর দিতে।'

প্রতাপনারায়ণ পালঙ্ক থেকে নেমে এলেন। গায়ে ফতুয়া গলিয়ে হরিণের চামড়ার চটি পায়ে দিয়ে বাইরে এসে দেখলেন দুইজন্য মধ্যবয়সী অতিথি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে সন্ন্যাসীটির গায়ে গৈরিকবাস, খালি পা, সারা মুখভরতি দাড়ি গোঁফ আর মাথায় একটি মস্ত জটা কুণ্ডলী করে রাখা। অন্যজন গলায় পৈতে ঝোলানো সাধারণ ব্রাহ্মণ। তাঁর মাথায় মস্ত শিখি, পরনে উড়নি আর ধুতি, ক্ষৌরি করা মুখ আর চোখ দু'খানি ভারী জ্বলজ্বলে।

অতিথি দুজন নমস্কার করলেন। প্রতাপনারায়ণ প্রতিনমস্কার করে বললেন, 'বলুন, অতিথিদেব, আপনাদের কী সেবা করতে পারি।'

ব্রাহ্মণটি শান্তস্বরে বললেন, 'গৃহস্থের কল্যাণ হোক। আমরা দুই বন্ধু এই ঝড়ের রাতে পথ ভুল করে এই গ্রামে এসে পড়েছি। এক রাতের জন্য আশ্রয় পাওয়া যাবে?'

প্রতাপনারায়ণ শশব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সে তো বটেই, সে তো বটেই। ব্রাহ্মণ আর সন্ন্যাসী আমার দরজায় এসেছেন সে তো আমার সৌভাগ্য। ওরে কানাই, নিতাই, তোরা দৌড়ে আয়। এঁদের কুয়োতলায় নিয়ে যা, গামছা, আর নতুন কাপড় বার করে দে। আপনারা হাত পা ধুয়ে আসুন, আপনাদের নৈশাহারের আয়োজন করছি।'

একটু পর নতুন অতিথিরা দাওয়াতে এসে বসলেন। সন্ন্যাসীর অঙ্গে তাঁর গৈরিক বসন, তিনি এ ছাড়া অন্য পোশাক অঙ্গে ধারণ করেন না। তবে অন্যজন প্রতাপনারায়ণের দেওয়া নতুন ধুতি, নতুন ফতুয়া পরেছেন।

প্রতাপনারায়ণ হাত জোড় করে বললেন, 'আপনাদের পরিচয়...'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমাদের নিবাস নবদ্বীপে। আমার নাম কৃষ্ণানন্দ মৈত্র। অধ্যাপনা আর পৌরোহিত্যে করে গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করি। আর

দিন কাটে মা জগদম্বিকার নাম করে। আর ইনি হলেন আমার বিশিষ্ট মিত্র, শ্রী জটাধারী পরমহংস। লোকমুখে অবশ্য ইনি অন্য নামে প্রসিদ্ধ, জাটিয়া জাদু। আমরা এদিকে এক জায়গায় মাতৃআরাধনায় যোগ দিতে এসেছিলাম। ফিরে যাওয়ার সময় দেখি এই তুমুল বিপর্যয়। তাই এখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি।'

প্রতাপনারায়ণ ভারী প্রীত হলেন। বললেন, 'আহা, আপনাদের পদরজে আমার ভবন ধন্য হল। জানি না আপনারা জানেন কি না, আমাদের বাড়িতে মা কিরীটেশ্বরী গৃহদেবী রূপে পূজিতা হন। আজ বিশ্রাম করুন, কাল মায়ের দর্শন আর ভোগপ্রসাদের ব্যবস্থা করব।'

কৃষ্ণানন্দ দু'হাত মাথায় ঠেকালেন, 'জয় মা কিরীটেশ্বরী। সবার মঙ্গল করো মা।'

প্রতাপনারায়ণ দুটি হুঁকোর নল অতিথিদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'সেবা করতে ইচ্ছে হোক। এই গড়গড়া দুটি ব্রাহ্মণদের জন্যই নির্দিষ্ট, অন্য জাতের লোক মুখ দেয় না।'

সন্ন্যাসীটি গড়গড়ার নল মুখে নিয়ে বললেন, 'দিলেই বা কী? আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। আমার অত ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক নেই।'

ব্রাহ্মণ সহাস্যে বললেন, 'মিছে কথা বোলো না জাটিয়া। ওই সন্ন্যাসীর বেশ তোমার ভেক। নইলে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আবার হুঁকোর অভ্যেস হল কী করে?'

সন্ন্যাসী হুঁকোয় একটা টান দিয়ে বললেন, 'দেখো আমার কাছে সবই সমান। বিষ্ঠাও যা অমৃতও তাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে ভেদ নাই। তাই মা যখন যা জুটিয়ে দেন, তাকেই প্রসাদ বলে মনে করি।'

কৃষ্ণানন্দ গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে বললেন, 'তা ভালো। তা জমিদারমশাইয়ের অনেক নাম শুনেছি। মশাইয়ের নাকি দেবদ্বিজে, শাস্ত্রালোচনায়, পঠন-অধ্যাপনায় ভারী উৎসাহ। শুনে ভারী ভালো লাগল।'

প্রতাপনারায়ণ সামান্য লজ্জিত হয়ে বললেন, 'ও তেমন কিছু নয়। মানুষের অর্জিত সম্পদ মানুষের যতটা কাজে লাগানো যায় আর কী।'

'তা বেশ। তবে আপনার জমিদারবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ কিন্তু বড়ই কড়া। যেসব প্রহরীদের রেখেছেন তারা ভারী সতর্ক।'

'তার কারণ আছে মৈত্রমশাই। এমনি এমনি এত পাহারা চৌকি বসাতে হয়নি।'

কৃষ্ণানন্দ কৌতূহলী হলেন, 'বটে? কীরকম শুনি?'

প্রতাপনারায়ণ সব কথা খুলে বললেন। শুনে দুজনেই অনেকক্ষণ ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'কাজটা ঠিক করলেন না ভুল সেটা বুঝতে পারছি না। যাই হোক। আশা করি এই উপদ্রব বেশিদিন আপনাদের বিব্রত করবে না।'

বলতে বলতেই দেউড়ির বাইরে থেকে একটা শোরগোল শোনা গেল। ধর ধর বলতে বলতে কারা যেন খিড়কির দিকে ছুটে গেল। প্রতাপনারায়ণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। আমি একবার দেখে আসি।'

প্রতাপনারায়ণ বারান্দা থেকে নামার উদ্যোগ করতেই কালু ডোম ছুটে এল। প্রতাপনারায়ণ প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার রে কালু?'

কালু উত্তেজিতভাবে বলল, 'কে যেন দরজার সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। দরওয়ান ধাওয়া করতেই খিড়কি দরজার দিকে পালিয়ে গেল।'

প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'বটে? চল তো দেখি এত বড় সাহস হয়েছে।'

কৃষ্ণানন্দ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'দাঁড়ান জমিদারমশাই। যাবেন না।'

প্রতাপনারায়ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কেন?'

কৃষ্ণানন্দ কিছু না বলে আকাশের দিকে তর্জনীনির্দেশ করলেন।

ঝড়জলের পর আকাশ তখন পরিষ্কার হয়ে এসেছে। একটি দুটি করে তারা ফুটছে আকাশে। তারই মধ্যে প্রতাপনারায়ণ সবিস্ময়ে দেখলেন একটা বিশাল ছায়া তাঁর বাড়ির খিড়কি দুয়ারের ওপর ঝুলে আছে। শুধু ঝুলে আছে তা নয়, সেই ছায়া শুধু ছটফট করছে আর তার মুহুর্মুহু তার আকার বদলে বদলে যাচ্ছে। সেই ছটফটানি দেখে মনে হচ্ছে যেন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সেই ছায়াশরীর, কিন্তু কোনও এক অদৃশ্য বাঁধন তাকে মুক্তি দিচ্ছে না।

প্রতাপনারায়ণ সভয়ে বললেন, 'কী ওটা?'

কৃষ্ণানন্দ আড়চোখে দেখলেন জাটিয়া জাদু ধ্যানস্থ। তাঁর ডানহাতে হুঁকোর গড়গড়া যেমন ছিল তেমন আছে। বসার ভঙ্গিতেও কোনও পরিবর্তন হয়নি। শুধু তাঁর চোখদুটি বন্ধ।

একটু পর সেই ছায়াশরীর কোনওক্রমে বাঁধন ছিঁড়ে পালাতে সক্ষম হল। আর সেই সঙ্গে একটা অশরীরী আর্তনাদের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বচরাচরে।

জাটিয়া জাদু ধ্যান ভেঙে বললেন, 'আমি আর কৃষ্ণানন্দ একবার আপনার বাড়ির চৌহদ্দি পরীক্ষা করতে চাই জমিদারমশাই। ব্যবস্থা করুন।'

একটু পর কালু ডোম আর জনা ছয়েক পাইক মশাল আর সড়কিহাতে উপস্থিত হল। তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রতাপনারায়ণ, কৃষ্ণানন্দ আর জাটিয়া জাদু জমিদারবাড়ির চৌহদ্দি প্রদক্ষিণ করতে করতে খিড়কির কাছে এসে স্থির হলেন। জাটিয়া মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'কী ওটা?'

সবাই দেখলেন মাটিতে চারটি পায়ের ছাপ। দেখে মনে হয় যেন কোনও পাখি বা ইঁদুরের পা। কিন্তু সে ছাপ এতই বড়, এতই অতিকায় যে উপস্থিত সকলে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একটু পর প্রতাপনারায়ণ কাঁপা কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কী হচ্ছে মৈত্রমশাই? এ কার পায়ের ছাপ? আকাশে ও কার ছায়া?'

মৈত্রমশাই গম্ভীরমুখে বললেন, 'ব্যাপারটা খুব একটা সুবিধার ঠেকছে না জমিদারমশাই। আপনি এক কাজ করুন, বাড়িতে গঙ্গাজল আছে? তাহলে এক ঘটি গঙ্গাজল আর মায়ের পায়ের বেলপাতা আমাকে দিয়ে যান।'

একজন পাইক দৌড়ে গিয়ে গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে এল। অত রাতে কিরীটেশ্বরীর মন্দির খুলে মায়ের পায়ের বেলপাতা নিয়ে এলেন প্রতাপনারায়ণ স্বয়ং। কৃষ্ণানন্দ আর জাটিয়া জাদু বেলপাতা দিয়ে সেই জল মন্ত্র পড়ে বাড়ির চারিদিকে ছিটিয়ে দিলেন।

সব কাজ শেষ করে সবাই যখন দাওয়ায় এসে বসলেন, তখন প্রায়

মধ্যরাত। প্রতাপনারায়ণ হাত জোড় করে বললেন, 'এসব কী হচ্ছে মৈত্রমশাই। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কৃষ্ণানন্দ বললেন, 'আপনার বাড়ির ওপর কোনও অতিজাগতিক অশরীরী ছায়া পড়েছে জমিদার মশাই। খুব সাবধানে থাকতে হবে। আজ রাতের চিন্তা নেই, একটা বাঁধন কেটে দিয়েছি। কিন্তু মনে হচ্ছে একটা দুর্দৈব আসন্ন। সাবধানে থাকবেন।'

প্রতাপনারায়ণ হাত জোড় করে বললেন, 'কী যে করব কিছু মাথায় আসছে না। অনুরোধ করি কয়েকটা দিন আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করুন। এই সঙ্কট কেটে গেলে...'

জাটিয়া জাদু মাথা নেড়ে বললেন, 'সে হওয়ার উপায় নেই জমিদারমশাই। আমি গৃহত্যাগী। পরপর দু'রাত গৃহস্থের ছাদের তলায় কাটানোয় গুরুর নিষেধ আছে।'

কৃষ্ণানন্দ বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি না হয় মায়ের মন্দিরের চাতালে রাত কাটিও জাটিয়া। চাতালের ওপর ছাউনি আছে। রাতে শুতে অসুবিধা হবে না। মায়ের মন্দিরে রাত কাটাতে তো আর তোমার গুরুর নিষেধ নেই।'

জাটিয়া জাদু চোখ পাকিয়ে বললেন, 'তোমার যে বড় থাকবার শখ দেখছি।'

কৃষ্ণানন্দ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এ বাড়ির ওপর একটা ঝড় আসতে চলেছে জাটিয়া, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আজ যে অশরীরী ছায়া দেখলে, সে সামান্য কোনও জিনিস না। অষ্টসিদ্ধির সবক'টি সিদ্ধি আয়ত্তে না এলে কারও পক্ষে ও জিনিস প্রক্ষেপ করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটার আশঙ্কা করছি আমি। আর যিনি আমাদের রাতের আশ্রয় দিয়েছেন, এই দুর্দিনে তাঁকে বিপদের মুখে ফেলে চলে যাওয়ার শিক্ষা আমার গুরু আমাকে দেননি।'

জাটিয়া জাদু বললেন, 'অগত্যা আর কী। আমার শোয়ার ব্যবস্থা তাহলে মন্দির চাতালেই করুন জমিদার মশাই।'

* * *

জঙ্গলের নির্জন রাত। মশালগুলি প্রায় নিভু নিভু হয়ে এসেছে। পরিষ্কার আকাশে দ্বাদশীর বাঁকা চাঁদ, আর তাকে ঘিরে তারাদের দল।

আরাধ্য ইষ্টদেবতার পদতলে বসেছিল সর্দার। তার মুখখানি যন্ত্রণায় বেঁকে আছে। চেহারা পোশাক অবিন্যস্ত। মনে হচ্ছে যেন একটা বড় লড়াই থেকে কোনওমতে উদ্ধার পেয়ে ফিরে এসেছে সে।

কী হয়ে গেল মাথায় ঢুকছিল না তার। এতদিনের সাধনা, অর্জিত ক্ষমতা, এক লহমায় ব্যর্থ হয়ে গেল? কী করেনি সে এই সিদ্ধিলাভের জন্য? সংসারত্যাগ করেছে, গুরুর পায়ের কাছে বসে অঘোরী সাধনা করেছে। শবচালনা শিখেছে, আয়ত্ত করেছে দুরূহতম সাধনসিদ্ধি, সুসম্পন্ন করেছে যাবতীয় ভূতাদিযজ্ঞ। নরবলির রক্তে তুষ্ট করেছে ইষ্টদেবকে। তৈরি করেছে মৃতদের পিশাচ সেনানী। তার তুল্য শক্তিশালী তন্ত্রবিদ কে আছে আর এই সংসারে?

তাও আজ তার ছায়াশরীর জড়িয়ে ধরল কে? তার থেকেও বড় সাধক আছে তাহলে? কে সে? সে এমন অমিত শক্তির অধিকারী হল কী করে?

চারিদিকের কুটিরগুলি বন্ধ। সর্দার জানে আজ যাদের ধরে আনা হয়েছে তারা ঘুমিয়ে আছে অঘোরে। তাদের খাবারে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে একধরনের বিশেষ ভেষজ বিষ। বিষের মাত্রা নির্দিষ্ট, কাল ভোর অবধি টানা ঘুমোবে তারা।

আর তার দলের সদস্যরা? তারা বিছানায় শুয়ে আছে মৃতদের মতো। একটিমাত্র, তার একটিমাত্র মন্ত্রোচ্চারণে জেগে উঠবে সেই অশরীরী পিশাচের দল, আর তার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে যান্ত্রিকস্বরে বলবে, 'বলুন সর্দার, কী আদেশ।'

ফের যন্ত্রণা ছটফটিয়ে উঠল সর্দার। এই নশ্বর শরীরের ব্যথা বেদনা তো সে জয় করেছিল আগেই। আজ তাহলে তার শরীরে এই বিষব্যথা এল কেমন করে?

একটু পরে দুটি হাত বিশেষ মুদ্রায় সংহত করল সে। গুরু শিখিয়েছিলেন এই বিশেষ বিষমুদ্রা। এতে শরীরের ব্যথা বেদনার উপশম হয়।

খানিকপর একটি পিতলের থালা নিয়ে সামনে বসল সে। কারণবারিতে সে থালা কানায় কানায় পূর্ণ করল। এই মায়াদর্পণে ইচ্ছেমতো কোনও জায়গার দৃশ্য দেখা যায় বটে, কিন্তু তার একটি সীমাবদ্ধতা আছে। যেখানে মানুষজন, জীবজন্তু, বা প্রাণের সাড়া আছে এমন দৃশ্যগুলিই দেখা যায়। গোপন, নির্জন, জনহীন স্থানের ছবি ফুটে ওঠে না। কিন্তু এই অঞ্চলের যাবতীয় সোনা এখন নির্জন গুপ্তকুঠুরিতে বদ্ধ। সেখানে তার মায়াদর্পণের দৃষ্টি পৌঁছবে না।।

তাই তাকে নিজে যেতে হয়েছিল জমিদারবাড়িতে, ছায়াশরীর নিয়ে।

খবরটা এনেছিল ভীম। চণ্ডীপুরের জমিদার যে ঢেঁড়া পিটিয়ে এলাকার সব অলঙ্কার নিজের কাছারিবাড়িতে জমা রাখতে বলেছে সে খবরটা তার কানে আগেই এসেছিল। মনে মনে হেসেছিল সে। মূর্খ, নেহাত মূর্খ না হলে কেউ এই কাজ করে না। আসলে জমিদারমশাই বোধহয় ভেবেছেন এসব সাধারণ চোর ডাকাত বা ঠগীদের কাজ। আসল কারণটা যদি তিনি জানতেন, তাহলে এই দুঃসাহস করতেন না। তবে জমিদারমশাই নিজের অজান্তেই সর্দারের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। তাকে আর তার পিশাচদলকে সোনাদানার খোঁজে এদিকওদিক ঘুরে বেড়াতে হবে না।

সামান্য ঘুরে নিজের ইষ্টদেবের দিকে তাকাল সর্দার। আর কয়েক তোলা। আর মাত্র কয়েক তোলা সোনা পেলেই নিজের ইষ্টদেবের সোনার মূর্তি গড়তে পারবে সে। আর তারপর?

হাসি ফুটে উঠল সর্দারের মুখে। ইষ্টদেব সন্তুষ্ট হলে এই ধরাতলের সমস্ত ধনসম্পদ তার হাতের মুঠোয়। বাদশাহ আকবর স্বয়ং তার পাদবন্দনা করবেন। ক্ষমতা, অর্থ, প্রতাপ, সুখ, সমস্তকিছুই অনায়াসে তার করায়ত্ত হবে। এই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হবে সে।

আর সেই জন্যই তো মহাচীন থেকে এই দুরূহবিদ্যার পাঠ নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে সে।

আস্তে আস্তে সেই কারণবারিতে তর্জনী আর কনিষ্ঠা ডোবাল সে। অস্ফুটে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করল। ক্রমে সেই অদ্ভুত মন্ত্রের শব্দ মিশে যেতে

লাগল রাত্রির গাঢ় অমানিশার সঙ্গে। একটু পর স্থির কারণবারিতে ফুটে উঠতে লাগল ছবি। বিভিন্ন সব ছবি।

কিন্তু এ কী! ছবিগুলো স্থির হচ্ছে না কেন? কেন কাঁপতে কাঁপতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কেন? তার হাত কাঁপছে নাকি? নিজের হাতের দিকে তাকাল সর্দার। কই, না তো। তার তার আঙুল তো স্থিরই আছে। তাহলে ছবিগুলো ফুটতে ফুটতে আবার নিস্তরঙ্গ কারণবারিতে মিশে যাচ্ছে কেন?

অনেকবার চেষ্টা করল সর্দার। কিন্তু কিছুতেই তার প্রয়োগবিদ্যা স্থির হল না। শতেক চেষ্টাতেও সে চণ্ডীপুরের জমিদারবাড়ির আশপাশের চিত্র ফুটিয়ে উঠতে পারল না।

থালা থেকে মন্ত্রপূত কারণবারিটা এক চুমুকে খেয়ে নিল সর্দার। একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, কণ্ঠার হাড়, বুক পেরিয়ে নামতে লাগল সেই তরল। হাত কাঁপছে সর্দারের, এইবার তার হাত কাঁপছে। কী হল? তার অধীত বিদ্যা আজ বিফল হয়ে যাচ্ছে কেন? তাহলে কি ইষ্টদেব বিমুখ হলেন?

একটু পর মাথা ঠান্ডা হলে ব্যাপারটা আবার প্রথম থেকে ভাবতে বসল সর্দার। খুব সম্ভবত জমিদারমশাই লেঠেল পাহারায় বসিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তাই কোনও শক্তিশালী কাপালিক বা অঘোরীর সাহায্য নিয়েছে। নইলে এমন অনর্থ হতে পারে না। ঠিক আছে, সেও মস্ত গুরুর শিষ্য, সেও দেখে নেবে কার কত ক্ষমতা।

একটুপর আবার ঘটি থেকে কারণবারি নিয়ে থালাটি কানায় কানায় পূর্ণ করল সে। ভীম কী যেন বলেছিল? কারা কারা যেন কাজ করে জমিদারবাড়ির কাছারিতে?

এইবার, এইবার তার প্রয়োগ সফল হল। একের পর এক ছবি ফুটে উঠতে লাগল নায়েব, খাজাঞ্চি, পুরোহিত, কালু ডোম, সবার বাড়িঘরদোরের। ছবির পর ছবির ফুটে উঠে মিলিয়ে যেতে লাগল। সর্দার তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল সেসব।

একটা ছবিতে এসে তার আঙুল স্থির হয়ে গেল। কে এই অপরূপা সুন্দরী মেয়েটি? আহা, কী রূপ, কী লাবণ্য, যেন স্বর্গের দেবী নেমে

এসেছেন এই ধরাধামে। এমন মনোহারিণী রূপ আগে কখনও দেখেনি সর্দার। আর দেহলক্ষণ? এমন দেহলক্ষণ তো কোটিকে গুটিক মেলে। এই তাহলে পুরোহিতমশাইয়ের মেয়ে?

চোখ চকচক করে উঠল সর্দারের। এই তো, লোহার বাসরঘরে ঢোকার ছিদ্র খুঁজে পেয়েছে সে। এবার এক ঢিলে দুই পাখি।

ভোর হয়ে আসছে। আনন্দে হাতে হাত ঘষল সর্দার। যা করার আজই।

* * *

সেই রাতে অদ্ভুত স্বপ্নটা আবার দেখল সর্বমঙ্গলা। দেখল সে যেন গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে এক অন্ধকার পিণ্ডের মধ্যে। যেভাবে মায়ের পেটে বাচ্চারা থাকে, ঠিক সেভাবে। যতদূর চোখ যায়, চারিদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে বড় বড় সব চিতা। তাদের আকাশ ছুঁই ছুঁই লেলিহান শিখা দেখলে মনে হয় যেন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সব গ্রাস করতে উদ্যত সেই আগুন। আর চারিদিকে কেউ নেই। কিছু নেই। আকাশ নেই, ভূমি নেই, মানুষ, পশু, প্রাণী, জল স্থল অন্তরীক্ষ, কিচ্ছু নেই। শুধু আছে ওই চিতার কাঠপোড়ার শব্দ আর দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের নিঃশ্বাস।

ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল সর্বমঙ্গলা। নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল সে। তার পরনে শাড়ি কই? এই বাঘছাল তাকে কে পরিয়ে দিল? তার দুই বাজুতে দুটি সাপ জড়িয়ে আছে কেন?.দুই পায়ের গোছে দুটি সাপ এল কোথা থেকে? একটি কালনাগিনী তার মাথার ওপর ফণা উঁচিয়ে আছে কেন?

তার ঠিক সামনে একটি বিশাল চিতা জ্বলছে। সেই চিতার আগুন যেন তাকে ডাকতে লাগল, আয়, আয় আয়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়াল সে। ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল সেইদিকে। এইবার সেই মহাকালান্তক হুতাশন তার একদম সামনে। অথচ ভয় পাচ্ছে না সে। মনে হচ্ছে এই শ্মশান, এই চিতার সমারোহ, এই আগুনের আনন্দ যেন তার বহুকালের চেনা।

জ্বলন্ত কাঠের ওপর পা ফেলে ফেলে চিতার ওপরে উঠতে থাকল সে। অথচ সেই আগুন তাকে স্পর্শ করছে না। তাকে ঘিরে তাথৈ তাথৈ নাচছে সর্পিল শিখার দল। আহা, কী আনন্দ, কী আনন্দ তার শরীর জুড়ে। তার এক পায়ে জন্মের উল্লাস, আরেক পায়ে মৃত্যুর হাহাকার।

আস্তে আস্তে সেই শ্মশানের মধ্যে একটা আর্তি জেগে উঠল। আগুনের শিখায় শিখায় উন্মাদের মাতম জেগে উঠল। মনে হল সমস্ত বিশ্বচরাচর, জগৎব্রহ্মাণ্ড যেন প্রসবযন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে। একটা, চিৎকার, কান্না, বেদনার কলরোল ঘুরে ঘুরে কেঁদে চলেছে তাকে ঘিরে। তবুও তার চলা থামল না। ক্রমশ সে সেই চিতার ওপরে উঠছে। তার পায়ে লেগে খসে পড়ছে জ্বলন্ত কাঠ। ক্রমে তার কোমর অবধি ডুবে গেল আগুনের ঢেউয়ে।

আর তখনই সে দেখল চিতার ওপর কে যেন শুয়ে আছে। কে শুয়ে আছে ও?

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসল সর্বমঙ্গলা। সমস্ত গা ঘামে ভিজে গেছে তার। দ্রুত উঠে মুখে চোখে জল দিল একটু। তারপর পুবের দিকে তাকিয়ে দেখল ভোর হতে চলেছে।

* * *

প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'আপনার সঙ্গে এঁদের আলাপ করিয়ে দিই ঠাকুরমশাই। ইনি কৃষ্ণানন্দ মৈত্র, অধ্যাপনা করেন। ইনি জটাধারী পরমহংস, লোকে বলে জাটিয়া জাদু, মায়ের সেবক। আর ইনি হলেন রামনারায়ণ মিশ্র, পুরুষানুক্রমে আমাদের বংশের কুলপুরোহিত।'

রামনারায়ণ মিশ্র হাত জোড় করে বললেন, 'আহা, কী সৌভাগ্য আপনাদের দর্শন পেলাম।'

কৃষ্ণানন্দও হাত জোড় করে বললেন, 'মা কিরীটেশ্বরীর সেবককে প্রণাম। আসুন ঠাকুরমশাই, মাতৃমূর্তি দর্শন করান।'

রামনারায়ণ মন্দিরের চাতালে উঠে দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'আসুন মৈত্রমশাই, আসুন জাটিয়াবাবা।'

কৃষ্ণানন্দ আর জাটিয়া জাদু হাত জোড় করে নিষ্পলক চোখে

মাতৃমূর্তির দিকে চেয়ে রইলেন। সমগ্র মূর্তিটি কষ্টিপাথরে তৈরি, উচ্চতায় প্রায় চার হাত। দেবী চতুর্মুখী, অষ্টভুজা, ও পদ্মাসনা। বেদির পাদপীঠে দুটি সিংহ মুখোমুখি খোদিত। চারটি দক্ষিণ ভুজে বজ্র, পাশ, শঙ্খ ও শর ধারণ করে আছেন। তিনটি বাম ভুজে অঙ্কুশ, পদ্ম, ধনু এবং নীচের হাতটির তর্জনী বেদি স্পর্শ করে আছে। দেবীর মাথায় একটি কিরীট। সেখানে একটি ক্ষুদ্র শিবমূর্তি। মাতৃকাবিগ্রহটি কঠোরে কোমলে অতি অপূর্ব।

মৈত্রমশাই দুহাত জোড় করে উচ্চারণ করলেন, 'ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা।'

জাটিয়া জাদু কোনও মন্ত্রোচ্চারণ করলেন না। সটান মাটিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন।

একটু পরে দুইজনে বেরিয়ে এলেন। প্রতাপনারায়ণ চাতালের নীচে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি প্রণাম করে বললেন, 'মায়ের দর্শন হল?'

কৃষ্ণানন্দ হৃষ্টস্বরে বললেন, 'কাল রাতের ঝড়ে পথ ভুল করিনি জমিদারমশাই, বরং পথ খুঁজে পেয়েছি। মা নিজেই পথ দেখিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। জয় তারা, ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা।'

'ওটা কী মন্ত্র বললেন মৈত্রমশাই?' প্রশ্ন করলেন রামনারায়ণ, 'হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রে তো এমন কোনও মন্ত্র...'

'পাবেন না পুরোহিতমশাই,' শান্তস্বরে বললেন কৃষ্ণানন্দ, 'কারণ ইনি কোনও হিন্দু দেবীই নন।'

প্রতাপনারায়ণ আর পুরোহিতমশাই দুজনেরই মুখটা হাঁ হয়ে গেল। একে ওপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'কী বলছেন কী মৈত্রমশাই?'

'আমি ঠিকই বলছি। আপনারা হয়তো মূর্তিশাস্ত্রে তেমন অভিজ্ঞ নন। তবে আমি এ বিষয়ে প্রভূত অধ্যয়ন করেছি। দেবী কিরীটেশ্বরী বলে এতদিন যাঁর পূজা করছেন, তিনি একজন অতি প্রাচীন বৌদ্ধদেবী, দেবী বজ্রতারা।'

জাটিয়া জাদু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বটে? তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত এ ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ জাটিয়া এই দেখো, দেবীর বসার ভঙ্গি দেখ। আমরা যাকে পদ্মাসন বলি, বৌদ্ধরা তাকে বলেন বজ্রপর্যাঙ্কাসন। দেবীর কিরীটে যাঁকে দেখছ উনি দেবাদিদেব নন, ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভব। পাদপীঠে একটি দুটি সিংহ খোদিত আছে দেখতে পাচ্ছ? দেব রত্নসম্ভবের বাহন হল দুটি সিংহ।'

প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'আরও যদি একটু বুঝিয়ে বলেন পণ্ডিতমশাই।'

কৃষ্ণানন্দ মন্দিরের দাওয়ায় বসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন।

'বৌদ্ধদের দেবদেবীদের ভাগ হিন্দুদের মতো অবিন্যস্ত নয়। তার একটি সুসংবদ্ধ রীতি আছে। হিন্দুদের এই জগৎজীবন যেমন পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত, বৌদ্ধরা তাকেই বলেন পঞ্চস্কন্ধ। এই পাঁচটি স্কন্ধ হচ্ছে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। বৌদ্ধদের মতে এই পাঁচটি স্কন্ধের অধিপতি পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধ, এঁরা আদিবুদ্ধ হতে উদ্ভূত। পাঁচজন ধ্যানীবুদ্ধ হলেন অক্ষোভ্য, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি, বৈরোচন এবং রত্নসম্ভব। এই পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধের আবার পাঁচজন শক্তি আছেন। অক্ষোভ্য'র শক্তি মামকী, অমিতাভ'র শক্তি পাণ্ডরা, অমোঘসিদ্ধির শক্তি তারা, বৈরোচনের শক্তি লোচনা এবং রত্নসম্ভবের শক্তি বজ্রধাতীশ্বরী।

এই পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধের কুল পৃথক এবং সেই কুল হতে উৎপন্ন বোধিসত্ত্বরাও পৃথক। প্রতিটি কুলে উৎপন্ন দেবদেবীরা সেই কুলের চিহ্ন ধারণ করে থাকেন।

রত্নসম্ভবের স্কন্ধ হল বেদনাস্কন্ধ, মন্ত্রপদ হল রত্নধৃক। দেব রত্নসম্ভবের বাহন হল দুটি সিংহ, এবং প্রতীকচিহ্ন রত্ন। ইনি সমগ্রদক্ষিণদেশাধিপতি। ইনি বসন্তঋতু, লবণরস এবং বর্ণমালার ত বর্গের ওপর আধিপত্য করেন।

এই রত্নসম্ভব কুলের অন্যতম দেবী হচ্ছেন বজ্রতারা। যিনি তারণ করেন তিনিই তারা। দেবীর মূর্তি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এঁর ধনুর্বাণ রিপুনাশে উদ্যত; আবার প্রস্ফুটিত পদ্মে ও বরদমুদ্রায় মহাকরুণা ও জ্ঞান ধারণ করে আছেন। মা তারাই গৌরী, মঙ্গলা, গায়ত্রী। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি, কৈবল্যদায়িনী। জয় মা তারা, জয় মা শ্যামা।'

জাটিয়া জাদু এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিলেন। এতটা শুনে চুক চুক শব্দে আক্ষেপ করে বললেন, 'গুরুদেব এই জন্য বলতেন শিক্ষালাভে মন দিতে।

এই পিঠে তিনি কম করে একশোখানি বেত ভেঙেছেন, তাও কিছু শিখে উঠতে পারলাম না। অথচ এই দেখো তুমি কত জানো। আর আমি?'

কৃষ্ণানন্দ হেসে উঠে বললেন, 'শিক্ষার অন্তিম উদ্দেশ্য তো অন্তর্নিহিত দেবত্বকে, শিবত্বকে ছোঁয়া। সে শিক্ষায় তুমি আমার থেকে অনেক এগিয়ে গেছো জাটিয়া। আমি জ্ঞানমার্গে যে পাহাড়ের পাদদেশ অবধি পৌঁছেছি, তুমি ভক্তিমার্গে ইতিমধ্যেই সেই পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে বসে আছ।'

প্রতাপনারায়ণ সামান্য অধৈর্য হয়ে বললেন, 'ক্ষমা করবেন পণ্ডিতমশাই, আমি, আমার পিতৃপুরুষেরা কি তাহলে বিধর্মী কোনও দেবীকে পূজা করে এসেছি এতদিন?'

'বিধর্মী দেবী?' রুষ্ট হলেন কৃষ্ণানন্দ, 'ওই পাপ শব্দ আপনার মুখে উচ্চারিত হল কী করে জমিদারমশাই? ভগবান বুদ্ধ বিধর্মী ছিলেন? বিধর্ম কাকে বলে? মনে রাখবেন এই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করা প্রতিটি ধর্ম এই দেশের ধর্ম। আর সেই ধর্মের যাবতীয় দেবদেবীরা আমাদের নিজস্ব, কেউ বিধর্মী নয়। ভগবান বুদ্ধ শুধু এই ভারতভূমির নয়, এই পৃথিবীর সর্বোত্তম পুরুষ ছিলেন। তিনি ভারতপদ্মের মণি, এই দেশের জাগ্রত চৈতন্যের মূলীভূত স্বরূপ। তাঁর ধর্মসম্ভূত দেবদেবীদের বিধর্মী বলে অসম্মান করার স্পর্ধা হল কী করে আপনার?'

প্রতাপনারায়ণ যেন সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেলেন। মিনমিন করে বললেন, 'না না,আমি তা বলতে চাইনি। আসলে অনেকে বৌদ্ধ নাঢ়ানাঢ়ীদের নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে কী না...'

কৃষ্ণানন্দ বললেন, 'কে কী বলে সে কথা বাদ দিন জমিদারমশাই। শুনেছি আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে নাকি বৌদ্ধ আর হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম-দর্শন-মূর্তি-স্মৃতি এসব নিয়ে কূট ও জটিল বাদ-বিসম্বাদ ছিল। এখন এই বিধর্মী যবনের আক্রমণে সেসব সূক্ষ্মতর্ক কবেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আর ওই নাঢ়ানাঢ়ীদের কথা বলছেন? ওরা তো চেয়েছিল হিন্দুধর্মের মূলস্রোতে ফিরে আসতে। এই আমরাই, হিন্দুধর্মের হোতারাই আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তা হতে দিইনি। তাই নাঢ়ানাঢ়ীদের

প্রায় সবাই ওই বিধর্মীদের ধ্বজতলে আশ্রয় নিচ্ছে। সে কি তাদের দোষ? আমাদের দোষ নেই? এখনও আমরা বৌদ্ধদের বিধর্মী বলে ত্যাগ করব? তাঁদের ধর্মসংস্থাপনাকে দূরে সরিয়ে রাখব?'

প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'তাহলে আমার কী করা উচিত প্রভু?'

কৃষ্ণানন্দ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'মা নিজে আপনাদের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেছেন জমিদারমশাই, আপনি মহাপুণ্যবান। আপনার উচিত দেবী বজ্রতারাকে আরও নিবিড়ভাবে আত্মীকৃত করা। তাঁকে হিন্দুধর্মের মধ্যে উচ্চস্থান দেওয়া, মা জগদম্বিকার সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়া, তারামন্ত্রকে এই বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়া। ইনি কিন্তু মা দুর্গারই অন্য রূপ জমিদারমশাই। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করলাম, দেবী তারা আপনার সমস্ত ক্লেশ নাশ করবেন, আপনার ঘরে সমৃদ্ধি আনবেন।'

রামনারায়ণ অভিভূত হয়ে কৃষ্ণানন্দকে প্রণাম করতে কৃষ্ণানন্দ স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি জাটিয়া জাদুকে প্রণাম করতেই জাটিয়া একেবারে কেঁপে উঠেই খপ করে রামনারায়ণের হাত ধরে ফেললেন। রামনারায়ণ একটু বিব্রত হলেন। বললেন, 'কী হল জাটিয়াবাবা?'

জাটিয়া জাদু ভয় পাওয়া স্বরে বললেন, 'তোমার মাথার পেছনে ও কার ছায়া ঘুরছে রামনারায়ণ? তোমার বাড়িতে সবাই ঠিক আছে তো?'

* * *

সর্বমঙ্গলা পুকুর থেকে বাসনপত্র ধুয়ে ঘরে ফিরছিল। সঙ্গে পুকুরপাড় থেকে তোলা কিছু কলমি আর হেলেঞ্চাশাক। বাপঠাকুর কলমি শাকভাজা খেতে ভারী ভালোবাসেন।

দুধপুকুরের হাঁসগুলো সর্বমঙ্গলার ভারী ন্যাওটা। তারা প্যাঁকপ্যাঁক করতে করতে হেলেদুলে সর্বমঙ্গলার পিছে পিছে আসছিল। সর্বমঙ্গলা জানে এরা তার পাছু পাছু বাড়ি অবধি পৌঁছবে। সর্বমঙ্গলা উঠোনে তাদের ক'টি ভাতের দানা ছড়িয়ে দেবে, আর এরা ভারী আনন্দ করে সেই ভাত খেয়ে ডানা তুলে নৃত্য করতে করতে বিদায় নেবে। এ তার নিত্যকারের খেলা। গিরিসুন্দরী এজন্য মাঝে মাঝে ছদ্মকোপে মেয়েকে ভর্ৎসনা করেন

বটে। তবে সে তার মনের কথা নয়। হাঁসেদের সঙ্গে মেয়ের এই খেলাটুকু তিনিও কম উপভোগ করেন না।

পুকুরপাড় থেকে কয়েকপা এগোলেই গ্রামের পথ। মোড়ের মাথায় একটু আগে একটা বড় তালগাছ আছে। তার নীচে অনেকটা জায়গা জুড়ে বিশাল ঝোপজঙ্গল। সর্বমঙ্গলা সেই তালগাছের কাছে পৌঁছেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখল একটি নেউল দ্রুত পথের এপার থেকে ওই ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে ঢুকে গেল। আর তার গায়ের রং যেন সোনার মতো।

থমকে গেল সর্বমঙ্গলা। নেউল আবার সোনার হয় নাকি? নাকি চোখে ভুল দেখল সে?

পিছনে ফিরে সর্বমঙ্গলা দেখল হাঁসগুলো নেই। কোথায় গেল ওরা?

একটু ইতস্তত করে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল সর্বমঙ্গলা। এমন সুন্দর নেউল কখনও দেখেনি সে। পুষবে ওটাকে।

* * *

অস্থিরপায়ে ঘরবার করছিলেন গিরিসুন্দরী। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, মেয়ে বাড়ি ফিরল না কেন? এত দেরি তো হয় না সচরাচর। কখন রান্না হয়ে গেছে। মেয়ে এলে তাকে খেতে দিয়ে তিনি নাইতে যাবেন। তারপর ইষ্টদেবতার পায়ে দুটি ফুল সমর্পণ করে নিজে খেতে বসবেন। সংসারের কত কাজ বাকি। হতচ্ছাড়ি গেল কোথায়?

একটু পর রাগটা কমে এলে ভয় ভয় করতে লাগল গিরিসুন্দরীর। পথে-ঘাটে কোনও বিপদ হল না তো? একে বাড়ন্ত বয়সের মেয়ে, তার ওপর দিনকাল ভালো নয়। বিশেষ করে সেদিন স্বামীর কাছে এই ভূতুড়ে ডাকাতদলের কথা শোনার পর থেকেই মনটা কু গাইছে গিরিসুন্দরীর।

একটু পর দরজায় কার যেন পদশব্দ। আশান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন গিরিসুন্দরী। মেয়ে ফিরল নাকি? কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েই হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। এ কী! তাঁর স্বামী? এখন? কী হয়েছে ওঁর? মুখচোখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

রামনারায়ণ হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলেন, 'মঙ্গলা কোথায়?'

বিস্ময়টুকু চেপে রেখে গিরিসুন্দরী বললেন, 'দুধপুকুরে স্নান করতে গেছিল, এখনও ফেরেনি। কিন্তু তুমি... '

বাকিটা আর বলার সময় পেলেন না গিরিসুন্দরী। রামনারায়ণ দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। গিরিসুন্দরী স্বামীর পিছনে পিছনে গিয়ে দেখলেন উঠোনে এক সন্ন্যাসী আর একজন ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে। তিনি ঘোমটাটা থুতনি অবধি টেনে নিলেন। এবার সত্যি তাঁর ভয় করতে লাগল। এরা কারা? স্বামী এমন অসময়ে বাড়িতে দৌড়ে এলেন কেন? মেয়ে এখনও এল না কেন?

গিরিসুন্দরী দেবী দেখলেন তিনজনের মধ্যে শুধু চোখাচোখি হল, কোনও কথা হল না। তারপর রামনারায়ণ দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন। বাকি দুজনও অনুসরণ করলেন তাঁকে।

* * *

তিনজনে রাস্তার বাঁক পেরিয়ে দুধপুকুরে যাওয়ার পথ ধরলেন। লোকের পায়েচলায় ফুটে উঠেছে একটি ঘাসে ছাওয়া সরু সুঁড়িপথ। সেই পথ দিয়ে সামান্য এগোলেই পুকুরঘাট। সর্বমঙ্গলা এখানেই আসে স্নান করতে।

আজ পুকুরঘাট একেবারে নির্জন। কেউ নেই, কিছু নেই। পাখিদের ডাক নেই, জলের তিরিতিরি কাঁপন নেই, ঝিরিঝিরি মিঠে হাওয়াটিও নেই, গাছেদের মৃদুমন্দ মাথা নাড়ানো নেই। শুধু একটা বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে আছে চারিপাশে। মনে হচ্ছে যেন নিঃশ্বাস নেওয়াও এখানে নিষিদ্ধ।

কৃষ্ণানন্দ নাক টানলেন এক দু'বার। তারপর ভুরু কুঁচকে চারিদিকে চাইলেন। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বললেন, 'জাটিয়া...'

জাটিয়া জাদু চাপা গলায় বললেন, 'অতি জটিল ভূবন্ধন। কিন্তু এ তো অতি প্রাচীন তন্ত্র, শুনেছিলাম লোপ পেয়ে গেছে।'

'লোপ যে পায়নি সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু প্রয়োগ করল কে?'

রামনারায়ণ এসব শুনছিলেন না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক

তাকাচ্ছিলেন। প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলেন এই বুঝি তাঁদের চমকে দিয়ে কোন জাদুমন্ত্রে উদয় হবে তাঁর মেয়ে।

কৃষ্ণানন্দ সতর্ক চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে পুকুরপাড়ে পৌঁছলেন। সেখানে নীচু হয়ে কী যেন দেখলেন খুব মন দিয়ে। তারপর পুকুরপাড় থেকে উঠে আসার পথটি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তাঁকে দেখে মনে হল কীসের যেন একটা চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। তারপর ধীরে ধীরে পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে এগোতে থাকলেন। তাঁর পেছন পেছন জাটিয়া আর রামনারায়ণ।

একটু এগোলেই বড় ঝোপটা। ঠিক তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কৃষ্ণানন্দ। তারপর বললেন, 'এর মধ্যে ঢুকতে হবে।'

রামনারায়ণ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দেখলেন ঠাকুরমশাই?'

'পথে কিছু সোনার ধুলো ছড়ানো আছে। এত সূক্ষ্ম যে খুব খুঁটিয়ে না দেখলে ধরা যাবে না। আর সেই ধারা এসে শেষ হয়েছে এখানে, এই ঝোপের সামনে। এরকম অস্বাভাবিক ঘটনা জীবনে দুটি দেখিনি। এই নির্জন পুকুরপাড়ে সোনার ধুলো ছড়িয়ে গেল কে?'

জাটিয়া জাদু কম কথার মানুষ। তিনি সবলে ঝোপজঙ্গল ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেলেন। একটু পরেই তাঁর আর্তচিৎকার ভেসে এল, 'এ কী!'

কৃষ্ণানন্দ আর অপেক্ষা করলেন না। দ্রুত জাটিয়ার পদানুসরণ করলেন। পেছন পেছন রামনারায়ণও।

* * *

গিরিসুন্দরী উদ্বিগ্নমুখে দাওয়ায় বসেছিলেন। তাঁর স্নান-খাওয়া কিছুই সাড়া হয়নি। মনের মধ্যে উথালপাথাল চলছে। থেকে থেকে আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কী হল তাঁর মেয়ের? স্বামীই বা অমন ঝড়ের মতো এসে আবার কোথায় চলে গেলেন? সঙ্গে ওই দুজন কারা? চিন্তায় চিন্তায় মনে হচ্ছিল পাগল হয়ে যাবেন তিনি।

একটু পর সদর দরজার কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, 'মা, দুটি ভিক্ষা পাই যেন।'

গিরিসুন্দরী উঠে দাঁড়ালেন। যতই অশান্তিতে থাকুন না তিনি, এই অবেলায় ভিক্ষুক ফিরিয়ে দেওয়ার মতো অলুক্ষুণে কাজ তিনি কিছুতেই করবেন না।

একটা মাটির সরায় কিছু চাল আর দুটি কড়ি নিয়ে বাইরে এলেন গিরিসুন্দরী। কিন্তু যাকে দেখলেন তাকে দেখে ঠিক ভিক্ষুক বলে মনে হয় না। রোগা পাকানো চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল আর সারা মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। কাঁধে একটি ঝোলা। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, নিম্নাঙ্গে একটি কালো কাপড় শাড়ির মতো ঘের করে পরা। আর চোখ দু'খানি তীব্র, এত তীব্র যে তাকালে ভয় করে।

লোকটাকে দেখে গিরিসুন্দরীর অস্বস্তি হতে লাগল। তবুও তিনি মনের ভাব গোপন করে বললেন, 'তোমার ওই ঝোলাটা এদিকে আনো বাবা, চালটা ঢেলে দিই।'

লোকটি কিছু বলল না। শান্ত হেসে বলল, 'মেয়েকে নিয়ে চিন্তা করছেন মা? করবেন না। আপনার মেয়ে ভালো আছে, সুস্থ আছে।'

গিরিসুন্দরী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন। বললেন, 'আমার মেয়ের ব্যাপারে তুমি কী করে জানলে বাবা?'

লোকটি ঝুলি থেকে কী যেন একটা বার করে গিরিসুন্দরীর সামনে মেলে ধরল। আর গিরিসুন্দরী সেটা দেখামাত্র আমূল থরথর কেঁপে উঠলেন। শাড়ি! সর্বমঙ্গলার শাড়ি!! এই শাড়ি পরেই তো স্নানে গেছিল মেয়েটা! সে শাড়ি এর হাতে এল কী করে? তিনি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলে সেই লোকটার দিকে।

লোকটা শাড়িটা তার ঝোলায় পুরে চতুর হেসে বলল, 'চিন্তা করবেন না মা। আপনার মেয়ে ভালো আছে। তার কোনও ক্ষতি হয়নি। আমার কথা যদি মেনে চলেন তাহলে সে সুস্থ দেহে ফিরে আসবে। কেউ জানতেও পারবে না। আর যদি না মেনে চলেন, তাহলে কিন্তু আপনার মেয়ের মৃতদেহ এই আপনার বাড়ির দরজায় ফেলে যাব।'

গিরিসুন্দরীর মুখে কথা ফুটল না। তাঁর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে যেন এক্ষুনি তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন।

লোকটির ঝোলা থেকে একটি ছোট মাথা উঁকি দিল। তারপর একটি নেউল বেরিয়ে এসে লোকটির ঘাড়ে মাথায় খেলা করতে লাগল। গিরিসুন্দরী দেখলেন নেউলটি সম্পূর্ণ সোনার বরণের। তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে লোকটি বলল,'বাঘার জঙ্গলে ঢোকার মুখে যে বড় বটগাছটা আছে, আপনার স্বামীকে বলবেন তিনি যেন আজ মধ্যরাতে সেখানে উপস্থিত থাকেন। সঙ্গে যেন কোনও অস্ত্র বা লোকজন না থাকে। আমি আপনার স্বামীকে কিছু কাজ করতে দেব। তিনি সেই কাজ সুসম্পন্ন করলেই আপনার মেয়ে সুস্থ দেহে ফিরে আসবে। মনে থাকে যেন, নিরস্ত্র এবং একাকী।'

বলেই লোকটি পিছন ফিরে দ্রুত পায়ে হাঁটা দিল। গিরিসুন্দরীর জ্ঞানহীন দেহটা পড়ে রইল সদর দরজার গোড়ায়।

* * *

রামনারায়ণ আর কৃষ্ণানন্দ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন জাটিয়া জাদুর কাছে। দেখলেন জাটিয়া মাটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে মাটির দিকে তাকাতেই একটা নারকীয় দৃশ্য দেখতে পেলেন দুজনে।

চারিদিকে কয়েকটি হাঁসের মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ বা কারা যেন অসহায় হাঁসগুলোর মাথা দেহ থেকে সজোরে ছিঁড়ে নিয়েছে। চারিদিকে চাপ চাপ রক্ত। তারমধ্যে কিছু কিছু হাঁসের দেহ আবার আধখাওয়া।

দৃশ্যটা এতটাই বীভৎস যে তিনজনেই একটু থমকে গেলেন। কৃষ্ণানন্দ নীচু হয়ে একটি হাঁসের মৃতদেহ ডানা ধরে তুলে কী যেন দেখে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

জাটিয়া জাদু জোরে নিঃশ্বাস নিলেন বার দুয়েক। তারপর সামান্য ভয়ের স্বরে বললেন, 'আমি কিন্তু অবস্থা ভালো বুঝছি না কৃষ্ণানন্দ। আমার

ইন্দ্রিয়, আমার অনুভূতি বলছে এখানে কোনও এক অত্যন্ত প্রাচীন এবং শক্তিশালী তন্ত্রবিদ্যার আবির্ভাব ঘটেছিল। মনে হচ্ছে শীঘ্রই একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে। আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।'

জাটিয়া জাদুর কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা আর্তচিৎকার ভেসে এল রামনারায়ণের মুখ থেকে। বাকি দুজন সচকিত হয়ে চেয়ে দেখলেন রামনারায়ণ ঝোপের একদিকে চেয়ে আছেন। সেখানে কাঁটাগাছের গায়ে একটুকরো কাপড় লেগে আছে।

জাটিয়া জাদু গিয়ে অতি সন্তর্পণে কাপড়ের টুকরোটি তুলে আনলেন। একটি শাড়ির টুকরো। কৃষ্ণানন্দ বললেন, 'এ কি আপনার মেয়ের শাড়ির অংশ?'

রামনারায়ণ কোনওক্রমে মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

কৃষ্ণানন্দ কাপড়ের টুকরোটি নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখলেন। তারপর নীচু হয়ে প্রায় চতুষ্পদ প্রাণীর মতো সমগ্র ক্ষেত্রটিকে মন দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

একটু পর তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর কপালে ঘনঘোর ভ্রুকুটি। চোখদুটি খর হয়ে উঠেছে। দেখে বোঝা যাচ্ছে যে গভীরভাবে চিন্তান্বিত তিনি।

জাটিয়া জাদু উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী দেখলে কৃষ্ণানন্দ?'

'এখানকার মাটিতেও সেই অত্যন্ত মিহি সোনার ধুলো ছড়িয়ে আছে। তবে কোনও নির্দিষ্ট রেখা ধরে নয়। মনে হচ্ছে সেই স্বর্ণধুলার ধারা যেন দুধপুকুরের পথ হতে এখানে এসে এক জায়গায় স্থির হয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর আর তার চিহ্ন নেই।'

কথা বলতে বলতে কৃষ্ণানন্দ অত্যন্ত মন দিয়ে আশপাশের ঝোপঝাড় আর মাটি লক্ষ্য করছিলেন। কয়েকটি ভাঙা ডাল, কয়েকটি খসে পড়া পাতা তুলে তুলে দেখলেন। তারপর উত্তরের দিকে একটু এগিয়ে গেলেন। সেখানে পথের ধুলো, ঝোপজঙ্গল খুব মন দিয়ে দেখলেন। যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মুখ আরও চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল। বিড়বিড় করে বললেন, 'তারপর? তারপর কী হল?'

জাটিয়া জাদু বললেন, 'কী বলছ কি কৃষ্ণানন্দ? কীসের কী হল?'

'এখানে কেউ একজন ছিল। মা মঙ্গলা তো বটেই, সঙ্গে আরও একজন। একটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। কিন্তু না তার আসার চিহ্ন আছে, না তার যাওয়ার লক্ষণ। যেন সে হঠাৎ করে এসে আবার হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেছে।'

রামনারায়ণ যখন মুখ খুললেন তখন বোঝা গেল যে ভয়, উদ্বেগ, আশঙ্কা সব মিলিয়ে বোধহয় উন্মাদ হওয়ার সীমায় পৌঁছে গেছেন তিনি। কাঁপা কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'আমার মেয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ? ওর শাড়ির ছেঁড়া অংশ? কী বলছেন ঠাকুরমশাই? তাহলে কি আমার মেয়ের সম্মান...'

কৃষ্ণানন্দ বললেন, 'বুদ্ধিভ্রষ্ট হবেন না ঠাকুরমশাই। আমার মন বলছে আপনার মেয়েকে শুধু অপহরণই করা হয়েছে, তার বেশি কোনও অপকর্মের চিহ্ন এখানে নেই। শাড়ির ওই অংশটুকু ছিঁড়েছে কাঁটাঝোপে লেগে। আপনি স্থির হোন। এখন বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া মানে মস্ত বড় বিপদ। আমরা জমিদারমশাইকে গিয়ে বলছি....।'

কাটা কলাগাছের মতো দুজনের পায়ে পড়ে গেলেন রামনারায়ণ, 'দয়া করে আমার এত বড় সর্বনাশটা করবেন না মৈত্রমশাই, আপনাদের হাতে পায়ে ধরছি। এই ঘটনা যেন কিছুতেই জমিদারমশাইয়ের কানে না যায়। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ। ঘরের মেয়ে অপহৃতা হয়েছে শুনলে সমাজে আমাদের সবাই একঘরে করবে, এড়িয়ে চলবে, বেঁচে থাকাই দুঃসহ হবে। যা করার আমি করব। আমিই আমার চেষ্টা করব আমার মেয়েকে উদ্ধার করে আনার। কিন্তু আপনাদের দোহাই, এই কথা কোনওমতে যেন প্রতাপনারায়ণের কানে না যায়।'

দুজনেই দুপা পিছিয়ে এলেন। জাটিয়া জাদু তীব্রস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'স্বার্থপর ব্রাহ্মণ, মেয়েকে উদ্ধার করার পরিবর্তে শুধু নিজের পরিবারের সম্মানটাই তোর কাছে বড় হল? তোর লজ্জা করে না বাপ হয়ে এমন কথা বলতে?'

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন রামনারায়ণ, 'করে ঠাকুর, খুব করে।

আমার ওই একটি মাত্র সন্তান ঠাকুর, আমার সাগরসেঁচা ধন। আপনি জানেন না ঠাকুর কীভাবে আমার বুকটা এখন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ওকে না দেখলে যে আমার মুখে একগ্রাস ভাতও ওঠে না ঠাকুর, রাতে ঘুম আসে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঈশ্বরের নাম নেওয়ার আগে একবার ওর নাম ধরে ডাকি। ওর মুখ দেখে ঘুমোতে যাই। আর আজ সেই মেয়ে আজ আমার চোখের সামনে নেই ঠাকুর। উপায় থাকলে আজ এখনই নিজের বুকে সড়কি ফেঁড়ে মরে যেতাম। কিন্তু ওকে না দেখে মরলে যে আমার মরণেও শান্তি হবে না গো সন্ন্যাসী ঠাকুর। কিন্তু এখন যদি গাঁয়ে সংবাদ রটে যায় যে আমার সোনার পুতলিকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে, তাহলে এই সমাজ আমাদের একঘরে করবে, ত্যাগ করবে, গঞ্জনা দেবে। আপনিই বলুন সন্ন্যাসী ঠাকুর, তখন আমাদের স্বামী-স্ত্রী'র জন্য গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে?'

কৃষ্ণানন্দ তাঁর কোমল হাতখানি জাটিয়া জাদুর পিঠে রাখলেন, 'রাগ কোরো না জাটিয়া। তুমি সমাজত্যাগী সন্ন্যাসী, তোমার পক্ষে এসব কূটসমাজস্থিতি বোঝা সম্ভব নয়। আপাতত ওঁর কথাই মেনে নেওয়া যাক। চলো, আমরা জমিদারবাড়িতে যাই। আর ঠাকুরমশাই, আপনিও বাড়ি যান। মাথা ঠান্ডা করে ভাবুন আপনি কী করবেন। যদি সিদ্ধান্ত বদলান তো আমাদের জানাবেন।'

* * *

সর্বমঙ্গলা গুটিসুটি মেরে কুঁড়েঘরের এক কোণে বসেছিল। এই কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতায় সে যেন অনেক বুড়িয়ে গেছে। কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল এখনও তার মাথায় ঢুকছে না।

সোনার নেউলের পিছনে পিছনে সে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ঢুকে পড়েছিল। একদিকে তার মন বলছিল সে যা করছে ঠিক করছে না, নেউল কখনও সোনার হয় না। অন্যদিকে ওটাকে ধরার তার তীব্র ইচ্ছা হচ্ছিল। আহা, পুষতে পারলে কী দারুণই না হবে।

সর্বমঙ্গলা ক্রমে বুঝতে পারছিল তার হাত-পা যেন অবশ হয়ে

আসছে। কানে শব্দ পৌঁছচ্ছে না, চোখের দৃষ্টিও যেন ঝাপসা হয়ে আসছে।

খানিকটা গিয়ে একটু ফাঁকা জায়গা। সেখানে গিয়ে একটু হাঁফ ছাড়ল মঙ্গলা। নেউলটা গেল কোথায়?

ঠিক তখনই যেন ভোজবাজির মতো তার সামনে একটা লোক এসে দাঁড়াল। সর্বমঙ্গলা এত চমকে গেছিল যে বলার কথা নয়। লোকটা কোন রাস্তা দিয়ে এল? আর কী বিশ্রী দেখতে। রোগা পাকানো চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল আর সারা মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। খালি গা, একটা কালো ধুতি শাড়ির মতো করে পেঁচিয়ে পরে আছে। আর চোখ দুটোতে লোভ, সীমাহীন লোভ। সর্বমঙ্গলা আর খুকিটি নেই, ওই লোভের চিহ্ন সে স্পষ্ট পড়তে পারে।

সে ভয়ার্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? এখানে কী করে এলে?'

লোকটা বিশ্রী হেসে বলল, 'আমি একজন সাধক গো। পথে ঘাটে ভিক্ষা করে বেড়াই আর ইষ্টদেবতার নাম করি। আমার অনেকদিনের সাধ ছিল তোমার মতো একজন সাধনসঙ্গিনী পাওয়ার। আজ এই দেখো, ঠাকুর পাইয়ে দিলেন। যাবে আমার সঙ্গে?'

সর্বমঙ্গলা দৃঢ়ভাবে বলল, 'না, যাব না। পথ ছাড়। নইলে কিন্তু আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।'

লোকটা খিকখিক করে বলল, 'এখানে লোক কোথায় যে তোমার চিৎকার শুনবে? ভালো কথা বলছি শোনো মেয়ে, আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে রাজরানি করে রাখব। কোনও দুঃখকষ্ট থাকবে না। যা চাইবে তাই পাবে।'

সর্বমঙ্গলা এবার ভয় পেল। আসার সময় দেখেছে পথঘাট ফাঁকা, সত্যিই তার চেঁচামেচি শুনে কেউ আসবে কি না জানা নেই। সে অনুনয়ের সুরে বলল, 'আমাকে যেতে দাও। আমার মা-বাবা অপেক্ষা করে আছেন।'

লোকটা চুকচুক করে বলল, 'তোমার মা-বাবা'র আক্কেলটা কী বল দেখি। অমন সুন্দরী মেয়ে, সোনার মতো গায়ের বরণ, পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ, কাজলকালো চুল, এখনও বিয়ে না দিয়ে ঘরে রাখে কেউ?

তোমার দেহলক্ষণ ভারী পয়মন্ত গো মেয়ে, আমার সাধনসঙ্গিনী হওয়ার একদম উপযুক্ত। চলো মেয়ে, ইষ্টদেব নিজে তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। এই-ই বোধহয় তাঁর ইচ্ছে।'

সর্বমঙ্গলা বুদ্ধি হারাল না। সে বলল, 'কিন্তু তুমি এখানে এলে কী করে?'

লোকটা বলল, 'দেখবে? এই দেখো।'

সর্বমঙ্গলার চোখের সামনের একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটা শুরু হল। সে দেখল হঠাৎ করে লোকটার শরীর ছোট হতে শুরু করেছে। একটু পর তার সামনে একটা মানুষের বদলে একটা নেউল দাঁড়িয়ে রইল, আর তার সমস্ত গা উজ্জ্বল সোনালি রোঁয়াতে চকচক করছে। আবার একটু পরেই সেই নেউল থেকে বড় হতে হতে লোকটা আগের রূপে ফিরে এল।

সর্বমঙ্গলার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল তার গায়ে আর জোর নেই। এক্ষুনি পড়ে যাবে সে। লোকটা এবার তার শিরা ওঠা হাতটা বাড়িয়ে সর্বমঙ্গলার ডান হাত ধরে বলল, আমার ক্ষমতা দেখলে তো? এবার চলো।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা কাণ্ড ঘটল। যে হাঁসগুলো সবসময় সর্বমঙ্গলার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, তাদেরই একটা উড়ে এসে ঝাপটা মারল লোকটার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে বাকি হাঁসগুলোও। তাদের ডানা ঝাপটানি আর ক্রুদ্ধ ডাকে জায়গাটা যেন একটা ছোটখাটো যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। সর্বমঙ্গলা এক পা এক পা করে পিছোতে লাগল যেদিক দিয়ে সে এসেছিল সেদিকে। একবার দৌড়ে সে রাস্তায় গিয়ে পড়ুক, তারপর দেখবে লোকটা তাকে ধরে কী করে।

কিন্তু তারপর যেটা সে দেখল সেটা তার দূরতম কল্পনাতেও ছিল না। তার পা দুটো যেন পাথর হয়ে গেল।

লোকটা প্রথমে এই আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত হয়ে গেছিল। তবে নিজেকে দ্রুতই সামলে নিল সে। প্রথমে সে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরল সবচেয়ে বড় হাঁসটার শরীর। তারপর ডান হাত দিয়ে এক অমানুষিক

টানে হাঁসটার মুন্ডুখানা ছিঁড়ে নিল সে। এক ঝলক রক্ত ছিটকে পড়ল তার চোখেমুখে। তারপর অন্য একটা হাঁসকে ধরল সে। তারও এক গতি হল। তারপর প্রতিটা হাঁসের মুন্ডু ছিঁড়ে চারিদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল লোকটা।

এই অকল্পনীয় নিষ্ঠুর এবং বীভৎস দৃশ্যের অভিঘাত সর্বমঙ্গলার মস্তিষ্ক আর নিতে পারল না। শেষ হাসটি নির্মমভাবে নিহত হওয়ার আগেই সর্বমঙ্গলা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

তারপর যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন সে এখানে। কোনওমতে মেঝে থেকে উঠে দেখল একটা কুঁড়েঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে সে। না, হাত-পা বাঁধা নেই। গায়ে হাত পায়ে ব্যথাও নেই তেমন। শুধু মাথাটা খুব টিপটিপ করছে।

কুঁড়েঘরের মেঝেটাও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সে যেখানে শুয়েছিল তার উল্টোদিকের দেওয়ালে একটা দরজা, আর ঘরের দুদিকের দেওয়ালে দুটো জানলা। সর্বমঙ্গলা উঠে পড়ল। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল চারিদিকে ঘন জঙ্গল। জায়গাটা কোথায় বুঝতে পারল না সে।

প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছিল সর্বমঙ্গলার। এদিক ওদিক তাকাতেই দেখল ঘরের কোণে একটা কুঁজো রয়েছে, মুখ বন্ধ করা সরার ওপর একটা ঘটিও। ঢকঢক করে অনেকটা জল খেলো সে। তারপর দরজাটা টানতেই খুলে গেল।

পা টিপে টিপে বাইরে এল মঙ্গলা। জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করে এই জায়গাটা বানানো হয়েছে। কয়েকটা কুঁড়েঘর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সবচেয়ে বড় কুঁড়েঘরটা একটা মস্ত বড় বটগাছের তলায়। তার পাশে একটা বেদি। বেদির ওপর কোনও একটা ঠাকুরের মূর্তি। সামনে হাড়িকাঠ। ঠাকুরের মাথায় ছাউনি দেওয়া।

আশপাশে কোনও লোক দেখতে পেল না সর্বমঙ্গলা। সে পা টিপে টিপে আরও একটু এগোল। নাহ, কোথাও কেউ নেই।

এই অঞ্চলে এত বড় জঙ্গল বলতে এক বাঘার জঙ্গল। তাহলে কি

ওই লোকটা ওকে বাঘার জঙ্গলে এনেছে? কিন্তু বাঘার জঙ্গলে তো দানো আছে। লোকটা এল কী করে?

সে যেভাবেই আনুক। এখন ওকে পালাতে হবে।

বিকেল হয়ে সন্ধে হব হব করছে। সূর্য পশ্চিমপাটে। দিক ঠিক করে নিল মঙ্গলা। উত্তরদিকের জঙ্গল ভেঙেই তাকে এগোতে হবে। ওই দিকেই তার গ্রাম। জঙ্গল পেরোলেই বারুণী নদী, এই গ্রীষ্মে তার বুক একেবারে শুকনো খটখটে। পেরিয়ে গেলে আর কেউ তাকে ধরতে পারবে না।

কিন্তু ওদিকে দুপা হাঁটতেই কে যেন বলে উঠল, 'ওদিকে গিয়ে লাভ নেই, যে তোমাকে এনেছে তার অনুমতি ছাড়া জঙ্গল থেকে কেউ বেরোতে পারবে না।'

মঙ্গলা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল একজন তরুণ, বয়েসে তার থেকে খানিকটা বড়ই হবে, অন্য একটা কুঁড়েঘরের দরজা থেকে বেরিয়ে এসেছে। কথাটা সেই বলেছে।

ছেলেটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মঙ্গলার চোখের সামনের তার স্বপ্নের দৃশ্যটা যেন হঠাৎ করেই ভেসে উঠল। চিতার চূড়ায় উঠে পড়েছে সে। একটু দূরে কার যেন একটা শবদেহ শোয়ানো। তবে সে মুহূর্তের জন্য। দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

মঙ্গলা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

তরুণ বিষণ্ণমুখে বলল, 'নাম শশিশেখর, নিবাস তালকোঠরি। পিতার নাম হরিসাধন বন্দ্যঘটী।'

মঙ্গলা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে এলে কী করে?'

শশিশেখর তার পুরো কাহিনী বলল। তারপর পালটা জিজ্ঞেস করল, 'আর তুমি কে?'

'আমি চণ্ডীপুর গাঁয়ের পণ্ডিত রামনারায়ণ মিশ্র'র মেয়ে। আমার নাম সর্বমঙ্গলা।'

শশিশেখরের কেন জানি না মনে হল রামনারায়ণ মিশ্র নামটা কোথায় যেন শুনেছে সে। কিন্তু মনে পড়ল না কোথায়। সে প্রশ্ন করল, 'তুমি এখানে এলে কী করে?'

মঙ্গলা বলল, 'একটা বিশ্রী লোক আমাকে গ্রামের পথ থেকে চুরি করে এনেছে।'

'সর্দার তোমাকে চুরি করে এনেছে? সে কী, কেন?'

'বলেছে আমাকে সাধনসঙ্গিনী করবে।'

শশিশেখরের মুখে পর্যায়ক্রমে, বিস্ময়, ক্রোধ এবং অসহায়তা খেলা করে গেল। কিছুক্ষণ ক্ষিপ্ত পদচারণার পর সে চেঁচিয়ে উঠল, 'রঘু।'

কুটির থেকে রঘু বেরিয়ে এল। প্রথমে মঙ্গলাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। তারপর শশিশেখরকে বলল, 'ডাকলেন ছোটকত্তা?'

শশিশেখর ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, 'ওই সর্দারের সাহস দেখেছ। একটা আধবুড়ো ভাম, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এই মেয়েটাকে তুলে এনেছে সাধনসঙ্গিনী করবে বলে। স্পর্ধাটা ভাবো একবার।'

রঘুর মেয়ে হরিমতীর বয়েসও সর্বমঙ্গলার মতোই। শশিশেখরের কথা শোনামাত্র রাগে রঘুর গায়ের পেশিগুলো ফুলে উঠল। সে বলল, 'আজ ডাকাতি করে ফেরত আসুক শয়তানটা, দেখাব রঘু পাইকের লাঠির জোর কত।'

শশিশেখর ধমকে উঠল, 'পাগলের মতো কথা বোলো না রঘু। সেদিন দেখনি লোকটা কত বড় গুনিন? আর ওর পিশাচ বাহিনীর কথা ভুলে গেলে? তুমি লাঠি তোলার আগেই তোমার মুন্ডু ছিঁড়ে নেবে।'

শশিশেখরের শেষ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলার স্মৃতির মধ্যে কে যেন সেই ভয়ানক দৃশ্যটা চাবুকের মতো আছড়ে দিল, লোকটা একটা একটা করে হাঁসের মাথা ছিঁড়ে নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে শিউরে উঠল সে, অস্ফুটে বলে উঠল, 'উঃ কী ভয়ঙ্কর, কী ভয়ঙ্কর!'

শশিশেখর বলল, 'কী হয়েছে? অমন আঁতকে উঠলে কেন?'

মঙ্গলা বলল, 'ও মানুষ নয়, পিশাচ, একটা আস্ত পিশাচ। ইচ্ছেমতো মানুষ থেকে নেউল, আবার নেউল থেকে মানুষ হতে পারে। আর লোকটা কী নৃশংস, কী ভয়ানক ...' বলতে বলতে থেমে গেল ও। না, ওই বীভৎস দৃশ্যটা আর মনে করবে না সে, কিছুতেই মনে করবে না।

রঘু দৌড়ে গিয়ে শশিশেখরের কুটির থেকে ঘটিতে করে জল নিয়ে

এল। মঙ্গলার হাতে দিয়ে বলল, 'জলটা খেয়ে নাও মা, সুস্থ লাগবে।'

মঙ্গলা জলটা খেয়ে ঘাড়ে মাথাতেও একটু দিল। তারপর শশিশেখরকে বলল, 'আমি এই গাঁয়ের মেয়ে। সব পথঘাট আমার চেনা। একবার জঙ্গল পেরোতে পারলে আমিই তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি। পালাতে পারব না কেন বললে?'

রঘু বলল, 'যে তোমাকে আর আমাদের এখানে ধরে এনেছে মা, সে মস্ত বড় কাপালিক। তার অসীম ক্ষমতা। অনেক লোক বলি দিয়ে সে তাদের পিশাচ বানিয়ে রেখেছে। সেই পিশাচদের চোখ এড়িয়ে এই জঙ্গল থেকে কারও বেরোবার উপায় নেই।'

মঙ্গলা কিছু বলতে যাওয়ার আগেই জঙ্গলের মধ্যে মশালের আলো দেখা গেল। একটু পর পিশাচ-ডাকাতের দল ঘিরে ধরল তাদের। একজন কর্কশ স্বরে বলল, 'ঘরে যাও। নইলে বিপদ হবে।'

শশিশেখর দেখল তাদের মধ্যে সর্দার নেই। সে ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'সর্দার এলেন না?'

সেই কর্কশ কণ্ঠে উত্তর এল, 'সর্দার শিকার করতে বেরিয়েছেন।'

* * *

বটগাছটার নীচে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন রামনারায়ণ। ভয়ে, দুশ্চিন্তায়, উদ্বেগে তিনি ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। গৃহিণী যা বলেছেন তার সামান্য অংশও যদি সত্যি হয়, তাহলে হয়তো মেয়েকে উদ্ধারের সামান্য আশা থাকলেও থাকতে পারে। আর যদি না হয়, ভাবতে ভাবতেই দাঁতে দাঁত লেগে গেল রামনারায়ণের।

একটু পর রামনারায়ণ লক্ষ্য করলেন চারিদিকটা কেমন যেন নিঝুম হয়ে আসছে। এমনিতেও এত রাতে বাঘার জঙ্গলের এত কাছে আসার কথা কেউ ভাবতেই পারে না, সে মানুষই হোক বা পশুপ্রাণী। কিন্তু তাও এতক্ষণ ধরে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝিরিঝিরি হাওয়া, দু'একটা রাতচরা পাখিদের ডাক, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ সেসব শুনতে পাচ্ছিলেন রামনারায়ণ। এবার তাও যেন ক্ষীণ হয়ে এল। রামনারায়ণ

অনুভব করলেন এই গ্রীষ্মরাতের হাওয়ার দল যেন বইতে বইতে হঠাতই এই বাঘার মাঠ পেরোতে ভুলে গেছে। রাতচরা পাখিদের টি টি শব্দ আর শোনা যায় না। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দও আর শোনা যায় না। সব কিছু যেন স্থির হয়ে গেছে।

একটু পর একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল রামনারায়ণের। এই গন্ধটা চেনেন রামনারায়ণ। আজই দুপুর বিকেল নাগাদ দুধপুকুরের রাস্তার পাশের ঝোপে এই গন্ধটা পেয়েছিলেন তিনি। দাঁতে দাঁত চেপে প্রস্তুত হলেন তিনি। আসছে, সে আসছে।

সে এল বটে, কিন্তু এমন ভাবে এল যে রামনারায়ণ প্রথমে হতচকিত হয়ে গেলেন। তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক তার সামনে মাঠের ধুলোয় হঠাৎ করেই যেন একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি হল। প্রথমে ক্ষীণ, তারপর ক্রমেই সেই ঘূর্ণিটা দ্রুত বড় হতে থাকল। আর কয়েক মুহূর্ত পর সেই ঘূর্ণি থেকেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল একটা লোক।

রামনারায়ণ মনে মনে এমনই কিছু আশঙ্কা করছিলেন। তাই খুব বেশি চমকালেন না তিনি। শুধু মনের সমস্ত আশঙ্কা, উদ্বেগ আর রাগ চেপে রেখে লোকটার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

লোকটার হাতে একটা মশাল। তার আলোয় বোঝা যাচ্ছিল যে তার বয়েস বেশি না, চল্লিশ-পঞ্চাশ হবে। তবে এই জাতীয় অঘোরী কাপালিকরা অলৌকিক উপায়ে আয়ুর্বৃদ্ধি রোধ করে রাখতে পারে বলে তিনি শুনেছেন। ফলে এর বয়েস আরও অনেক বেশি হলেও আশ্চর্য হবেন না রামনারায়ণ।

লোকটার একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, একমুখ দাড়িগোঁফ, একটা কালো ধুতি শাড়ির মতো করে পরা, আর কাঁধে একটা ঝোলা, গিরিসুন্দরী যেমন বলেছিলেন। লোকটা আবির্ভূত হয়েই ছদ্মবিনয়ের সঙ্গে সামান্য নীচু হয়ে বলল, 'পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই, ভালো আছেন?'

রামনারায়ণ ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে?'

লোকটা হেসে বলল, 'অধমের নাম ধাম না জানলেও হবে। তবে গিন্নিমা আমার পরিচয় ঠিক ভাবেই দিয়েছেন আশা করি।'

'কী চাও?'

লোকটা এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার হাবেভাবে সেই চেষ্টাকৃত বিনয়ের ভাব উধাও। সে আপনি থেকে সোজা তুমিতে নেমে এল। বলল, 'একটা কাজ করে দিতে হবে ঠাকুর।'

'কী কাজ?'

'তোমার অন্নদাতার ঘরে গোপনে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। প্রতাপনারায়ণের ঘরে যে সোনা জমা হয়েছে তা আমার চাই।'

রামনারায়ণের মাথা ঘুরে গেল। তিনি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন লোকটার দিকে। এ কি পাগল?

লোকটা গম্ভীর গলায় বলল, 'অবাক হচ্ছ কেন? ভাবছ এই কাজটা আমি নিজে কেন করতে পারব না? শোনো ঠাকুর, আমি বুঝতে পেরেছি যে প্রতাপনারায়ণ তার বাড়িতে কোনও এক তান্ত্রিক বা অঘোরী সন্ন্যাসীকে নিয়ে এসেছে। তাই ওই বাড়িতে আমার দৃষ্টিদর্পণ কাজ করছে না। তাই হয়তো সেখানে অনুপ্রবেশের পথেও বাধার সৃষ্টি হবে।

তোমাকে একটিই কাজ দিচ্ছি। আমি তোমাকে একটি মন্ত্রপূত জিনিস দেব। তুমি সেটি প্রতাপনারায়ণের কাছারিবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে কোথাও রেখে আসবে। এমন জায়গায় রাখবে যাতে কারও চোখে না পড়ে। বাকি কাজ আমি বুঝে নেব। আর হ্যাঁ, এর যদি অন্যথা হয় তাহলে কিন্তু তোমার মেয়েকে আর ফিরে পাবে না। কথাটা মাথায় থাকে যেন।'

রামনারায়ণ দাঁতে দাঁত ঘষে একটা অশ্রাব্য শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর বললেন, 'আমার মেয়ে যে সুস্থ আছে, বেঁচে আছে তার প্রমাণ কী?'

লোকটা হাতটা একবার নিজের ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে একটা শাড়ি বার করে আনল। সেটা দেখেই রামনারায়ণ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। শাড়িটা খপ নিজের হাতে টেনে নিয়ে পাগলের মতো তাতে মুখ ঘষতে ঘষতে অস্ফুটে উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'মঙ্গলা, মা আমার...'

লোকটা ভুরু কুঁচকে গেলেও কিছু বলল না। একটু পর গম্ভীর গলায় বললেন, 'শাড়িটা দাও ঠাকুর, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

রামনারায়ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শাড়ি ফেরত দিলেন। লোকটা শাড়িটা ঝোলায় ঢুকিয়ে অন্য কী যেন একটা বার করে আনল। সেটা রামনারায়ণের হাতে দিয়ে বলল, 'এই সেই জিনিস। আমার নির্দেশ যেন মাথায় থাকে। এমন জায়গায় রাখবে যেখানে চট করে কারও চোখ যাবে না। আর কাজটা কালই হওয়া চাই। মনে থাকে যেন।'

'আর আমার মেয়েকে কখন ফেরত পাব?'

'তুমি কাল মধ্যরাতে ঠিক এই সময় এই খানে দাঁড়াবে। তোমার মেয়েকে ফেরত দিয়ে যাব। আর মনে রাখবে, ঘুণাক্ষরেও যদি এই কথা কোথাও প্রকাশ পায়, মেয়েকে টুকরো টুকরো করে কেটে তোমার বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যাব।'

রামনারায়ণ একবার কেঁপে উঠলেন। তারপর হাতে ধরা জিনিসটা চোখের কাছে এনে বোঝার চেষ্টা করলেন জিনিসটা কী। রাতের অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। তার ওপর আজ কৃষ্ণ চতুর্দশী। তারার আলোতে যতটুকু দেখা যায় তাতে রামনারায়ণ বুঝলেন ওটি প্রাণীর মূর্তি, খুব সম্ভবত নেউলের। জিনিসটা তারার আলোতেও চকচক করছিল। রামনারায়ণ অনুমান করলেন মূর্তিটা খুব সম্ভবত সোনার।

মূর্তিটা হাতে ধরে মাথা তুললেন রামনারায়ণ। তাঁর সামনে কেউ নেই। লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

বাড়ির ফেরার রাস্তা ধরলেন রামনারায়ণ। এই বিপদের মধ্যেও একটা কথা মনে করে স্বস্তি পাচ্ছিলেন তিনি। মঙ্গলা ভালো আছে। অন্তত এখনও পর্যন্ত নিরাপদে আছে।

কারণ ওই শাড়িতে তাঁর মেয়ের গায়ের গন্ধ লেগে নেই। নিজের স্নেহপুত্তলির গায়ের গন্ধ খুব ভালো চেনেন ঠাকুরমশাই। শাড়িটা নকল, মায়াজাদুতে তৈরি।

* * *

কৃষ্ণানন্দ আর জাটিয়া জাদু জমিদারবাড়ির খিড়কি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন ভোর হচ্ছে। জমিদারবাড়ির কাজকর্ম সব ধীরে ধীরে

শুরু হল বলে। গ্রীষ্মের প্রভাতখানি বড় কোমল। মৃদুমন্দ হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছিল দুজনের দেহ।

জাটিয়া জাদু আর কৃষ্ণানন্দ, দুজনেই ব্রাহ্মমুহূর্ত শয্যাত্যাগ করেন। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে স্নান করেন। নিজের হাতে বাগান থেকে পুষ্পদল চয়ন করে ইষ্টদেবীর পূজায় বসেন। তারপর সামান্য প্রাতরাশ সেরে দৈনন্দিন কাজে মন দেন।

এখানে আসা অবধি তাঁদের সেই অভ্যাসের ব্যত্যয় ঘটেছে। তবে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ এবং স্নানের অভ্যাসটি তাঁরা ছাড়তে পারেননি। তারপর দুজনে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোন।

আজ তাঁরা প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে খিড়কির কাছে দাঁড়িয়ে সেদিনের সেই বিকট পায়ের ছাপটা দেখছিলেন। আজকাল দিনের বেলাতেও ভয়ে কেউ এদিকে আসে না। তাই ছাপটা অক্ষত আছে। দু'জনেই খুব মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন ছাপটাকে। কীসের ছাপ এটা?

জাটিয়া বললেন, 'কোনও অতিকায় বাঘ বা শিয়ালের পায়ের ছাপ নয় তো?'

কৃষ্ণানন্দ মাথা নাড়লেন, 'না জাটিয়া, এই অঞ্চলে অত বড় বাঘ বা শিয়াল থাকলে এরা নিশ্চয়ই জানতে পারত। তাছাড়া বাঘের সামনের পা আর পেছনের পা একই জায়গায় পড়ে, এ কিছুতেই বাঘ নয়। আর শিয়ালের পায়ের মাঝের দুটো আঙুলের ছাপ একটু এগিয়ে থাকে, বাকি দুটো আঙুলের ছাপ দু'পাশে, একটু নীচের দিকে। এরকম চার আঙুলের ছাপ একমাত্র কোনও অতিকায় চতুষ্পদ ছাড়া আর কারও পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। তার ওপর দেখছ সামনের দুই পা আর পিছনের দুই পায়ের মধ্যে তফাত কত?'

পাঁচিলের ওপর থেকে কে যেন হেসে বলল, 'দ্যুৎ, তোমরা কিচ্ছু জানো না।'

দুজনে মাথা তুলে দেখলেন পাঁচিলের ওপর একটা পাঁচ-ছ'বছরের ছেলে বসে জুলজুল করে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। জাটিয়া জাদু কপট রাগে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'কে রে তুই?'

ছেলেটা ফিক করে হেসে বলল, 'আমার নাম লখাই গো দাদু। আমি কালু ডোমের ছেলে।'

'নেমে আয়।'

লখাই বিনা বাক্যব্যয়ে অতি সহজে, প্রায় টিকটিকির মতোই দেওয়াল বেয়ে নেমে এল। জাটিয়া ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুই কী করছিলিস ওখানে?'

'আম পাড়ব বলে উঠেছিলাম গো ঠাকুর।'

'বটে? আর পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙলে?'

ছেলেটি অমলিন হাসল, 'আজ অবধি পড়িনি তো।'

অতীত সৌভাগ্যের নমুনা যে ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা নয় এরকম একটা বক্তব্য রাখতে গিয়েও থেমে গেলেন জাটিয়া জাদু। ইত্যবসরে কৃষ্ণানন্দ ছেলেটিকে কোমল স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ রে, এই যে দস্যিপনা করে বেড়াচ্ছিস, মা কিছু বলে না?'

ছেলেটি একগাল হেসে বলে, 'আমার মা নেই তো। মরে গেছে।'

কৃষ্ণানন্দ বুকে যেন একটা ধাক্কা খেলেন। কিছুক্ষণ স্থির চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর খিদে পেলে খাস কোথায়?'

'কেন, জমিদারবাড়িতে বলা আছে তো। রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই আমাকে খেতে দেয়।'

কৃষ্ণানন্দ নীচু হয়ে ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ভারী কোমলস্বরে বললেন, 'অমন করে 'আমার মা নেই' বলতে নেই রে বাপধন। যার মা নেই, তার স্বয়ং জগন্মাতা আছেন।'

জাটিয়া জাদু প্রকাশ্যে ভারী আপাতরুষ্ট, আপাতক্রুদ্ধ রূপ ধারণ করে চলেন। তিনি এই দুজনের অলক্ষ্যে উত্তরীয় দিয়ে নিজের চোখের কোণ মুছে চেষ্টাকৃত কর্কশস্বরে বললেন, 'বটে? তাহলে এমন ন্যাংটোপুঁটো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? জমিদারবাড়ি থেকে কোনও কাপড় দেয়নি?'

লখাইয়ের হাসি আরও চওড়া হয়, 'দিয়েছে তো। জমিদারমশাই একটা পুরনো ধুতি আমাকে দিয়েছে। আমি সেইটে দিয়ে স্নান করে গা মুছি, গরমকালে বিছানায় দিয়ে শুই, শীতকালে গায়ে জড়িয়ে ঘুমোই।'

জাটিয়া জাদু এবার হেসে ফেললেন। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এই ছোঁড়া, সত্যি করে বল তো, তুই জানিস এটা কোন প্রাণীর পায়ের ছাপ?'

লখাই একগাল হেসে বলল, 'ও মা, জানব না কেন গো ঠাকুর, ওপর থেকে দেখলেই তো বোঝা যায় এটা একটা মওওওস্ত বড় নেউলের পায়ের ছাপ।'

ভুরু কুঁচকোলেন কৃষ্ণানন্দ, 'তুই ঠিক বলছিস?'

'হ্যাঁ গো ঠাকুর। আমি তো বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। তাই ইঁদুর, নেউল, সাপ, শিয়াল সব্বার পায়ের ছাপ চিনি।'

'বটে?'

'হ্যাঁ গো ঠাকুর। আমি মেঠো ইঁদুর ধরতে পারি, আমি বাচ্চা নেউল ধরে পুষতে পারি, গর্তে হাত দিয়ে শিয়ালের বাচ্চার ল্যাজ টেনে বার করতে পারি, কচ্ছপের ডিম চুরি করতে পারি। আমি পায়ের ছাপ চিনব না?'

'হুম। রাতদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াস নাকি?'

লখাই আবার একগাল হাসে, 'হ্যাঁ গো ঠাকুর। আমার জঙ্গলে ঘুরতে খুব ভালো লাগে।'

'বাঘার জঙ্গলে?'

ছেলেটা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে একবার মৈত্রমশাইয়ের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। জাটিয়া জাদু মৃদু ধমক দিলেন, 'এই যে হ্যাঁ গো ঠাকুর, মুখে কুলুপ কেন এখন? বল!'

লখাই মিনমিন করে বলল, 'বাপ জানতে পারলে আস্ত রাখবে না, হাড় মাস আলাদা করে দেবে।'

'আচ্ছা কালুকে কিছু বলব না। এবার বল।'

লখাই ফিসফিস করে বলতে শুরু করল। দুজনে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন।

* * *

রামনারায়ণ সকালবেলা কাছারিবাড়ি পৌঁছে দেখলেন প্রতাপনারায়ণের কাছে একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক বসে আছেন। তবে ভদ্রলোক যে খুব উদ্বেগের মধ্যে আছেন বোঝা যায়। পোশাক অবিন্যস্ত, চুল উসকোখুসকো, চোখেমুখে হতভম্ব ভাব। প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'পণ্ডিতমশাই, এদিকে আসুন। আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হরিসাধন বন্দ্যঘটী, নিবাস তালকোঠরি গ্রাম।'

সঙ্গত কারণেই রামনারায়ণ সচকিত হলেন। প্রতাপনারায়ণ রামনারায়ণের পরিচয় দিতেই হরিসাধন দাঁড়িয়ে উঠে প্রতি নমস্কার করলেন। ধীরস্বরে বললেন, 'ওঁর নাম শুনেছি। ওঁর কন্যার সঙ্গেই আমার ছোট ছেলে শশিশেখরের একবার বিয়ের কথা হয়েছিল। কিন্তু এখন আর সে কথা বলে কী লাভ। যে সে কোথায় আছে, কেমন আছে, বেঁচে আছে কি নেই...' বলতে বলতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন হরিসাধন।

রামনারায়ণ উদ্বিগ্নস্বরে বললেন, 'সে কী? কী হয়েছে বাবাজীবনের?'

প্রতাপনারায়ণ গম্ভীরমুখে বললেন, ' শ্রীমান শশিশেখর আমার কাছে আসছিলেন একটা বৈষয়িক কাজে। কিন্তু তিনি এসে পৌঁছননি।'

রামনারায়ণ বললেন, 'কেন? পৌঁছননি কেন?'

প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'সেটাই তো গভীর চিন্তার বিষয়। বাবাজীবনের যেদিন এসে পৌঁছনোর কথা তার একদিন পরেও না পৌঁছতে আমি বন্দ্যঘটী মশাইয়ের বাড়িতে পাইক পাঠানোর বন্দোবস্ত করছিলাম। কিন্তু তার আগেই ইনি স্বয়ং এসে উপস্থিত। বাকিটা না হয় এঁর মুখ থেকেই শুনে নিন।'

হরিসাধন ভগ্নস্বরে বললেন, 'কাল সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে এক ভিক্ষুক এসে উপস্থিত। সে প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমার কাজের লোকজন তাকে হটিয়ে দিতে চাইলেও সে বার বার বলতে থাকে 'তোমাদের প্রভুকে বলো তাঁর সামনে ভারী বিপদ। তাঁর ভালোর জন্যই আমার সঙ্গে তাঁর দেখা করা একান্ত প্রয়োজন।' ফলে তাকে আটক করে আমার সামনে নিয়ে আসা হয়। আমার সামনে সে বলে তাকে নাকি

কোন এক অঘোরী কাপালিক পাঠিয়েছে আমাকে একটি বার্তা দিতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী সেই বার্তা।'

রামনারায়ণের বুক কাঁপছিল দুরু দুরু। তিনি বুঝতে পারছিলেন এরপর কী কথা বলবেন হরিসাধন।

'লোকটা বলল, কোন এক কাপালিক ডাকাত নাকি তার দলবল নিয়ে আমার ছেলে আর তার সঙ্গে থাকা পাইক বরকন্দাজদের বাঘার জঙ্গলে বন্দি করে রেখেছে। অন্তত বিশ তোলা সোনা না পেলে তারা সবাইকে বলি দিয়ে পিশাচ বানিয়ে রাখবে।'

প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'আর আপনি সেটা বিশ্বাসও করলেন?'

হরিসাধন কাতর স্বরে বললেন, 'এই প্রশ্ন তাকে আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন সে তার ঝোলা থেকে একটি ফতুয়া আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা চিনতে পারেন?'

আমি দেখামাত্র চিনতে পারি যে এই সেই ফতুয়া যা পরে আমার ছেলে মুরুটিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। ফলে তাকে অবিশ্বাস করার আর পথ রইল না।'

রামনারায়ণ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'লোকটাকে কেমন দেখতে ছিল?'

হরিসাধন বললেন, 'একজন রুগ্ন দরিদ্র লোক। রোগা পাকানো চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল আর সারা মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। খালি গা আর নীচে একটা কালো কাপড় শাড়ির মতো করে পরা কাঁধে একটি ঝোলা।'

রামনারায়ণ অন্তর থেকে কেঁপে গেলেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

প্রতাপনারায়ণ অসহিষ্ণুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটাকে ধরে রাখলেন না কেন? ওকে চাপ দিলেই তো আরও অনেক কিছু জানা যেত।'

'সেই ফতুয়াটা দেখানোর সময় আমার গৃহিণী সামনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ওটা দেখে এমন শোরগোল তুললেন যে বাকি সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। সেই সুযোগে লোকটা উধাও হয়ে গেল।'

প্রতাপনারায়ণ চিন্তার সুরে বললেন, 'এ তো ভারী চিন্তার বিষয়। এতদিন জানতাম এরা শুধু চুরি ডাকাতি করছে। এখন তো দেখছি অপহরণ

করে টাকা আদায়েরও পথ ধরেছে। এ তো ভারী উৎপাত হল দেখছি।'

হরিসাধন কাতরসুরে বললেন, 'ওই বাঘার জঙ্গল আপনার জমিদারির মধ্যেই পড়ে। আপনি এর একটা বিহিত করুন জমিদার মশাই, যে করে হোক আমার ছেলে আর বাকিদের ছাড়িয়ে আনুন।'

প্রতাপনারায়ণ চিন্তিতমুখে বললেন, 'সেটাই তো আমারও শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী যে করি কিছু মাথায় ঢুকছে না।'

হরিসাধন তাঁর ঝুলি থেকে বিস্তর সোনার গয়না আর মোহর বার করলেন। সেই দেখে রামনারায়ণের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। হরিসাধন হাত জোড় করে বললেন, 'আপাতত এইগুলো আপনার কাছে গচ্ছিত রাখুন জমিদারমশাই। যদি ছেলেকে ফেরত পাই, তাহলে আপনার কেনা হয়ে থাকব।'

প্রতাপনারায়ণ হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'আবার যদির কথা উঠছে কেন। ওদের চাহিদামতো সোনা তো নিয়েই এসেছেন। এবার কীভাবে ওটা ওদের হাতে দিয়ে আপনার ছেলে আর বাকিদের উদ্ধার করে আনা যায় সেইটে দেখতে হবে।' এই বলে তিনি নায়েবমশাই আর খাজাঞ্চিকে আসতে বললেন সোনা গুনেগেঁথে তুলে রাখার জন্য। রামনারায়ণও মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। পুজোর দেরি হয়ে যাচ্ছে।

* * *

নিজের ঘরে বসে চুপচাপ ধ্যানে বসেছিলেন জাটিয়া জাদু। কৃষ্ণানন্দ তাঁর পাশে বসে কী যেন ভাবছিলেন। চোখ দুটি মুদ্রিত। ভ্রু দুখানি কুঞ্চিত। একমনে কী যেন ভেবে চলেছেন তিনি।

একটু পর জাটিয়ার ধ্যান ভাঙল। তিনি ঘটি থেকে সামান্য জল খেলেন। তারপর বললেন, 'কী এত ভাবছ কৃষ্ণানন্দ?'

কৃষ্ণানন্দ আপন মনে বললেন, 'ভাবছি তো অনেক কিছুই বন্ধু, কিন্তু কোনও কূলকিনারা পাচ্ছি না।'

'যেমন?'

'যেমন ধরো যেখান থেকে সর্বমঙ্গলাকে অপহরণ করা হয়েছিল

সেখানে সোনার ধুলো পড়েছিল। কেন? পথের মাঝে এত সোনার ধুলো এল কী করে? আবার ডাকাত সর্দারের সোনা চাই, অনেক সোনা। শুধু সোনা কেন? এ কেমন ডাকাত যে শুধু সোনা লুট করে? অত বড় দল, অথচ আজ অবধি তাদের চাল ডাল আনাজ মশলা কিছু ডাকাতি করতে দেখা গেল না কেন? তারা খায় কী? শুধু বনের ফলমূল?

এদিকে আবার জমিদারবাড়ির পিছনে এক মস্ত বড় নেউলের পায়ের ছাপ। ভৌতিক নেউল। যে কি না অকস্মাৎ বিশাল বড় হতে পারে আবার ছোটও হতে পারে। আবার দরকার হলে ছায়াশরীরও ধারণ করতে পারে।'

'তুমি কি নিশ্চিত যে ওটা নেউলেরই পায়ের ছাপ?'

'হ্যাঁ জাটিয়া, আমি নিশ্চিত যে লখাই ঠিকই বলেছে। আমরা বড়রা অনেক সময় সামনে থাকা একটা সহজ জিনিস সহজে বুঝতে চাই না। কারণ আমাদের সেই দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়, আমাদের সংস্কার, আমাদের চেতনা, আমাদের বিশ্বাস অত্যন্ত সাধারণ জিনিসকেও বিচারের দৃষ্টিতে দেখতে শেখায় বিচার মানেই সন্দেহ, অবিশ্বাস। শিশুদের সেই সংস্কার জন্মায় না। তাই তারা খোলা মনে একটা জিনিসকে দেখতে শেখে, বুঝতে শেখে। আজকের ঘটনাটাই ভাবো না কেন। আজ যদি তুমি ওই পাঁচিলের ওপর বসে পায়ের ছাপটা দেখতে, তাহলে কি অমন অনায়াসে বলতে পারতে যে ওটা একটা মস্ত বড় নেউলের পায়ের ছাপ? পারতে না। কারণ তোমার সংস্কার তোমাকে বাধা দিত, তোমাকে বলত যে 'অত বড় নেউল হয় না, হওয়া সম্ভব নয়।' অথচ লখাই কিন্তু কী অবলীলায় বলে দিল যে ওটা একটা মস্ত নেউলের পা। কারণ তার জ্ঞান নির্মল, তার অনুভব নিষ্কলঙ্ক। সে সহজ জিনিসকে সহজ কল্পনায় দেখতে পারে।'

'বুঝলাম, ছাত্র পড়িয়ে জ্ঞানদানের অভ্যেসটি ভালোই আয়ত্ত করেছ। তা বাপু, এবার বলো দেখি এতগুলি সূত্র জুড়ে তুমি কী আবিষ্কার করলে?'

কৃষ্ণানন্দ অন্যমনস্কভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'ডাকাত সর্দারের দরকার সোনা, শুধু সোনা। ওদিকে পথে পড়ে আছে সোনার ধুলো। এদিকে জমিদার বাড়ির খিড়কিদুয়ারে হানা দিচ্ছে বিশালদেহী এক ছায়ানেউল। সে অলৌকিক,

অশরীরী। সর্দার এমন এক ডাকাতদল বানিয়েছে যাদের খাবার-দাবারের প্রয়োজন হয় না। তারা কারা?'

কৃষ্ণানন্দ ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর পদবিক্ষেপ বাড়তে লাগল। জাটিয়া জাদু ঢুলুঢুলু চোখে বন্ধুকে দেখতে লাগলেন। কৃষ্ণানন্দকে দেখে মনে হল কী যেন একটা ধরতে চেয়েও ধরতে পারছেন না। তাঁকে ক্রমে আরও বিচলিত এমন ক্ষিপ্ত দেখাতে লাগল।

একটু পর কাজের মেয়েটি তাঁদের প্রাতরাশের জন্য ডাকতে এল। মেয়েটি পূর্ববঙ্গীয়, কথায় ওদেশের টান প্রবল। জাটিয়া জাদু তার সঙ্গে কথা বলে ভারী কৌতুক অনুভব করেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আজ কী আছে রে জলখাবারে?'

মেয়েটি একগাল হেসে বলল, 'লুসি হইসে, মুহনভোগ হইসে, সন্দেশ হইসে...'

'আর ফলের মধ্যে?'

'আম আসে, জাম আসে, জাম্বুরা আসে...'

ত্বরিতে ঘুরে দাঁড়ালেন কৃষ্ণানন্দ, 'কী আছে বললে?'

জাটিয়া জাদু বোঝাতে প্রবৃত্ত হলেন, 'আরে বাতাবি লেবুকে ওরা জাম্বুরা বলে।'

কৃষ্ণানন্দ বিস্ফারিত চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, 'অ ঠাউর, হইলডা কী? অমন কইরা খাড়ায়া রইলা ক্যান?'

কৃষ্ণানন্দর কানে যেন কিছুই পৌঁছল না। তিনি সদ্য সুপ্তোত্থিতর মতো বলতে লাগলেন, 'তাই তো, তাই তো। সোনার ধুলো... সোনা...নেউল... সোনার নেউল... সোনার নেউল...'

বলতে বলতে তিনি জাটিয়া জাদুর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন, 'বুঝে গেছি জাটিয়া, সব বুঝে গেছি। তুমি লখাইকে ডাকো। ওকে আমাদের লাগবে। আর তুমি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও।'

* * *

এখানে খাবার ব্যবস্থা বলতে বনের ফলমূল আর মধু। কিন্তু সর্বমঙ্গলার গলা দিয়ে সেসব নামছিল না। সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ভয় আর উদ্বেগ। আর তার সঙ্গে তার আরও একটা অসুবিধা হচ্ছে।

যে স্বপ্নটা সে কয়েকরাত ধরেই দেখছিল, সে এখন দিনমানেও হানা দিচ্ছে। সর্বমঙ্গলার গুলিয়ে যাচ্ছে কোনটা স্বপ্ন আর কোনটা সত্যি। কখন যে তার চোখের সামনে এই পৃথিবীটা মুছে গিয়ে ওই সাঙ্ঘাতিক স্বপ্নটা জেগে উঠবে সে নিজেও জানে না। আর এটা শুরু হয়েছে ওই ছেলেটিকে দেখার পর।

ছেলেটিকে বেশ দেখতে। কেমন ঢলোঢলো চোখ, আর গায়ের রং তো কাঁচা সোনার মতো। কিন্তু হলে কী হবে, মঙ্গলা জানে ওর আয়ু আজ রাত পর্যন্ত। ভাবতেই মনটা হু হু করে উঠল মঙ্গলার। আহা রে, নিজের বাপ-মাকে আর দেখতে পাবে না ছেলেটা।

ভাবতে ভাবতেই স্বপ্নটা ফের একবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। কী যে হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছে না সে। এমন তো কখনও হয়নি ওর।

অন্য এক কুটিরে বিষণ্ণ মুখে বসেছিল রঘু আর শশিশেখর। তাদের সামনে কিছু ফল আর পাতার ডোঙায় করে রাখা মধু। কিন্তু কেউই মুখে তোলেনি সেই খাবার।

রঘু ছলোছলো কণ্ঠে বলল, 'ছোটকত্তা, এই তাহলে শেষ?'

মাথা নাড়ল শশিশেখর। দুদিন ধরে শুধু তার নিজের বাবা-মায়ের কথা, নিজের বাড়ির কথা, গ্রামের কথা মনে পড়ছে। এইভাবে জীবন শেষ হবে জানলে সে হয়তো আরেকটু ভালোবাসত সবাইকে। আরেকটু জড়িয়ে থাকত সবার সঙ্গে। কত মায়া, কত ভালোবাসা, কত কিছুই না ফেলে চলে যেতে হচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শশিশেখর, 'বাকিরা কোথায়?'

'সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাদের খাবারে কী মিশিয়ে দিচ্ছে সর্দার কে জানে। সারাদিন শুধু ঘুম আর ঘুম।'

থাক, ওরা ঘুমোক। আজকের রাতটাই তো। তারপর তো চিরঘুম।

মেয়েটির কথা মনে পড়ল শশিশেখরের। আহা, বড় মিষ্টি দেখাতে মেয়েটিকে, যেন সাক্ষাৎ মা সরস্বতী। শশিশেখর তো মরে গিয়ে বেঁচে যাবে, কিন্তু ওই মেয়েটা? তাকে তো সারা জীবন দগ্ধে দগ্ধে মরতে হবে।

শিরদাঁড়া সোজা করে ধ্যানে বসল শশিশেখর। এই তার জীবনের শেষ ধ্যান, শেষ পূজা। চোখ বন্ধ করে সে আবৃত্তি করতে লাগল, 'প্রভুমীশ-মনীশমশেষগুণং, গুণহীন-মহীশ-গণাভরণম্। রণ-নির্জিত দুর্জয়-দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্...'

একটু পর কুটিরের দরজা ঠেলে ঢুকল একজন পিশাচডাকাত। তার হাতে একটি শালপাতার ডোঙা। তাতে কিছু সবুজ রঙের তরল ভাসছে। সে ডোঙাটি শশিশেখরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'খেয়ে নাও, সর্দারের আদেশ।'

* * *

রামনারায়ণ একটু খোঁজাখুঁজি করতেই সোনার নেউলের মূর্তিটা লুকোনোর জায়গা পেয়ে গেলেন। মায়ের মূর্তির পায়ের কাছে একটা বড় ঘট স্থাপিত আছে। প্রতিদিন তার জল বদলানো হয়। আর সে কাজটা রামনারায়ণই করেন। একমাত্র তিনি ছাড়া ওই ঘট ছোঁয়ার অধিকার আর কারও নেই।

রামনারায়ণ অতি সন্তর্পণে সেই ঘটের মধ্যে নেউলের মূর্তিটা ডুবিয়ে রাখলেন। তারপর সজল চোখে হাত জোড় করে মা'কে বললেন, 'সন্তানের অপরাধ নিও না মা। যা করছি নিজের মেয়ের প্রাণ বাঁচাবার জন্য। যদি মেয়েকে ভালোয় ভালোয় ফিরে পাই, বুকের রক্ত দিয়ে তোমার কাছে প্রায়শ্চিত্ত করে যাব মা।'

রামনারায়ণ পুজো শেষ করে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির পথ ধরলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল যেন কোনওভাবেই মৈত্রমশাই বা জাটিয়াবাবার সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়। সেই অস্বস্তি এড়াবার জন্যই এত তাড়া।

বাঘার জঙ্গল পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর। ওদিকে একবার তাকিয়েই বুকটা

ছ্যাঁত করে উঠল রামনারায়ণের। ওর মধ্যেই কোথাও বন্দি হয়ে আছে তাঁদের মেয়ে। কে জানে সে কেমন আছে কী খাচ্ছে, সুস্থ আছে কি না। ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখদুটি জলে ভরে এল। আর বোধহয় সেই জন্যই তাঁর সামনে পথের ওপর ক্রমশ গড়ে ওঠা ধুলোর ঝড়টা তিনি দেখতে পেলেন না।

রামনারায়ণ চোখের জল মুছে দেখলেন তাঁর সামনে ডাকাত সর্দার দাঁড়িয়ে। তিনি আশ্চর্য বা অবাক হলেন না। শুধু স্তিমিতকণ্ঠে বললেন, 'আমি আমার কাজ করে এসেছি। ওই নেউলের মূর্তিটাকে এমন জায়গায় রেখেছি যে কেউ খুঁজে পাবে না।'

সর্দার দাড়িগোঁফের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে একটু হাসল। প্রসন্নস্বরে বলল, 'এই তো চাই। কোথায় রেখেছ ওটাকে?'

'মা কিরীটেশ্বরীর সামনে যে ঘট আছে, তার মধ্যে।'

'চমৎকার। এবার তোমার ছুটি, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো। ঠিক মধ্যরাত্রে এখানে আসবে। তোমার মেয়েকে তুমি ফেরত পেয়ে যাবে।'

রামনারায়ণ কিছু বললেন না। ডাকাত সর্দারকে এড়িয়ে পথ চলতে শুরু করলেন। ডাকাত সর্দার নীচু হয়ে মাটি থেকে কিছু ধুলো কুড়িয়ে নিল। তারপর বিড়বিড় করে তাতে কিছু মন্ত্র পড়ে ডাকল, 'ঠাকুর, শোনো।'

রামনারায়ণ ঘুরে দাঁড়ালেন।

* * *

'সমগ্র হিন্দু এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে একমাত্র একজনই দেবতা আছেন, যাঁর বাহন হচ্ছে নেউল।'

প্রতাপনারায়ণ আর কৃষ্ণানন্দ একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপন বৈঠকে বসেছিলেন। ঘরের বাইরে কালু ডোম নিজে পাহারা দিচ্ছে। এখন কারও এই ঘরে ঢোকা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। জাটিয়া জাদু এই বৈঠকে নেই। তাঁকে কৃষ্ণানন্দ পাঠিয়েছেন অন্য কোনও কাজে।

'সেই দেবতা হচ্ছেন জম্ভল। ইনি ধনরত্নাদির অধিপতি। জম্ভলদেবের উপাসনা করলে এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত হলে অতুল বৈভবের অধিকারী হওয়া যায় এঁর সঙ্গে হিন্দুদেবতা কুবেরের প্রভূত সাদৃশ্য আছে।

জম্ভলদেবের হাতে একটি নকুল, মানে নেউল থাকে। দেব প্রসন্ন হলে সেই নকুলের ওপর চাপ দেন, আর নকুলটি বিভিন্ন ধনরত্ন উদগীরণ করে।

সহজে ধনবান হতে চাওয়া বৌদ্ধদের মধ্যে একসময় জম্ভলদেবের পূজা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। দলে দলে বৌদ্ধরা 'ওঁ জম্ভলজলেন্দ্রায় স্বাহা' বলে জম্ভলদেবের পূজায় আহুতি দিতেন।

এই জম্ভলদেবের একটি ক্রোধী এবং ক্রূররূপ আছে, যার নাম উচ্ছুষ্মজম্ভল, বা ডিম্ভ। অনেকে কৃষ্ণজম্ভলও বলে। ইনি অত্যন্ত ক্রূর এবং অশুদ্ধতার প্রতিমূর্তি। উচ্ছুষ্মজম্ভলের আকৃতি পঞ্চমবর্ষীয় কুমারের মতো। দেবমূর্তি উলঙ্গ, সর্পাবরণে ভূষিত, বদনমণ্ডলটি ক্রোধী এবং দুখানি উগ্র শ্বদন্তে শোভিত। ইনি প্রত্যালীঢ় পদে কুবেরকে পদদলিত করেন এবং কুবেরের মুখ হতে ধনরত্নাদি উদগীরণ করান। উচ্ছুষ্মজম্ভলের লিঙ্গটি ঊর্ধ্বমুখী, তিনি বুকের কাছে ধরা একটি রক্তপূর্ণ নরকপালের দিকে ত্রিনয়নে দৃষ্টিপাত করে থাকেন। অন্য হাতে একটি নকুল বা নেউল। তাকে চাপ দিলে সেও ধনরত্নাদি উদগীরণ করে।

উচ্ছুষ্মজম্ভলের উদ্ভব এই দেশে নয়, সুদূর মহাচিনে। আজ থেকে দেড়শো-দুশো বছর আগে ভোটদেশীয় বৌদ্ধরা এই দেবতার পূজা শুরু করেন। আগেই বলেছি ইনি অশুদ্ধ বা অবৈধ উপায়ে ধনপ্রাপ্তির দেবতা। আর এই অশুদ্ধ উপায়ের মধ্যে একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে নরবলি, আরও ভালো করে বলতে গেলে শিশুবলি।'

প্রতাপনারায়ণ শিউরে উঠলেন কথাটা শুনে।

'আমি নিশ্চিত এই ডাকাতদলের যে নেতা সে এই উচ্ছুষ্মজম্ভলের সেবক। সে অবশ্যই মহাচীনে গিয়ে সে উচ্ছুষ্মজম্ভলের সাধনায় প্রচুর সিদ্ধিলাভও করেছে। তাই সে তার ইচ্ছেমতো যখন তখন নেউলের রূপ ধারণ করতে পারে, সে নেউল ভৌতিক হোক বা সোনার। আর সেই জন্যেই তার এত সোনার প্রয়োজন। এত ডাকাতি, অপহরণ সেই জন্যেই।'

ভ্রুকুটি করলেন প্রতাপনারায়ণ, 'কথাটা কি খুব যুক্তিসঙ্গত বললেন মৈত্রমশাই? বলি সে যদি সিদ্ধিলাভ করেই থাকবে তাহলে আর এত

কিছু করছে কেন? সে তো তার ঠাকুরের কাছে চাইলেই ইচ্ছেমতো ধনরত্ন পেতে পারে।'

'না প্রতাপবাবু,' মাথা নাড়লেন, 'সাধনার চূড়ান্ত সিদ্ধি তার প্রাপ্ত হয়নি। তাই তো সে এত সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কারণ উচ্ছৃঙ্খজন্তুলের সাধনায় চূড়ান্ত সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের। এক, ইষ্টদেবতার একটি সম্পূর্ণ সোনার তৈরি মূর্তি। দুই, সেই মূর্তির সামনে নরবলি, নরবলির রক্তে মূর্তিকে স্নানাভিষেক করা এবং তিন, সেই বলিরক্তলিপ্ত মূর্তির সামনে এক অক্ষতযোনি ব্রাহ্মণবালিকার সঙ্গে সাধনসম্ভোগ।'

এবার সত্যিই চমকে উঠলেন প্রতাপনারায়ণ। তিনি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলেন, 'কী বলছেন কী মৈত্রমশাই তাহলে কি...'

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন কৃষ্ণানন্দ মৈত্র, 'হ্যাঁ প্রতাপবাবু। সেই উদ্দেশ্যেই হরিসাধনের কনিষ্ঠ পুত্রকে অপহরণ করা হয়েছে। এক লপ্তে অনেকটা সোনা পাওয়া যাবে বলে। আর বলি দেওয়ার জন্য তো বটেই। আর ঠাকুর মশাইয়ের মেয়েকেও সেই উদ্দেশ্যেই অপহরণ করেছে শয়তানটা। সেই হতভাগীর সঙ্গেই সাধনসম্ভোগ করতে চায় সে।'

আবার চমকে উঠলেন প্রতাপনারায়ণ, 'ঠাকুরমশাইয়ের মেয়েও অপহৃতা হয়েছে? কই, এ ব্যাপারে তো কখনও কিছু শুনিনি।'

কৃষ্ণানন্দ গম্ভীরমুখে বললেন, 'পরিস্থিতি যেভাবে ঘোরালো হয়ে উঠেছে তাতে কথাটা এবার আর চেপে রাখা যাচ্ছে না প্রতাপ। আমাদের মনে হয় এবার আপনাকে সবটা জানানো উচিত।'

পরের কয়েক দণ্ড ধরে কৃষ্ণানন্দ বলে গেলেন রামনারায়ণের মেয়ের অপহৃত হওয়ার সমস্ত বৃত্তান্ত। প্রতাপনারায়ণ সবকিছু শোনার পর সবিস্ময়ে বললেন, 'আশ্চর্য, এত বড় একটা ঘটনা, আর ঠাকুরমশাই আমাকে বলার প্রয়োজন অবধি বোধ করলেন না? তিনি কি আমাকে এতটাই অবিশ্বাস করেন?'

'প্রশ্নটা বিশ্বাসের-অবিশ্বাসের নয় জমিদারমশাই। আপনি একবার তাঁর

দিকটাও বুঝুন। তিনি লোকলজ্জার, সমাজস্থিতির ভয় পাচ্ছেন। এই আচরণ কি তাঁর পক্ষে খুব অস্বাভাবিক?'

প্রতাপনারায়ণ সন্তানহীন। তিনি নিজের বাড়ির বিভিন্ন উৎসবে সর্বমঙ্গলাকে কয়েকবার দেখেছেন। তাঁর পিতৃহৃদয় ক্রমেই ক্রুদ্ধ এবং তপ্ত হয়ে উঠল। তিনি প্রস্তরকঠিনমুখে বসে রইলেন।

একটু পর কালু ডোম উঁকি দিয়ে বলল, 'ঠাকুরমশাই এসেছেন প্রভু। আপনার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে চাইছেন। নিয়ে আসব?'

দুজনেই চমকিত হলেন। প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'সে কী? উনি পুজো করে বাড়ি চলে গেছিলেন না?'

'সে তো গেছিলেন। আবার ফিরে এসেছেন। আর খুব কান্নাকাটি করছেন। তাঁর নাকি কী একটা ভীষণ বিপদ ঘটেছে, আপনার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে চান।'

দুজনে একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'আচ্ছা, আসতে বল।'

মুহূর্তখানেক পর রামনারায়ণ মিশ্র ঝড়ের মতো ঢুকে এসে সোজা প্রতাপনারায়ণের পায়ে পড়ে গেলেন, 'বাবা প্রতাপ, তুমিই আমাদের রক্ষক, আমাদের প্রতিপালক। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ধর্ম রক্ষা করো বাবা, যেভাবে হোক আমাকে কন্যাকে উদ্ধার করো।'

* * *

জাটিয়া জাদু প্রাতরাশ শেষ করেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বনে বাদাড়ে। সঙ্গে লখাই। সে ভারী কৌতুকের সঙ্গে বুড়ো মানুষটার আদেশ পালন করে যাচ্ছিল। আজ অবধি এমন এমন অদ্ভুত জিনিস খুঁজতে আর কাউকে দেখেনি সে। যেমন মেঠো ইঁদুরদের গর্তে জমানো ধান, বাজপড়া অশ্বত্থের মূল, যজ্ঞডুমুর গাছের ডাল, এইসব। লখাইয়ের অবশ্য তাতে অসুবিধা নেই। এমনিতেই সে টই টই করে এই গাঁ, সেই গাঁ, গ্রাম বন জঙ্গল আদাড় বাদাড় ঘুরে বেড়ায়। কোথায় গেলে এসব পাওয়া যাবে সে তার নখদর্পণে। সে জিজ্ঞেস করল, 'এসব দিয়ে কী হবে ঠাকুর?'

জাটিয়া বললেন, 'সবকিছুরই দ্রব্যগুণ বলে একটা জিনিস থাকে রে লখাই। মহামায়ার লীলায় সেই দ্রব্যগুণ আচ্ছাদিত হয়ে থাকে, ছাইঢাকা আগুনের মতো। শুধু বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কোনও ঘটনা ঘটলে সেই মায়ার আচ্ছাদন সরিয়ে বস্তুর দ্রব্যগুণ প্রকট হয়ে পড়ে। তখন সে আর সাধারণ বস্তু নয় রে লখাই, বড় কাজের জিনিস হয়ে দাঁড়ায় এবার একটা জিনিস বল তো বাপধন আমার, এ অঞ্চলে এমন কোনও নিম গাছ আছে, যার ডালে কাক বাসা বেঁধেছে?'

মাথা নাড়ল লখাই, আছে বই কি এমন নিমগাছ। চণ্ডীপুরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বারুণী নদী। যেখানে বারুণী বাঁক নিয়ে পুবমুখী হয়েছে, সেখানে একটি ছোট পরিত্যক্ত শ্মশান আছে। আর সেই শ্মশানের একেবারে গা ঘেঁষেই সেই মস্ত বড় নিমগাছ। তবে অসুবিধা একটাই। ওই শ্মশানের পরেই শুরু হচ্ছে বাঘার জঙ্গল। তাই কেউ ওখানে বিশেষ যায় না।

চোখ চকচক করে উঠল জাটিয়া জাদুর, 'শ্মশানের নিমগাছ? সে তো আরও ভালো। চল চল বাবা, পা চালিয়ে চল।'

পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল। বারুণীর বুক একেবারে শুকনো খটখট করছে। বিশাল নিমগাছটির দিকে তাকিয়ে বুক দমে গেল জাটিয়া জাদুর। এই গাছে ওঠা কি সহজ ব্যাপার?

লখাই বোধহয় বুঝতে পারল বুড়ো মানুষটার মনের আশঙ্কা। সে একগাল হেসে বলল, 'কী গো ঠাকুর, ভয় পেলে নাকি? ভাবছ লখাই পারবে কি না? আচ্ছা বলো, কী আনতে হবে কাকের বাসা থেকে?'

'হাড়। কাকে তুলে এনেছে এমন যে কোনও প্রাণীর হাড়।'

জাটিয়া জাদুকে বিস্মিত করে ওই একরত্তি ছেলেটা তরতর করে উঠে গেল গাছে। ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'কী গো ঠাকুর, ওপরে আসবে নাকি?'

জাটিয়া উত্তর দিতে যাবেন, এমন সময় একটা হাওয়ার স্রোত জঙ্গলের ভেতর থেকে পাক খেতে খেতে বেরিয়ে বারুণীর বুকে মিলিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পচা ভ্যাপসা গন্ধ ধাক্কা মারল তাঁর নাকে। উত্তরীয়টা

দিয়ে নাক ঢাকলেন জাটিয়া জাদু। কীসের গন্ধ এটা?

একটু একটু করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো জঙ্গলের দিকে হাঁটাতে শুরু করলেন জাটিয়া জাদু। বাঘার জঙ্গল বিশাল এবং অত্যন্ত ঘন জঙ্গল। মস্ত বড় গাছ আর তাদের গা জড়িয়ে ওঠা ঝাঁকড়া লতাগুল্ম, ঝোপঝাড়, এসবের ভিতরে নজর চলে না। তিনি পায়ে পায়ে একটা মস্ত গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন।

এরই মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে ওই পিশাচ সর্দার আর তার দলবল। ধরে নিয়ে রেখেছে একটা ফুটফুটে মেয়ে, আর কয়েকজন নির্দোষ মানুষকে। কোথায় আছে তারা? জঙ্গলের কোন গহীনে?

আস্তে আস্তে নিজের হাতটা বাড়িয়ে সামনের গাছটা ধরতে গেলেন জাটিয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল একটা উত্তপ্ত আগুনের হল্কা তড়িৎগতিতে তাঁর শরীর ছুঁয়ে গেল যেন। ঝটিতি হাত সরিয়ে নিলেন জাটিয়া জাদু।

কীসের বন্ধন করে রেখেছে পিশাচ সর্দার? কত বড় তান্ত্রিক সে যে এত বড় একটা মস্ত জঙ্গলকে বেঁধে রাখতে পারে?

নীচু হয়ে একমুঠো ধুলো হাতে নিলেন জাটিয়া। তারপর ছুঁড়ে দিলেন জঙ্গলের দিকে। আর তারপরেই তাঁর সামনে এক আশ্চর্য দৃশ্যের অবতারণা হল। মনে হল যেন কোনও এক অদৃশ্য আগুনের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে জ্বলে উঠল ধূলিকণাগুলি। জ্বলে উঠল তাদের প্রতিটি অণু পরমাণু।

থমকে গেলেন জাটিয়া। তিনি নিজেও তন্ত্রশাস্ত্রে মহারথী। কিন্তু এমন অসম্ভব অচ্ছেদ্য ভূমিবন্ধন তাঁরও স্বপ্নেরও অগোচর। কে এই পিশাচ সর্দার?

যেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতেই জঙ্গলের ভেতর শনশন শব্দে জেগে উঠল ঝোড়ো হাওয়া। মনে হল জঙ্গলের মধ্যে যেন মাতম লেগেছে। আর সেই সেই বিক্ষুব্ধ ঝড় মুহূর্তের মধ্যেই প্রলয়ের শিঙা বাজিয়ে দিল জঙ্গলের মধ্যে। তার সঙ্গেই জেগে উঠল এক অশরীরী হাহাকারের কান্না। জাটিয়া জাদুর মনে হল যেন শত সহস্র বন্দি, অবরুদ্ধ, শৃঙ্খলিত আত্মার

দল কেঁদে চলেছে উচ্চৈস্বরে। আর তাদের সেই কান্নার স্বর যেন রক্ত আর বেদনার স্রোত হয়ে মিশে যেতে লাগল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে। তাদের সেই আর্তি, হাহাকারের শব্দ যেন জ্বলন্ত লোহার মতো তাঁর কানে ঢেলে দিতে লাগল কেউ।

পিছিয়ে এলেন জাটিয়া জাদু। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন বাঘার জঙ্গলের দিকে। কোন পৈশাচী শক্তি অধিকার করে রেখেছে এই অরণ্য?

কোমরে একটা খোঁচা খেলেন জাটিয়া। দেখলেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাঁকে দেখছে লখাই। সে জিজ্ঞেস করল, 'ও ঠাকুর, এখানে অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'তুই কিছু শুনতে পাচ্ছিস লখাই?'

'কই? না তো ঠাকুর।'

নিজেকে সামলে নিলেন জাটিয়া। এই ঝড়, এই কান্নার শব্দ বোধহয় তাঁর মতিভ্রমই হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু পেলি কাকের বাসায়?'

লখাই তার হাতের মুঠি মেলে ধরল। আর সেই মুঠিতে ধরা জিনিসদুটি দেখে কেঁপে উঠলেন জাটিয়া জাদু।

লখাইয়ের প্রসারিত হাতের মুঠোয় ধরা আছে দুটি মাথা। শ্মশানে মশানে ঘোরা সর্পতান্ত্রিক জাটিয়া জানেন ওদুটি কীসের মাথা।

রাজগোখরো।

ওই মাথা দুটি রাজগোখরোর করোটি।

* * *

মায়ের মন্দিরের সামনে হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন রামনারায়ণ মিশ্র। এতক্ষণে সবই বলে ফেলেছেন জমিদারমশাইকে। প্রতাপনারায়ণ পাথরের মতো মুখ করে সব শুনছেন। তাঁর পাশে বসে আছেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তাঁর মুখও চিন্তায় চিন্তায় ঘনকৃষ্ণবর্ণ।

'আপনি এসব আমাকে আগে জানাতে পারতেন ঠাকুরমশাই' কঠিনস্বরে বললেন প্রতাপনারায়ণ।

সঙ্গে সঙ্গে ফের ফোঁপাতে থাকলেন রামনারায়ণ, 'ভয় পেয়েছিলাম বাবা প্রতাপ। ভয় পেয়েছিলাম যে আমার মেয়ের মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু...কিন্তু আজ দুপুরে বাঘার মাঠের সামনে ওই শয়তানটা স্বয়ং আমাকে বলে গেল যে ও আমার মেয়েকে ছাড়বে না। তার চূড়ান্ত সর্বনাশ করবেই করবে। তুমি আমাকে বাঁচাও বাবা। এই ধর্মনাশ থেকে আমাকে রক্ষা করো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।'

প্রতাপনারায়ণ খানিকক্ষণ ক্ষিপ্ত পায়ে পদচারণা করলেন। তারপর হুঙ্কার দিলেন, 'কালু, পাইকদের ডাক। আজই আমি বাঘার জঙ্গলে ঢুকব। দেখি শয়তানটার কত বড় স্পর্ধা হয়েছে।'

কৃষ্ণানন্দ বললেন, 'একটু দাঁড়িয়ে যান জমিদারমশাই। আমার গণনা বলছে মা মঙ্গলা এখনও অবধি সুস্থ আছে, ভালো আছে। কিন্তু আজকের রাতটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার মন বলছে যা হওয়ার আজ রাতেই হবে। আজ সূর্যাস্ত থেকে কাল ভোর অবধি আপনার এই জমিদাবাড়িতে অবস্থান করা অত্যন্ত আবশ্যক।'

রামনারায়ণ কাতর চোখে চেয়ে রইলেন জমিদারমশাইয়ের দিকে। প্রতাপনারায়ণ বললেন, 'কিন্তু এইভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব?'

'না জমিদারমশাই। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা যাবে না। আজ আমি মা তারার সাধনায় বসব। আপনি ব্যবস্থা করুন।'

'ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি। ঠাকুরমশাই আপনাকে সাহায্য করবেন। আমি পাইকদের একত্রিত করে পাহারা আরও জোরদার করছি।'

* * *

জাটিয়া জাদু যখন ফিরে এলেন তখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। সংগৃহীত জিনিসগুলি ঘরে রেখে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন কৃষ্ণানন্দ মা বজ্রতারার সামনে পুজোয় বসেছেন। রামনারায়ণ তাঁর পাশে বসে তাঁকে সাহায্য করছেন। জাটিয়া রামনারায়ণকে দেখে ভারী আশ্চর্য হলেন, এই সময় তো ঠাকুরমশাইয়ের এখানে থাকার কথা নয়! তবে কিছু বললেন না তিনি। একপাশে চুপচাপ বসে পড়লেন।



আচমন, করাঙ্গন্যাস ইত্যাদি শেষ করে ধ্যানস্থ হলেন কৃষ্ণানন্দ। মা মহামায়ার পাদপদ্ম স্মরণ করে মনকে একাগ্র করতে চেষ্টা করলেন। এবার ধ্যানে জাগ্রত করতে হবে মা বজ্রতারার শ্মশানমণিপীঠ।

কিন্তু এ কী! কৃষ্ণানন্দ অনুভব করলেন তাঁর চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শ্মশানমণিপীঠ ধ্যানে প্রকটিত হচ্ছে না। কিছুতেই মন বসাতে পারছেন না সাধনায়। প্রবল চেষ্টায় তাঁর কপালে, কানের পাশে, ঘাড়ে ঘাম দেখা দিল। মনে হল বুকের ভেতরটা যেন ধড়ফড় করছে। হাত পা কাঁপতে লাগল প্রখ্যাত তন্ত্রবেত্তা কৃষ্ণানন্দ মৈত্র'র। তিনি আরও প্রবল চেষ্টার সঙ্গে ইষ্টধ্যেয়কে ধ্যানের মধ্যে অধিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

না হচ্ছে না। কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারছেন না মা মহামায়ার একনিষ্ঠ সেবক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে তিনি চোখ খুললেন। তারপর একদৃষ্টিতে দেবীমূর্তির দিকে ভ্রুকুটিকুটিল নয়নে চেয়ে রইলেন।

রামনারায়ণ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল আগমবাগীশমশাই? পুজো বন্ধ করে দিলেন যে?'

যেন চটকা ভেঙে জেগে উঠলেন কৃষ্ণানন্দ। মাতৃমূর্তির দিক থেকে চোখ সরালেন না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে কঠিনস্বরে বললেন, 'মন স্থির করতে পারছি না ঠাকুরমশাই, চিত্ত একাগ্র করতে পারছি না। আজকের পূজা সম্পন্ন হবে না। আমি জানি না মায়ের মনে কী আছে।'

বলতেই বলতেই আকাশে গুরু গুরু মেঘের গর্জন শোনা গেল। তিনজনেই সচকিত হয়ে দেখলেন আকাশ ছেয়ে গেছে কালো মেঘে। কোথাও একটা বজ্রপাত হল। তারপর শনশন শব্দ তুলে ধুলো আর হাওয়ার ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল জমিদারবাড়ির ওপর। মুহূর্তের মধ্যে উড়ে গেল কাছারিবাড়ির চাল, মন্দিরের বারান্দার ওপর লাগানো ছাউনি। কড়াক্কর বজ্রপাতের শব্দে কেঁপে উঠল পৃথিবী। উল্টে গেল কোষাকুষি, প্রদীপ, ধুনুচিদান। ফুলমালা রাখার বেতের ঝুড়িটি নিমেষে উধাও হল ঝড়ের দাপটে। কাছারিবাড়ির ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওরে ঝড় উঠেছে রে। কে কোথায় আছিস, সব সামাল দে।'

মুহূর্তে মুহূর্তে ঝড়ের প্রকোপ বাড়তে লাগল। হাওয়ার দাপটে দাঁড়িয়ে থাকাই দায়। ঝড়ের গর্জনে মনে হচ্ছে যেন শত সহস্র হাতির দল মরণযন্ত্রণায় উন্মত্ত চিৎকার করছে। এমন প্রলয়ান্তিক ঝড় কৃষ্ণানন্দ বা জাটিয়া জাদু নিজেদের জীবদ্দশায় দেখেননি। দুজনে কোনওমতে একটা বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলেন পাইকরা এদিকওদিক দৌড়োদৌড়ি করছে ঝড়ের দাপটে হাট করে খুলে গেছে কাছারিবাড়ির সদর দরজা কয়েকজন পাইক তাকে বন্ধ করার চেষ্টায় আছে।

এমন সময় কৃষ্ণনন্দ খপ করে জাটিয়া জাদুর হাত চেপে ধরলেন। ভয়ার্তস্বরে বললেন, 'ওরা কারা জাটিয়া?'

জাটিয়া দেখলেন আকাশ নেমে আসছে ছায়াশরীরীদের দল। যেন অন্ধকারের গর্ভ থেকে, পাতালের গহীন থেকে, সর্বনাশের গহ্বর থেকে নেমে আসছে পিশাচের বাহিনী। একে একে তারা নেমে এল কাছারিবাড়ির উঠোনে। আর সঙ্গে সঙ্গে পুরো জমিদারবাড়ির ওপর একটা কনকনে শীতল চাদর বিছিয়ে দিল কেউ। একটা কটু ভ্যাপসা গন্ধে ভরে গেল চারিপাশ। কৃষ্ণানন্দ তাকিয়ে দেখলেন যারা নেমে এসেছে তাদের অবয়ব ছেঁড়া ছেঁড়া কালো ছায়া দিয়ে তৈরি, আর চোখের জায়গায় দুটুকরো করে অঙ্গার জ্বলছে যেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র পৈশাচিক অট্টহাসির শব্দে কেঁপে উঠল দিগ্বিদিক। এক এক করে সেই ছায়াশরীর ঢুকে যেতে লাগল কাছারিবাড়ির ভেতরে।

কিছুক্ষণ ঝড়ের শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। তারপর ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে কাছারিবাড়ির ভেতর থেকে পাইকদের চিৎকার আর আর্তনাদ ভেসে আসতে লাগল। আর সেই সঙ্গে সেই বধির করে দেওয়া সমবেত পৈশাচী অট্টহাসি। এই আর্তনাদের পালা চলল কিছুক্ষণ। তারপর একে একে সেই ছায়ার দল বেরিয়ে এল কাছারিবাড়ির ভেতর থেকে। তাদের হাতে ছায়ার পোঁটলা। তারা সমবেত হয়ে দাঁড়াল। তারপর এক এক করে উড়ে যেতে লাগল আকাশপথে।

সামান্য পরেই চারিদিক শান্ত হয়ে এল। মনে হল এতক্ষণ যেন কোথাও

কিছু ছিল না। কোথায় সেই প্রলঙ্করী ঝড়? কোথায় সেই মত্তমাতঙ্গের চিৎকার? কোথায় সেই মুহুর্মুহু বজ্রপাত?

প্রতাপনারায়ণ আর হরিসাধন আলুথালু বেশে ছুটে এলেন বাইরে। সঙ্গে কাতরাতে থাকা কালু ডোম আর দুএকজন বিশ্বস্ত পাইক। প্রতাপনারায়ণ হাহাকার করে উঠলেন, 'নিয়ে গেল, পিশাচের দল সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেল। হায় হায়, আমি এখন কী করব? গাঁয়ের লোকেদের কাছে মুখ দেখাব কী করে?'

হরিসাধনকে দেখে মনে হল এখনও প্রকৃতিস্থ হননি তিনি। ভয়ে, আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছেন। শুধু অস্ফুটে একবার বললেন, 'নিয়ে গেল? আমার সব জমানো সোনা নিয়ে গেল? এবার আমার ছেলেকে ফিরে পাব কী করে?'

লাফিয়ে উঠলেন রামনারায়ণ। তাঁর চেহারা বদলে গেছে। চোখ দুটি প্রবল ক্রোধে জ্বলছে যেন। তিনি বললেন, 'আমি ওই বাঘার জঙ্গলে চললাম জমিদারমশাই। যাই হয়ে যাক, আমার মেয়েকে ফিরিয়ে আনবই। যে আমার সঙ্গে যেতে চায় চলুক।' এই বলে মায়ের পায়ের কাছে থাকা ঘটটি তুলে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

প্রতাপনারায়ণ আটকাতে যাচ্ছিলেন ঠাকুরমশাইকে। কৃষ্ণানন্দ ইশারায় বারণ করলেন। রামনারায়ণ বেরিয়ে যেতে বললেন, 'যেতে দিন জমিদারমশাই। ওঁকে আপনি আটকাতে পারবেন না।'

প্রতাপনারায়ণ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'মানে? আটকাতে পারব না মানে?'

'উনিই আজকের কাণ্ডের মূল হোতা। উনিই আজ মন্দিরের মধ্যে এমন একটি মন্ত্রপূত শক্তিশালী আধার এনে রেখেছিলেন যে আমার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই আজ আমি কোনও বন্ধন দিতে পারিনি। আর বন্ধন দিতে পারিনি বলেই আজ এই এত বড় দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।'

প্রতাপনারায়ণ ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'তাহলে ওঁকে আটকাতে দিলেন না কেন?'

'কারণ উনি প্রকৃত রামনারায়ণ মিশ্র নন। উনি যখনই আমাকে

আগমবাগীশ বলে সম্বোধন করলেন, তখনই নিশ্চিত হয়ে গেলাম উনি কে। যবে থেকে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, কেউ আমাকে আগমবাগীশ বলে সম্বোধন করেননি। তাহলে উনি আমার এই উপাধি জানলেন কী করে?

আপনি আজ চাইলেও ওঁকে আটকাতে পারতেন না জমিদারমশাই। আজ ডাকাতসর্দারই রামনারায়ণ মিশ্রর রূপ ধরে এসেছিল আমাদের মধ্যে। খুব সম্ভবত ঠাকুরমশাই ওদের হাতে এখন বন্দি।

নিজের ওই ভৌতিক, অশরীরী ডাকাতদলকে আহ্বান করে আনার জন্য আজ ডাকাতসর্দারের প্রয়োজন ছিল এই জমিদারবাড়ির মধ্যে উপস্থিত থাকা। সে তার কর্ম সম্পাদন সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে। তার আয়ুধ নিয়ে পালিয়েছে। এবার তাকে আটকায় এমন শক্তি ত্রিভুবনে নেই।'

* * *

জাটিয়া জাদু ছিলেন দলটির একেবারে সামনে। পিছনে ছিলেন প্রতাপনারায়ণ, হরিসাধন, কালু ডোম আর জনা কয়েক বিশ্বস্ত পাইক। সবার হাতে একটি করে মশাল।

প্রতাপনারায়ণ বলেছিলেন যাই হয়ে যাক, আজ তিনি বাঘার জঙ্গলে ঢুকবেনই। তাঁর আশ্বাসেই গ্রামের সবাই তাদের সঞ্চিত ধন কাছারিবাড়িতে রেখে গেছিল। এখন সেই ধনসম্পত্তি খোয়া গেলে সবাই তাঁকেই দুষবে। সেই অপমান তিনি মেনে নিতে পারবেন না। আটকানো যায়নি হরিসাধনকেও। ছেলেকে না নিয়ে বাড়ি ফিরলে নিজের পরিবারের সামনে দাঁড়াবেন কী করে?

কালু ডোমকেও আটকানো যায়নি। তার মতো প্রভুভক্ত মানুষ এই পরগনায় দ্বিতীয়টি নেই। প্রতাপনারায়ণ যদি নরকেও যান, তাহলেও সে প্রতাপনারায়ণের সঙ্গ ছাড়বে না।

আসেননি কৃষ্ণানন্দ। তিনি জাটিয়া জাদুর এনে দেওয়া সামগ্রীগুলি নিয়ে মহাপূজায় বসেছেন। আজ কৌশিকী অমাবস্যা। তিনি পণ করেছেন আজ নিজের সমস্ত তান্ত্রিক জ্ঞান, শক্তি, আয়ুধ প্রয়োগ করে দেখবেন

কয়েকটি নিরীহ প্রাণ রক্ষা পায় কি না। আর সেই পূজার জন্য গ্রামের শ্মশান থেকে আনিয়ে নিয়েছেন কয়েকটি আধপোড়া চিতাকাঠ।

মাতৃমূর্তিকে সযতনে পাদপীঠ-সহ মন্দিরের বাইরে আনলেন কৃষ্ণানন্দ। তারপর তাকে পশ্চিমাস্য করে স্থাপন করলেন। চিতাকাঠ দিয়ে প্রস্তুত করলেন যজ্ঞভূমি। প্রথমে নিজের শিখাবন্ধন করলেন। তারপর পদ্মাসনে বসে সুগম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'ওঁ সর্ব্বান বিঘ্নানুৎসারয় হুঁ ফট স্বাহা।' তর্জনী, মধ্যমা আর কনিষ্ঠা বজ্রমুদ্রায় ধারণ করে কোষার জলে ডুবিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'ওঁ বজ্রোদকে হূং ফট স্বাহা।' চন্দন দিয়ে যোনিযুক্ত ত্রিকোণ, ত্রিকোণের তিনটি কোণ ছুঁয়ে একটি বৃত্ত, এবং বৃত্তের বাইরে অষ্টদলপদ্ম আঁকলেন। তারপর হাতে ফুল নিয়ে 'ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে' মন্ত্রোচ্চারণ করে পীঠচিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

প্রথমে শ্মশানভূমিচিন্তা। শ্মশানের মধ্যে একটি কল্পতরুবৃক্ষ। তার পাদপীঠে সুবর্ণ ও রত্ননির্মিত মণিপীঠ। শ্মশানের প্রান্তদেশে শিবাদল মাংস ও অস্থিলোভে আনন্দিত হয়ে বিচরণ করছে। শবমুণ্ড, চিতাঙ্গার ও অস্থি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। এইবার নারাচমুদ্রায় অক্ষত প্রক্ষেপণ দ্বারা দিব্য, অন্তরীক্ষ ও ভৌম এই ত্রিবিধ বিঘ্ন নিবারণ করতে হবে। মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলেন কৃষ্ণানন্দ, 'মাতর্নীলসরস্বতী প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে প্রত্যালীঢ়-পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে, ফুল্লেন্দীবর লোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং...'

বাঘার জঙ্গলের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ছোট দলটি। জাটিয়া জাদু জানেন এইবার তাঁদের সামনে প্রথম বাধা। তিনি ইতিউতি চেয়ে মৃদুস্বরে ডাকলেন, 'লখাই।'

অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা ছোট অবয়ব বেরিয়ে এল, 'এসেছি ঠাকুর।'

কালু ডোম আঁতকে উঠল, 'এ কী লখাই। তুই এখানে কী করছিস বাপধন?'

জাটিয়া জাদু কালুর কাঁধে হাত রাখলেন, 'চিন্তা কোরো না কালু। এই জঙ্গলে ঢুকতে গেলে আমাদের দরকার লখাইয়ের বয়সী একটি ছেলে

বা মেয়ের। পিশাচসর্দার এই জঙ্গলকে এক অতি প্রাচীন বন্ধনে বেঁধে রেখেছে তাই কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু এই বন্ধন শিশুদের ওপর কোনও প্রভাব ফেলে না। সেইজন্যই তোমাদের গাঁয়ের ওই জগাই নামের ছেলেটি জঙ্গলে প্রবেশ করতে পেরেছিল। একই কারণে লখাইয়ের ওপরেও সেই অভিশাপের কোনও ফল ফলবে না। লখাই আমাদের জানিয়েছে তোমাকে না জানিয়ে সে প্রায়ই এখানে আসে। তাই আজ সেইই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে পিশাচসর্দারের আস্তানায়।'

'কিন্তু ঠাকুর...'

'চিন্তা কোরো না কালু। আমি জাটিয়া জাদু, প্রতিজ্ঞা করছি, যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ তোমার ছেলের কোনও ক্ষতি হতে দেব না।'

আরও কিছুক্ষণ হাঁটলেন সবাই। এমন সময় লখাই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। জাটিয়া জাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল লখাই?'

'আচ্ছা সন্ন্যাসীঠাকুর...'

'বল।'

'তোমরা তো এত তন্তর মন্তর করো। আজ যদি এই জঙ্গলে আমার কোনও বিপদ হয়, তাহলে কি আমার মরে যাওয়া মা আমাকে বাঁচাতে আসবে?'

জাটিয়া জাদু কোনও জবাব দিলেন না। লখাইকে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগলেন।

স্বর্ণনির্মিত কৃষ্ণজম্ভলের মূর্তির সামনে ধ্যানে বসেছিল সর্দার। কয়েক দণ্ডের মধ্যে খণ্ডবিখণ্ড ধাতুকে গলিয়ে তাকে ইচ্ছেমতো আকার দেওয়া তার কাছে অতি সামান্য বিষয়। আর এসবই তার আয়ত্তাধীন হয়েছে মহাচীনাচার সাধনায়। তাই আজ সাফল্যলাভের চূড়ান্তমুহূর্তে ধ্যানে বসে তার মনে পড়ছিল মহাচিনে অতিবাহিত দিনগুলির কথা।

মহাচীনদেশ রুক্ষ মরুভূমি আর বরফের দেশ। এত শৈত্য, এত রুক্ষতা আগে কখনও দেখেনি সর্দার। সে রাঢ়বাংলার গ্রামের ছেলে। পথশ্রমে, ক্ষুধায়, শৈত্যে মৃতপ্রায় হয়ে পথের পাশে পড়েছিল সে। দেবী দ্রোলমার মন্দিরে অর্ঘ্য দিতে যাওয়ার পথে তার গুরু তাকে দেখতে পেয়ে তাকে

তুলে আনেন। গুরুই তাকে কিছু সিদ্ধি প্রদান করেন যাতে এই কঠিন কঠোর দেশে তার বেঁচে থাকা একটু সহনীয় হয়।

সেই থেকে শুরু। আস্তে আস্তে কঠোর পরিশ্রমে সে গুরুর স্নেহ আর বিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠে। আর জন্মগত প্রতিভা তো তার ছিলই। অতি অল্প আয়াসে যে কোনও সাধনাক্রম আত্তীকৃত করায়, যে কোনও তন্ত্রপদ্ধতি অধিগত করায় আশ্চর্য ব্যুৎপত্তি ছিল তার। রাঢ়দেশের এক সাধারণ গ্রামের ছেলের মধ্যে এই অতিলৌকিক ক্ষমতা কী করে এল সে এক ঈশ্বরই জানেন।

তন্ত্রসাধনার অন্তিম উদ্দেশ্য হচ্ছে কামাদিকুসুমের নিগড় থেকে নিজেকে মুক্ত করে, ভোগসমুদ্র'র পারে উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে কৈবল্যসাধনায় বিলীন করে দেওয়া। সর্দার সব পেরেছে, সব রিপুশত্রু নাশ করেছে, শুধুমাত্র একটি বাদে। শুধুমাত্র একটি রিপুই আজ পর্যন্ত সর্দার অতিক্রম করতে পারেনি। লোভ। সম্পদের প্রতি লোভ, অর্থের প্রতি লোভ, বিলাসের প্রতি লোভ, ব্যসনের প্রতি লোভ।

গুরুও কি জানতে পেরেছিলেন? নইলে তাকে দেব কৃষ্ণজম্ভলের সাধনপদ্ধতি শেখাতে বারবার অস্বীকার করেছিলেন কেন তিনি? গুরু ছিলেন মহাচীনাচারশাস্ত্রের মহারথী। তিনি চাইলে পৃথিবীর সমস্ত সুখ, সমৃদ্ধি, যশ, প্রতাপ, খ্যাতি অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারতেন। কিন্তু বেছে নিয়েছিলেন কৃচ্ছ্রসাধনের পথ, বৈরাগ্যের পথ। দারিদ্র্যকে বরণ করেছিলেন স্বভাবজ বিনয় আর ঔদার্যের সঙ্গে।

তাই সর্দারকে বেছে নিতে হয়েছিল অন্য এক উপায়। গুরু একবার কর্মব্যপদেশে বাইরে গেছিলেন। তখন সে চুপি চুপি গুরুর পুঁথির ভাণ্ডার থেকে জম্ভলসাধনার পুঁথিটি হস্তগত করে। তারপর প্রায়ই চলে যেত পাহাড়ি অরণ্যে। সেই প্রাচীন পুঁথির নির্দেশ মেনে ক্রমে ক্রমে ডিম্ভসাধনার এক একটি স্তর অতিক্রম করতে থাকে সে।

তবে পাপ কখনও গোপন থাকে না। একদিন হাতেনাতে গুরুর হাতে ধরা পড়ে গেল সর্দার। তদ্দণ্ডেই গুরু তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। আর অভিশাপ দিলেন যে সাধনার লোভে সর্দার তার গুরুর সঙ্গে এতবড়

তঞ্চকতা করল, সে সাধনায় তার চূড়ান্ত সাফল্য তার অধরাই থেকে যাবে। তবে এতদিনের সাধনার ফলস্বরূপ দেবী দ্রোলমা স্বয়ং নিজহস্তে তার মোক্ষপথ উন্মুক্ত করবেন।

চোখ বুজল সর্দার। মহাচীন থেকে পালিয়েছিল বটে, তবে চুরি করে এনেছিল আরও একটি জিনিস।

দেশে ফেরার পর একের পর দুরূহতম তন্ত্রসাধনায় নিজেকে আরও উন্নত করেছে সে। জালন্ধর, পূর্ণগিরি, উড্ডীয়ান, কোথায় কোথায় যায়নি সর্দার? স্মৃতিতে নিয়ে এসেছিল কৃষ্ণজম্ভলসাধনার সমস্ত সাধনপদ্ধতি। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি নিয়ে জন্মেছিল সর্দার। এক মন্ত্র তাকে কখনও দ্বিতীয়বার বলতে হয়নি। শোনামাত্র বা দেখামাত্র যে কোনও মন্ত্র তার স্মৃতিতে নির্ভুলভাবে গেঁথে যায়।

আজ সেই বহু ঈপ্সিত চূড়ান্ত সময়। আজই দেখা যাবে গুরুর ভবিষ্যদ্বাণী না তার অর্জিত সাধনসম্পদ, কার জোর বেশি। ইষ্টদেবকে স্মরণ করে চোখ বুজল সর্দার।

চিতার আগুনে সমিধ অর্পণ করলেন কৃষ্ণানন্দ। মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, '...ললজ্জিহ্বা সদা পাতু নাভৌ মাং ভুবনেশ্বরী। করালাস্যা সদা পাতু লিঙ্গে দেবী হরপ্রিয়া। পিঙ্গোগ্রৈকজটা পাতু জঙ্ঘায়াং বিঘ্ননাশিনী। বলতে বলতে যজ্ঞে আহুতি দিলেন জাটিয়ার এনে দেওয়া ধান। এই ধান এসেছে মেঠো ইঁদুরদের গর্ত থেকে। তারা একটি একটি ধানের কণা সঞ্চয় করে রাখে তাদের গর্তে। তাদের সেই সঞ্চয়ের মধ্যে, সাধারণ সংসারী মানুষের সঞ্চয়ের মধ্যে অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম জমে থাকে। সেই সঞ্চয় ছিনিয়ে নেওয়া মহাপাপ। সেই মহাপাপকে চিতাযজ্ঞে আহুতি দিলেন কৃষ্ণানন্দ।

প্রথম বাধা বড় সহজেই অতিক্রম করলেন জাটিয়া জাদু এবং অন্যরা। জাটিয়া জাদু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কৃষ্ণানন্দ ঠিকই বলেছিল তবে।

দেব কৃষ্ণজম্ভলের আকার পঞ্চবর্ষীয় কুমারের মতো। তাই কৃষ্ণজম্ভলের উদ্দেশ্যে কৃত কোনও কৃষ্ণাভিচারই পঞ্চমবর্ষীয় বা তার থেকে ছোট

শিশুদের ক্ষেত্রে খাটে না। আর সেইজন্যই এই জঙ্গলে প্রবেশ করতে তাঁদের প্রয়োজন ছিল একটি পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর।

সাধারণত এত ছোট শিশুরা তাদের শৈশব মায়ের স্নেহাঞ্চলেই কাটায়। কিন্তু এই মাতৃহীন অনাথ বালক শৈশব থেকেই স্বাধীন, সে মানুষ হয়েছে প্রকৃতির কোলে, এই অরণ্যানীর মধ্যে। সে যখন ইচ্ছা তখন বাঘার জঙ্গলে ঢুকেছে, বেরিয়েছে, তার ওপর কোনও অরণ্যবন্ধন, প্রকৃতিবন্ধন, বা ভূমিবন্ধন ক্রিয়া করেনি। তার উপস্থিতি ডাকাতপিশাচদের কাছে অধরাই থেকে গেছে। সে তাদের কাছে অদৃশ্য।

জাটিয়া জাদু একটি কাপড়ের টুকরো বার করলেন। প্রতাপনারায়ণ দেখলেন এ তাঁর সেই পুরনো ধুতি যা লখাইকে দেওয়া হয়েছিল। জাটিয়া জাদু ধুতিটি ছোট ছোট টুকরো করলেন। তারপর মন্ত্র পড়তে পড়তে প্রত্যেকের বাজুতে সেই টুকরোগুলি বেঁধে দিলেন।প্রতাপনারায়ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কোনদিকে যাব?'

জাটিয়া জাদু বললেন, 'শুনেছি এখানে নাকি এককালে বাঘা ডাকাতের মশান ছিল, সেখানে নরবলি হত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ডাকাতসর্দার সেখানেই ঘাঁটি গেড়েছে।'

লখাই একটা ক্ষীণ পায়েচলা পথ দেখিয়ে বলল, 'ও জায়গাটা তো আমি চিনি। এইদিক দিক দিয়ে গেলেই ওখানে পৌঁছনো যাবে।' জাটিয়া জাদু বললেন, 'এবার তাহলে এগোনো যাক।'

সর্বমঙ্গলা ঘুমিয়ে ছিল কুটিরের মাটিতে। আবার সেই অদ্ভুত স্বপ্নটা দেখছিল সে। চারিদিকে কেউ নেই, কিচ্ছু নেই, শুধু দাউ দাউ করে জ্বলছে পাহাড়প্রমাণ চিতার সারি। আর তার মধ্যে ধীর পায়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে মস্ত একটি চিতার দিকে। তার পরনে বাঘছাল। সারা দুই হাতে, দুই পায়ে, সারা শরীরে সাপের দল জড়িয়ে আছে গয়নার মতো। আর তার মাথার ওপর একটি জটাকুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা ধরে আছে একটি কালনাগিনী।

ধীরে ধীরে সেই চিতার ওপর উঠতে থাকল সে। পায়ের কাছে গড়িয়ে যাচ্ছে জ্বলন্ত কাঠ, নরমুণ্ড, অস্থি, অর্ধদগ্ধ মাংস। আগুনের লেলিহান শিখা তাথৈ তাথৈ নাচছে তাকে ঘিরে। তার মনে হচ্ছে সে যেন এই সমস্ত

ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী। এই সংসার তাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। জন্ম আর মৃত্যু যেন তার দুই পায়ের দুই মঞ্জীর। তার শরীরের প্রতিটি রোমকূপে যেন এক অদ্ভুত অপার্থিব আনন্দের স্রোত। সে অসীম, সে অনন্ত, সে এই বিশ্বচরাচরের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি ধূলিকণায়, প্রতিটি অণু পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত।

সুচারুভাবে একের পর এক সাধনার স্তর অতিক্রম করে যাচ্ছে সর্দার। তার মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এখন তার ভ্রুমধ্যস্থ। তার চিত্তচৈতন্য এখন বিশুদ্ধচক্রে অধিষ্ঠান করছে। সর্দারের অন্তর্দেহের দক্ষিণ অংশটি এখন শ্বেতকল্প শিব, বাম অংশটি স্বর্ণনির্মিত শক্তি। একটি রক্তপদ্মের ওপর আসীন সে। তার পরনে বাঘছাল, চারটি হাতে ধনু, শর, পাশ এবং গদা ধারণ করে আছে সে। শ্বাসবায়ু স্থির করে মন্ত্র উচ্চারণ করল সর্দার, 'ওঁ জম্ভলা জামলিম্ জ্বায়ে স্বাহা।'

এবার যাত্রা পরের চক্রের দিকে।

জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা গিয়ে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ল লখাই। ফিসফিস করে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

একটু কান পাততেই শুনতে পেলেন তাঁরা। একটা শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্য থেকে। কিন্তু কোন দিক থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। সবাই ইতিউতি চাইতে লাগলেন। এমন সময় জাটিয়া জাদু চাপাস্বরে বললেন, 'ওপরে তাকান।'

সবাই ওপরে তাকিয়ে দেখলেন গাছপালার মধ্য দিয়ে অল্প একটু আকাশ দেখা যাচ্ছে। আর সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা অশরীরী ছায়া। ছেঁড়া অন্ধকার দিয়ে তৈরি শরীর তাদের। আর চোখের জায়গায় দুটি জ্বলন্ত অঙ্গার বসানো।

জাটিয়া জাদু ফিসফিস করে বললেন, 'ওরা টের পেয়েছে যে কেউ বা কারা বাঘার জঙ্গলে ঢুকেছে। কিন্তু বুঝতে পারছে না যে তারা কারা আর কোথায় আছে। আমরা এখন ওদের কাছে অদৃশ্য। আপনাদের হাতে যে কাপড়ের টুকরোটা বেঁধে দিয়েছি, ওটাই আপনাদের রক্ষাকবচ। কোনও শব্দ করবেন না। একদম চুপচাপ থাকুন।'

আস্তে আস্তে জঙ্গলের শব্দ স্তিমিত হয়ে এল। মনে হল জঙ্গল যেন নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছে। একটু পরেই একটা শীতল চাদর কে যেন টেনে দিল জঙ্গলের ওপরে। হঠাৎ করেই অকালপৌষের ঠান্ডা নেমে এল জঙ্গলের বুকে। সেই অশরীরী শৈত্য নিঃশব্দ ঘাতকের মতো জমে উঠতে থাকল।

অশরীরী ছায়ার দল ধীরেসুস্থে নেমে এল ওই জায়গাটায়। এদিক ওদিক কী যেন খুঁজতে লাগল তারা। তীব্র হয়ে উঠল কটু ভ্যাপসা গন্ধ। দাঁতে দাঁত চিপে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন প্রত্যেকে।

যজ্ঞের চিতার আগুন এবার লেলিহান শিখায় জ্বলছে। নিজের উত্তরীয়টা মাথায় শিরস্ত্রাণের মতো করে বেঁধে নিলেন কৃষ্ণানন্দ। মন্ত্রোচ্চারণে ছেদ পড়েনি এতটুকু, বলে চলেছেন '...নাগনূপুরধরাদেবী ভোজনে পাতু সর্বদা, শবকর্ণা মহাদেবী শয়নে পাতু সর্বদা...' বলতে বলতে বজ্রপাতে মৃত অশ্বত্থগাছের মূল আর যজ্ঞডুমুরের ডাল চিতাগ্নিতে আহুতি দিলেন কৃষ্ণানন্দ। একটা নীল শিখা যেন হঠাৎ লাফিয়ে উঠল লেলিহান অগ্নির মধ্যে। আর সেই সঙ্গে আকাশ থেকে একটা নীল রঙের তারা বিদ্যুদ্বেগে খসে পড়ল বাঘার জঙ্গলের মধ্যে।

দরজা খুলে একজন ডাকাত ঢুকে এল ঘরে। সর্বমঙ্গলাকে ডেকে তুলল। তারপর একটা শাড়ি দিয়ে যান্ত্রিকস্বরে বলল, 'ঘরের পেছনে কয়েকঘড়া জল এনে রেখেছি। স্নান করে এই শাড়িটা পরে নাও।'

সর্বমঙ্গলা উঠল। শাড়ি নিল। যন্ত্রের মতো হেঁটে চলল কুটিরের পিছন দিকে। কোথায় যাচ্ছে সে? এই কি সেই জঙ্গল যেখানে তাকে ধরে রাখা হয়েছিল। কই, না তো, ওই তো সেই পাহাড়প্রমাণ জ্বলন্ত চিতা। তার চারিধারে ছড়িয়ে আছে শবমুণ্ড আর অস্থি... সে ক্রমে উঠে যাচ্ছে চিতার ওপর। তার হাতে কী ধরা আছে ওটা? ভালো করে দেখা যায় না। এত আগুন, তাও এত অন্ধকার?

একটা ক্রোধ, অব্যক্ত ক্রোধ ক্রমে তার শরীর, মন, মস্তিষ্ক ছেয়ে ফেলছে যেন কেন এই ক্রোধ, কার ওপরে এই ক্রোধ সে জানে না।

কিন্তু তার মনে হচ্ছে যেন সে যেন তার ক্রোধের আগুনে এই পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে।

পুজো সাঙ্গ করে উঠে দাঁড়াল সর্দার। তারপর হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'নিয়ে আয় ওদের।'

এক এক করে শশিশেখর আর তার সঙ্গীসাথীদের এনে মাথা হেঁট করে বসানো হল হাড়িকাঠের সামনে। তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই। নিম্নাঙ্গে নতুন ধুতি ছোট করে পরা। বোঝা যায় যে একটু আগেই স্নান করানো হয়েছে তাদের। চুল থেকে জল ঝরছে এখনও। শুধু তাদের চাউনি নিষ্প্রাণ, আচরণ জড়বৎ। যেন তারা বুঝতে পারছে না তাদের সঙ্গে কী হতে চলেছে।

'ঠাকুরমশাইকে ডাক,' আদেশ দিল সর্দার।

একটু পর বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে উপস্থিত হলেন রামনারায়ণ। তাঁকেও স্নান করানো হয়েছে। তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব কী? আমাকে কেন ডাকা হল?'

সর্দার একটা ধীরেসুস্থে একটি বিশালাকৃতি খড়্গ তুলে ধরল। তারপর গম্ভীরমুখে বলল, 'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে ঠাকুর। আজ আমি নিজের হাতে এদের বলি দেব। আর সেই বলির রক্তে আমার ইষ্টদেবকে স্নান করাব। সেই পূজায় তোমাকে পৌরোহিত্য করতে হবে, ব্যস। তাহলেই তোমার ছুটি।'

রামনারায়ণ যেন চোখে অন্ধকার দেখলেন। তাঁর হাত পা শিথিল হয়ে এল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বললেন, 'দোহাই সর্দার, তোমার পায়ে পড়ি, এমন পাপ কাজ আমাকে দিয়ে করিও না।'

'পাপ কাজ?' হা হা করে হেসে উঠল সর্দার, 'যে কাজে স্বয়ং ঈশ্বরের রুচি আছে, তাকে পাপ কাজ বল ঠাকুর? আচ্ছা সে যা হোক। যদি পাপকাজ বল; তো তাইই। কিন্তু যদি মেয়েকে ফিরে পেতে চাও ঠাকুর তো এই কাজ তোমাকে করতেই হবে। এবার তুমিই ভেবে বলো, কী চাও। এদের প্রাণ বাঁচাতে চাও না নিজের মেয়েকে ফিরে পেতে চাও।'

রামনারায়ণ মিশ্র'র বুকে যেন একটা ছুরি বিঁধে গেল। এতগুলি অসহায়

প্রাণের বিনিময়ে নিজের স্নেহপুত্তলিকে উদ্ধার করতে হবে? এ তিনি কী করে পারবেন? এরাও তো কারও সন্তান, কারও পিতা, কারও ভাই। আর ওই যে পূর্ণিমার চাঁদের মতো ছেলেটি, তাকেই তো একদিন নিজের জামাতা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন রামনারায়ণ। এখনও বোধহয় হরিসাধন আশায় আছেন তাঁর ছেলেকে ফিরে পাবেন। বুকের ভেতরটা যেন হাহাকার করে উঠল রামনারায়ণের, চোখ জলে ভরে এল। তিনি চোখের জল মুছে বললেন, 'এদের বদলে আমাকে বলি দিলে হয় না? আমি সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ, জীবনে কারও ক্ষতি করিনি, কারও খারাপ চাইনি, সারাজীবন একনিষ্ঠ হয়ে মা কিরীটেশ্বরীর সেবা করেছি। আমাকে বলি দিলে তোমার উদ্দেশ্য অনেক তাড়াতাড়ি পূরণ হবে সর্দার।'

সর্দার আবার হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি সত্যিই একজন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ, নিজের সম্পর্কে যা যা বলেছ সব সত্যি। আর সেই জন্যই এই বলিপূজায় তোমাকেই পুরোহিত হওয়ার জন্য আমি বেছে নিয়েছি। এই অঞ্চলে তোমার থেকে থেকে ভালো পুরোহিত আর কাউকে পেতাম না।'

'দোহাই সর্দার, দোহাই। এই পাপকাজ করে এই গ্রামকে অপবিত্র কোরো না।'

হা হা করে হেসে উঠল সর্দার। 'নিজের গ্রামকে বড় ভালোবাসো ঠাকুর, তাই না? কিন্তু কী করি বলো, সবই বিধিনির্দিষ্ট। শেষ সাধনা সম্পন্ন করার জন্য আমাকে এই গ্রামেই আসতে হত যে। কেন জানো?'

রামনারায়ণ তখনও কাঁপছিলেন। তাঁর মুখে কথা ফুটল না।

'এই বিপুলা পৃথিবীর যে কোনও সুলক্ষণযুক্ত স্থানেই আমি আমার চূড়ান্ত সাধনার আসন বিছাতে পারতাম। কিন্তু এখানে এসেছি একটাই কারণে। আমার ইষ্টদেব কৃষ্ণজম্ভল যে কুলের দেবতা সেটি হচ্ছে ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের কুল। আর দেব রত্নসম্ভব কুলের সর্বোত্তমা ঈশ্বরী হলেন দেবী বজ্রতারা। আমার এমন একটি সাধনস্থান প্রয়োজন ছিল যেখানে একইসঙ্গে প্রাচীন নরবলির মশান আর দেবী বজ্রতারার মূর্তি অধিষ্ঠিত আছে। ভারতে এমন একটিই জায়গা আছে, সে হচ্ছে এই চণ্ডীপুর গ্রাম। এবার তুমি

প্রস্তুত হয়ে নাও ঠাকুর। বলিদানের পর আরও একটু কাজ রয়ে যাবে, সেটি শেষ করলেই, ব্যস তোমার ছুটি।'

'আবার কী কাজ? আর কত পাপ আমাকে দিয়ে করাবে সর্দার?'

দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে অল্প হাসল ডাকাতসর্দার। 'তোমার কন্যাটি বড়ই সুলক্ষণা ঠাকুর। ওর শরীরে যে যোগিনীচিহ্ন আছে তা কোটিতে মেলে না। আমি স্থির করেছি ওকে আমার সাধনসঙ্গিনী করব। তোমার মেয়েকে জীবিত ফেরত পাবে বটে, কিন্তু ও থাকবে আমার কাছেই। সেই পুজোটাও তোমাকেই দিতে হবে।'

অন্ধকার ছায়াগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাঁদের ঘিরে। মনে হচ্ছিল কারা যেন ধীরে ধীরে শীতল নিঃশ্বাস ফেলছে। ছায়াশরীরগুলো ভেঙে যাচ্ছিল, আবার জুড়ে যাচ্ছিল একে অন্যের সঙ্গে। যেন সব মিলিয়ে একটিই মস্ত অন্ধকারপিণ্ড, সেটিই ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন হয়েছে।

পচা কটু গন্ধে বমি উঠে আসছিল তাঁদের। ভয়ে আর ঠান্ডায় দাঁত কপাটি লেগে যাচ্ছিল।

কিন্তু তবুও তাঁরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

একটু পর জটিয়া জাদু দেখলেন তাঁদের পায়ের কাছে যেন কী একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি ধীরে ধীরে নীচের দিকে তাকালেন।

নেউল। একটি নেউল ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁদের পায়ের কাছে। প্রত্যেকের কাছে গিয়ে পায়ে নাক লাগিয়ে কী যেন শুঁকছে।

নেউল। জাটিয়া জাদুর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমের স্রোত নেমে গেল। এ নিশ্চয়ই ডাকাতসর্দারের মায়া নেউল। তাঁর বন্ধন পিশাচদের কাছে অদৃশ্য, কিন্তু এই মায়া নেউলের কাছে নয়!

নেউলটা পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জাটিয়া জাদুর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণের ভয় আর উত্তেজনায় হরিসাধনের স্নায়ু বোধহয় বিকল হওয়ার মুখে এসে পৌঁছেছিল। তিনি হঠাৎ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে লখাইয়ের দেখানো পথ ধরে দৌড়তে শুরু করলেন। তাঁকে দেখে বাকিরাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পিছু নিল সেই ছায়াশরীরীদের দল।

রামনারায়ণ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়েছিলেন ডাকাতসর্দারের দিকে। এই কথা যে কেউ কোনওদিন তাঁর সামনে উচ্চারণ করতে পারে সে তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি কোনওদিন। ক্রোধে, কান্নায়, অপমানে, তাঁর মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। তিনি অস্ফুটে বললেন, 'কী বললে তুমি, আরেকবার বলো।'

ডাকাতসর্দার বলল, 'ঠিকই শুনেছ ঠাকুর। তবে চিন্তা কোরো না, তোমার মেয়েকে রাজরানী করে রাখব। আজ এই সাধনা সিদ্ধ হলে অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হব আমি। আর তোমার মেয়ে হবে তার অধিশ্বরী। অবশ্য তোমাকেও একেবারে বঞ্চিত করব না। মেয়েকে আমার হাতে তুলে দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে একটা বড় অংশই তুমি পাবে...'

আর সহ্য হল না রামনারায়ণের, তিনি 'শয়তানের বাচ্চা, এত বড় সাহস তোর' বলে একটা হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়লেন সর্দারের ঘাড়ে।

জাটিয়া জাদু দেখতে পেলেন একটু দূরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। তাঁরা দ্বিগুণ বেগে দৌড়তে লাগলেন।

সর্দার এই আকস্মিক আক্রমণ আশা করেনি। বুকে একটা প্রবল ধাক্কা খেয়ে দূরে ছিটকে গেল সে, আর পড়ল গিয়ে শশিশেখরের ওপর। শশিশেখর একটা শবদেহের মতো গড়িয়ে পড়ে গেল।

সর্দারকে আক্রান্ত হতে দেখে উঠে দাঁড়াল বাকি ডাকাতরা। তাঁদের পেশি ফুলে উঠেছে অজগরের মতো। দু'চোখে ঝিকিয়ে উঠেছে নরকের আগুন। তাদের প্রভুর গায়ে হাত তোলে এত সাহস ওই মানুষটার? ওর মাথা ছিঁড়ে নেবে এই অনুগত পিশাচের দল।

ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল সর্দার। গায়ের ধুলো ঝাড়ল যত্ন করে। তারপর হিসহিসিয়ে বলল, 'ভুল করলে ঠাকুর। বড় ভুল করলে। বিয়ে তো তুমি দেবেই। এবার তোমার সামনেই তোমার মেয়েতে আমি উপগত হব, আর সেটাও তোমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে।'

বলতে বলতেই একটা নেউল দৌড়ে এসে উঠে পড়ল সর্দারের গায়ে। গা বেয়ে উঠে এল কাঁধে। তারপর সর্দারের কানে কানে কী যেন বলল। সর্দার পালটা কিছু আদেশ দিল তাকে। নেউলটা সর্দারের গা থেকে নেমে দ্রুত ছুটে গেল জঙ্গলের দিকে।

সর্দার বিজাতীয় ভাষায় কী একটা উচ্চারণ করতেই বাকি ডাকাতদের নজর ঘুরে গেল জঙ্গলের দিকে। এক এক করে ডাকাতদের শরীরে কাঁপন ধরল। তারপর তাদের ঘিরে মাটি থেকে জেগে উঠল আঁধার ধুলোর চাদর। সেই চাদর ক্রমে ঢেকে ফেলল তাদের পিশাচশরীর। তারপর একদল অন্ধকারের পিণ্ড ধেয়ে গেল জঙ্গলের দিকে।

সর্দার ধীরেধীরে বলিদানের খাঁড়াটা তুলে নিল নিজের হাতে। তার গায়ে পরম মমতার সঙ্গে হাত বুলিয়ে বলল, 'এ খাঁড়া কোথাকার জানো ঠাকুর? মহাচীনদেশের। আমার গুরু দেবী দ্রোলমার উপাসক ছিলেন। এই খড়্গ গুরুর আরাধ্য দেবী মন্ত্রপূত দ্রোলমার খড়্গ। আমি এই খড়্গ চুরি করে নিয়ে এসেছিলাম শুধুমাত্র এই দিনটির জন্য। আজ মনে হয় মায়ের রক্তপিপাসা জেগেছে। জয় দেবী দ্রোলমা। আজ তোমার খড়্গ নররক্তে স্নান করাব না।'

রামনারায়ণ তখনও ফুঁসছিলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আমিও মা কিরীটেশ্বরীর সেবক, সারাজীবন কায়মনোবাক্যে দেবীর সেবা করেছি। সারাজীবন সত্যকথা বলেছি, সত্যপথে থেকেছি, সত্য আচরণ করেছি, কোনওদিন কারও অনিষ্টচিন্তা করিনি। আয় শয়তান, দেখি আজ আমার বিপদে ব্রহ্মময়ী কার কথা শোনেন, তোর মতো এক ভণ্ড পিশাচ তান্ত্রিকের, নাকি এই অধম সন্তানের।'

সর্দার হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়তে গেল রামনারায়ণের ওপর। কিন্তু তার আগেই কে যেন টেনে ধরল তার পা। হুড়মুড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল সর্দার। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে সে যা দেখল তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না তার।

উঠে বসেছে শশিশেখর। সর্দার ঘাড়ে পড়ার পর ভেষজ বিষের আবেশ কেটে গেছে তার। সে খানিক ব্যোমভোলা হয়ে চারিদিক চেয়ে রইল। মুহূর্তখানিক পর যেন আবিষ্ট হয়েই মশানের মাটি থেকে একমুঠো ধুলো কুড়িয়ে তর্জনী, মধ্যমা আর অনামিকা দিয়ে নিজের কপালে তিনটে সমান্তরাল দাগ টানল শশিশেখর। তারপর সামান্য টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে শান্তস্বরে বলল, 'বুড়ো মানুষের ওপর জোর খাটাচ্ছ সর্দার? যদি

সত্যিকারের পুরুষ মানুষ হও তো একবার আমার সঙ্গে লড়ো দেখি।'

দৌড়তে দৌড়তে থেমে গেলেন ওঁরা। ওই সুঁড়িপথের শেষ। মশালের আলো এখন আরও উজ্জ্বল। আর একটু পথ গেলেই....

ঠিক তখনই তাঁদের সামনে যেন শূন্য থেকে ঘনিয়ে উঠল এক ছায়ামূর্তি। বিশাল তার আকার, জঙ্গলের সবচাইতে বড় গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে সে। আর সে ছায়া কোনও মানুষের অবয়ব নয়। জাটিয়া জাদু দেখামাত্র চিনলেন তাকে। এই সেই মায়ানেউল, যার কথা কৃষ্ণানন্দ বলেছিলেন তাঁকে। সে এবার এসেছে তাদের সংহার করতে।

ধীরে ধীরে সেই ছায়াশরীরীদের দল ঘিরে ধরল ক্ষুদ্র দলটিকে। সঙ্গে যোগ দিল আরও কয়েকটি অন্ধকার অবয়ব। তাঁদের ঘিরে এখন পিশাচের দল। ধক ধক করে জ্বলছে তাদের চোখ। কটু পচা গন্ধে সবার নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে এল প্রায়। আর সেই রক্তকণা শীতল করে দেওয়া অশরীরী শৈত্য।

জাটিয়া জাদু বুঝলেন এই তাঁদের শেষ। যে তান্ত্রিক বন্ধন তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন সবার হাতে, এই মায়ানেউল তাকে ছিন্ন করেছে। তাঁরা আর এই পিশাচদের কাছে অদৃশ্য নন!

কৃষ্ণানন্দ লক্ষ্য করলেন যজ্ঞের আগুন হঠাৎ করেই যেন নিভু নিভু হয়ে এল। অথচ কোথাও কোনও বাতাস নেই, কোনও বিক্ষেপ নেই। কিন্তু আগুন যেন জ্বলতেই চাইছে না। ওপরে তাকালেন কৃষ্ণানন্দ। একটা দুধের সরের মতো মিহি কালো ছায়া নেমে আসছে জমিদারবাড়ির ওপরে। হঠাৎ করেই যেন চারিদিকের তাপমাত্রা কমে গেল অনেকটা। কৃষ্ণানন্দ বুঝলেন তাঁর আসন ভিজে যাচ্ছে। মাটি থেকে উঠে আসছে কনকনে শীতল জল তাঁকে যজ্ঞ করতে দেবে না ওরা।

মন্ত্রোচ্চারণ আরও জোরালো করলেন কৃষ্ণানন্দ। কিছু সমিধ অর্পণ করলেন যজ্ঞাগ্নিতে। উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি করতে লাগলেন, 'রক্তপ্রিয়াশ্চ রক্তাক্ষী রুধিরাস্যবিভূষিতা। বলপ্রিয়া বলরতা বলরাম প্রপূজিতা। অর্ধকেশেশ্বরী কেশা কেশবেশ বিভূষিতা...' বলতে বলতে দুটি রাজগোখরোর করোটি আহুতি দিলেন চিতাযজ্ঞে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। সেই মিহি অন্ধকারের চাদর আরও নেমে এসেছে জমিদারবাড়ির ওপরে। মাটি এত শীতল যে কৃষ্ণানন্দের মনে হল যেন তুষারস্তূপের ওপর বসে আছেন তিনি। যজ্ঞের আগুন একবার ধক করে জ্বলে উঠেই ফের নিভে গেল।

এবার ভয় পেলেন কৃষ্ণানন্দ। তাহলে কি ব্যর্থ হয়ে গেল তাঁর সাধনা? এতগুলো প্রাণ আর রক্ষা করতে পারলেন না তিনি? দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

আর ঠিক তখনই তিনি শব্দটা শুনতে পেলেন। শব্দ, সাপের হিসহিসানি শব্দ। প্রথমে মৃদু, তারপর প্রবল। যেন দুটি প্রবল পরাক্রমশালী নাগরাজ ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন।

মাথা তুলে চোখ বুজলেন কৃষ্ণানন্দ। এসেছেন, অবশেষে তিনি এসেছেন।

স্নান করে শাড়ি পরছিল সর্বমঙ্গলা। তার হাত-পা চলছে যন্ত্রের মতো। কী ভাবছে আর কী দেখছে, কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে, সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে তার। এই পৃথিবী যেন তার চোখের সামনে একবার ঝিরিঝিরি করে আসছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এই তো অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে সেই কুঁড়েঘর। পরক্ষণেই তার সামনে সেই দিগন্তবিস্তৃত শ্মশান। এই তো সে স্নান করছে, আবার পরমুহূর্তেই সেই পাহাড়ের মতো বড় চিতাস্তূপ। কী করছে সে? স্নান করছে না চিতার ওপরে এক পা এক পা করে উঠছে? কোনটা স্বপ্ন, আর কোনটা সত্যি? স্নান করে পুরনো শাড়ি ছেড়ে ও কী পরছে এখন? শাড়ি? কই না তো! এ তো বাঘছাল। না না, এ তো শাড়ি ওই তো তার চারিদিকে বাঘার জঙ্গল। কুঁড়েঘরের ওদিকে সেই মূর্তি, হাড়িকাঠ। কিন্তু... কিন্তু... এ কী! আবার সব দৃশ্য বদলে গেল কী করে? এই তো সে উঠছে ওই বিশাল চিতার ওপরে। তার সাপ জড়ানো পায়ে পায়ে গড়িয়ে যাচ্ছে চিতাকাঠ আর নরঅস্থিমুণ্ড। প্রায় ওপরে উঠে এসেছে সে। তার চারিদিকে দাউদাউ করে জ্বলছে লেলিহান শ্মশানচিতার আগুন। তার মাথার মধ্যে ক্রোধ ক্রমে বাড়ছে। এক অজানিত, অকারণ, অবোধ্য নৃশংস ক্রোধ। সে উঠছে চিতার ওপরে,

আর সেই চিতার ওপর শুয়ে আছে কেউ একজন। কে ও?

অজগরের সামনে যেন সম্মোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হরিণশিশু, ঠিক সেভাবেই মায়ানেউলের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা। চারিদিকে আরও ঘনিয়ে এসেছে ছায়াপিশাচের দল। তাদের বিশ্রী কটু গন্ধ আর মরণশৈত্যে হাত-পা অসাড় হয়ে এসেছে তাঁদের। মাথার মধ্যে সমস্ত বোধবুদ্ধি শূন্য। নিশ্চিত মরণের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েকটি অসহায় মানবশিশু।

ঠিক সেই সময় চোখের কোণ দিয়ে জাটিয়া জাদু দেখলেন আকাশ থেকে একটা নীল রঙের আলো এসে পড়ল একটু দূরে। মাটি সামান্য কেঁপে উঠল কি?

তারপর সেখান থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াল এক অবয়ব। জাটিয়া জাদু অবাক হয়ে দেখলেন এক উঠে দাঁড়িয়েছে এক নারীমূর্তি। তার সমস্ত শরীর নীল। পরনে বাঘছাল, ডান হাতে একটি তরবারি আর বাম হাতে একটি খড়্গ। তার চুল উড়ছে আগুনের শিখার মতো। আর ধক ধক করে জ্বলছে দুটি চোখ।

এক পা এগোল সেই নারী। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিয়ে কে যেন ফেটে পড়ল বিপুল অট্টহাস্যে। সেই শব্দ যেন বধির করে দিল জাটিয়া জাদু আর তাঁর সঙ্গীদের। তারপর সেই নীলবর্ণা নারী মহা হুঙ্কারে ধেয়ে এল ছায়াপিশাচের দলের দিকে।

ঘুরে দাঁড়াল মায়ানেউল। শব্দটা সে একটু আগেই পেয়েছে। চিরশত্রুর এই হিসহিসানির শব্দ তার চেনা, বড় চেনা।

মায়ানেউলের ঠিক সামনে মস্ত ফণা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারই আকারের দুটি বিশাল রাজগোখরো।

শাড়িটা পরে স্থির পায়ে এগোতে লাগল সর্বমঙ্গলা। ওই তো সেই মূর্তি। তার সামনে তিনটে লোক। একজনকে তার চেনা লাগল। আবার সেই দৃশ্য মিলিয়ে গেল তার চোখের সামনে। চিতার ওপরে উঠে এসেছে সে। যতদূর চোখ যায় শুধু আগুন আর আগুন। আর সর্বগ্রাসী হাহাকারের কান্না। তার মাথার ওপর কালনাগিনী জেগে আছে একটি জটার মতো। তার মাথার মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলছে ক্রোধ, অবর্ণনীয়, অসহনীয় ক্রোধ।





যেন তার এই উগ্র ক্রোধই চিতার আগুন হয়ে বিশ্বচরাচরকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

আবার তার সামনে দৃশ্য পালটে গেল। দুটো মানুষ মারামারি করছে আর একজন বয়স্ক মানুষ তাদের সামনে বসে আছে হতবুদ্ধি হয়ে। কে ওরা? এত চেনা লাগে কেন?

শশিশেখরের শরীর থেকে ভেষজ বিষের প্রভাব এখনও যায়নি। কিন্তু হিংস্র রাগও অনেক সময় অসম্ভবকে সম্ভব করায়। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্দারের ওপর।

সর্দার খুব সহজেই প্রতিহত করল তার আক্রমণ। তারপর সেও ঝাঁপিয়ে পড়ল শশিশেখরের ওপর।

সেই দুরন্ত নীলঘূর্ণির আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল ছায়াপিশাচের দল। জাটিয়া জাদু লখাইকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। বাকিরাও দেখাদেখি তাই করল। নীলবর্ণা সেই যোদ্ধৃনারীকে দেখে মনে হল যেন মহাপ্রলয় জেগে উঠেছে জঙ্গলের মধ্যে। জাটিয়া জাদু দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'খড়্গহস্তা মহাদেবী পাতু মাং বিজয়প্রদা। নীলাম্বরধরাদেবী পাতু মাং বিঘ্ননাশিনী...'

ছায়াপিশাচের দলকে ছিন্নবিধ্বস্ত করে স্থির হয়ে দাঁড়াল সেই নারীমূর্তি। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এল জাটিয়া জাদুর দিকে। জাটিয়া জাদু হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন। দুহাত বুকের কাছে। দুচোখে জল। ধরা গলায় মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন, 'ভীমরূপা সদা পাতু শ্মশানে ভয়নাশিনী। ভূতপ্রেতালয়ে ঘোরে দুর্গে মাং ভীষণাবতু...'

নারীটি এসে লখাইয়ের মাথার কাছে দাঁড়ালেন একবার। তাঁকে আসতে দেখে লখাই উঠে বসেছিল। সে নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে শুধু একবার বলল, 'মা?'

নীলবর্ণা নারীমূর্তিটি নীচু হয়ে লখাইয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর একটি নীল বিদ্যুৎশিখা জঙ্গল ফুঁড়ে ফের ফিরে গেল আকাশে।

মায়ানেউলের গলা জড়িয়ে ধরেছে দুটি রাজগোখরো। জঙ্গলের মধ্যে, খোলা আকাশের নীচে ঘটে যাচ্ছে এক আশ্চর্য অলৌকিক লড়াই। নেউল যে কোনও সাপের আক্রমণ রোধ করতে পারে অতি সহজে। কেবল একটি মাত্র সাপ ছাড়া, সর্পকুলের রাজা, রাজগোখরো।

ক্রমেই সেই মায়ানেউলের পরাক্রম স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। তার শরীর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল জঙ্গলের বাতাসে।

সর্দার অতি সহজেই মাটিতে ফেলে দিল শশিশেখরকে। তারপর খড়্গাটা তুলে নিয়ে বলল, 'আয়, তোকে বলি দিয়েই শুরু করি।'

খড়্গা তুলে ধরতে গিয়ে থেমে গেল সর্দার। ও কে? কে হেঁটে আসছে তার দিকে? কে ওই মেয়ে?

সর্দারের দৃষ্টি বিভ্রম হতে লাগল। এ তো সেই মেয়ে নয় যাকে সে তুলে এনেছিল গাঁয়ের পুকুরপাড় থেকে। কে ও? অমন দৃপ্ত পদক্ষেপ কার? এ কী! দ্রোলমা? দেবী দ্রোলমা নেমে এসেছেন এই অরণ্যে? কিন্তু কী করে?

অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল সর্দারের। সে বুঝল এ জন্মে আর সাধনা শেষ হল না তার। গুরুর কথাই ফলে গেল।

সর্দার খড়্গাহাতে মোহগ্রস্ত মানুষের মতো এগিয়ে যেতে লাগল সর্বমঙ্গলার দিকে।

সর্বমঙ্গলা দেখল তার দিকে কে যেন এগিয়ে আসছে। তখন অসহনীয় রাগে ক্রোধে তার সর্বাঙ্গ দাউদাউ করে জ্বলছে। পারলে এই মুহূর্তেই এই জগৎসংসার পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চায় সে। সে দেখল সেই লোকটা তার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে কী একটা যেন দুহাতে তুলে ধরল।

হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাতে দেবী দ্রোলমার খড়্গা তুলে ধরল সর্দার। সর্বমঙ্গলা অতি অনায়াসে খড়্গাটা তুলে নিল। তারপর বাঁ হাতে সর্দারের চুলের মুঠি ধরে কেটে ফেলল সর্দারের মাথাটা।

এই ভয়াল অতিলৌকিক দৃশ্য দেখে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন রামনারায়ণ। অসম্ভব, এ অসম্ভব। এ কি তাঁরই মেয়ে? এমন অনায়াসে

খঙ্গোর এক আঘাতে সর্দারের মাথা কেটে নেওয়ার মতো অলৌকিক শক্তি সে পেল কোথায়?

কিন্তু আর কিছু ভাবার সময় পেলেন না রামনারায়ণ। সভয়ে দেখলেন একহাতে রক্তস্নাত খড়্গ আর অন্য হাতে সর্দারের কাটামুণ্ড নিয়ে তাঁর মেয়ে এবার তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে।

ক্রোধ কমেনি সর্বমঙ্গলার। চিতার ওপর কে একজন শুয়ে ছিল না? কই সে? তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। ওই লোকটাকে তার চাই। সর্বমঙ্গলার সমস্ত অস্তিত্ব, সত্তা, চৈতন্য আগ্রাসী ক্ষুধার মতো চিৎকার করছে ওই লোকটার জন্য। চাই, চাই, চাই। কোথায় সে?

শশিশেখর দেখল সর্বমঙ্গলা খড়্গহাতে ধীর কিন্তু দৃপ্তপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে রামনারায়ণের দিকে। রামনারায়ণ ঠকঠক করে বলির পাঁঠার মতো কাঁপছেন। শশিশেখর দেখেছে একটু আগেই কী অনায়াসে খড়্গের এক আঘাতে সর্দারের মাথা কেটে নিয়েছে ওই একরত্তি মেয়ে। সে বুঝেছে এখন তাকে বলপ্রয়োগে আটকানো যাবে না। কিন্তু এখন তাকে না আটকালে সমূহ বিপদ। কী করবে সে?

অন্য কোনও উপায় মাথায় এল না শশিশেখরের। সে একেবারে সটান সর্বমঙ্গলার পায়ের কাছে গিয়ে শবের মতো শুয়ে পড়ল। পরক্ষণেই সর্বমঙ্গলা তার বাঁ পা'টা তুলে দিল শশিশেখরের বুকে। আর তুলেই স্থির হয়ে গেল।

হঠাৎ করেই মনে হল পৃথিবীর ঘূর্ণন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই বাঘার জঙ্গল, এই গ্রাম, এই আকাশ, এই বিশ্বচরাচর, স্থাবর-জঙ্গম সব চিত্রার্পিতের মতো চেয়ে রইল দৃশ্যটির দিকে। যেন এই মরপৃথিবী এর থেকে পবিত্র, এর থেকে রোমাঞ্চকর আর কিছু দেখেনি।

রামনারায়ণ থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দুহাত জড়ো করে কপালে ঠেকালেন। তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। মা গো, এত সৌভাগ্যও তাঁর কপালে লেখা ছিল? জগজ্জননী মা রাজরাজেশ্বরী স্বয়ং তাঁর কাছে কন্যারূপে ধরা দিলেন?

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল সর্বমঙ্গলা। এ কী! তার হাতে খড়্গ কেন?

নরমুণ্ড কেন? তার শরীর জুড়ে এত রক্ত কেন? এ কার বুকে পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে?

সর্বমঙ্গলা পড়েই যেত, যদি না জঙ্গলের আড়াল থেকে জাটিয়া জাদু দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলতেন।

* * *

প্রতাপনারায়ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'এই অসম্ভব সম্ভব হল কী করে মৈত্রমশাই?'

মৈত্রমশাই রাত্রিভর যজ্ঞশেষে স্নান করেছেন। কপালে ধারণ করেছেন যজ্ঞাগ্নির টিকা। ভারী শান্ত আর প্রসন্ন দেখাচ্ছিল তাঁকে।

ভোর হওয়ার আগেই ফিরে এসেছিলেন ওঁরা। সঙ্গে অপহৃতদের দল আর চুরি যাওয়া সমস্ত সোনা। সর্দারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছিল তার সমস্ত জাদুকৌশল। কৃষ্ণজম্ভলের সোনার মূর্তি ভেঙে গেছিল, সমস্ত সোনা ফিরে পেয়েছিল তাদের আগের রূপ।

সেই সব সোনার গহনা, মোহর সব আলাদা করে রাখা আছে কাছারিবাড়িতে। আজ সবাইকে তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্রতাপনারায়ণের লোক বেরিয়ে পড়েছে গ্রামে গ্রামে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিতে।

অচৈতন্য সর্বমঙ্গলাকে এনে তোলা হয়েছে জমিদারবাড়িতেই। স্বয়ং জমিদারগৃহিণী তার শুশ্রূষার ভার নিয়েছেন। ছুটে এসেছেন হরসুন্দরীও।

কৃষ্ণানন্দ বললেন, 'সর্দার একটি মস্ত ভুল করেছিল। সে তন্ত্রজ্ঞ ছিল, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ ছিল না। তন্ত্র শুধু কর্মমার্গ নয়, জ্ঞানমার্গেরও পথ বটে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে বলে দেবী বজ্রতারা অসমা মর্যাদাবতী। তাঁকে মা ছাড়া অন্য কোনও দৃষ্টিতে দেখার স্বীকৃতি নেই। বৌদ্ধ পণ্ডিত তারনাথের পুঁথিতে আছে, জনৈকা 'তারা' নাম্নী রাজকন্যা কোনও বৌদ্ধ সাধককে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। তবে নিজের নাম গোপন করে। কারণ রাজকন্যা জানতেন তাঁর নাম 'তারা' জানলে তাঁর স্বামী তাঁর কাছে থাকবেন না। তাঁর ভয়ই সত্যি হল। একদিন সেই সাধক রাজকন্যার আসল নাম জেনে ফেললেন এবং সংসার ত্যাগ করলেন। তারার মর্যাদা

এতখানিই, তাঁর নামে পত্নীর নাম মানতে পারেননি সেই সাধক। যদি ভুলক্রমে দেবীর প্রতি কামচিত্ত উৎপন্ন হয় তো সর্বনাশ।

সর্দার এই ভুলটিই করেছিল। সে দেবী বজ্রতারাকে কামদৃষ্টিতে দেখেছিল। তাই দেবী তারা মা সর্বমঙ্গলার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে সর্দারের জীবনপাশ ছিন্ন করলেন।'

রামনারায়ণ উদ্বিগ্ন হলেন, 'তাহলে কি আমার মেয়ের বিয়ে হবে না মৈত্রমশাই?'

কৃষ্ণানন্দ বললেন, 'অবশ্যই হবে ঠাকুরমশাই। মা তারা তাঁর কর্ম সমাধা করে নিজেকে সংবৃত করেছেন। আপনার মেয়ে ঈশ্বরকোটির জাতিকা, তাই মা আপনার মেয়েকেই বেছে নিয়েছিলেন প্রকটিত হওয়ার জন্য। তবে আর ভয় নেই, মা নিজের লীলা সংবরণ করেছেন। আপনার মেয়ের এখন সাধারণ জীবনে ফিরে যেতে আর বাধা নেই।'

হরিসাধন বন্দ্যঘটী তাঁর আনা সমস্ত সোনা প্রতাপনারায়ণের হাতে সমর্পণ করেছেন। এই অভিশপ্ত সোনা তাঁর চাই না। নিজের ছেলেকে ফিরে পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা। তিনি হাতজোড় করে রামনারায়ণকে বললেন, 'মিশ্রমশাই, আপনার মেয়ের সঙ্গে শশিশেখরের বিয়ের কথা হতে হতেও হয়নি, সে আমারই দোষ। অর্থের লোভে আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম। মা কাল রাতে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছেন। অনুমতি দিন, মা লক্ষ্মীকে আমি ঘরে নিয়ে যাই।'

প্রতাপনারায়ণ সহাস্যে বললেন, 'সে তো বটেই। তবে অত সহজে কি আর মা'কে ঘরে নিয়ে যাওয়া যায় বন্দ্যঘটীমশাই। আমার কন্যাসন্তান নেই। থাকলে তার বিয়েতে যা ধুমধাম হত, মা সর্বমঙ্গলার বিয়েতে তার থেকে কম উৎসব হবে না। আর যৌতুকের কথাই যখন উল্লেখ করলেন, তখন বলি আমাকে দান করা আপনার সমস্ত সোনার গহনা আমি মা সর্বমঙ্গলাকে দিলাম তার স্ত্রীধন হিসেবে। এ যৌতুক পণ্ডিত রামনারায়ণ মিশ্র নয়, আমি, চণ্ডীপুরের জমিদার প্রতাপনারায়ণ চৌধুরী দিচ্ছি।'

বারুণী নদীর শুকনো বুক ধরে হাঁটছিল দুটো শরীর। এক সন্ন্যাসী এবং

আর এক শিশু। একদিকে বাঘার জঙ্গল, আরেকদিকে চণ্ডীপুর গ্রাম। সকালের শীতল বাতাস জুড়িয়ে দিচ্ছিল তাঁদের শরীর।

লখাইয়ের আজ ভারী আনন্দ। সবাই তাকে ভালো ভালো কথা বলছে। তার কত প্রশংসা করছে। জমিদারমশাই স্বয়ং বলেছেন এবার থেকে লখাইয়ের খাওয়া-পরা সব কিছুর দায়িত্ব জমিদারবাড়ির।

লখাই একটা ঢিল কুড়িয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল। তারপর ডাকল, 'সন্ন্যাসীঠাকুর।'

'বল লখাই।'

'একটা কথা বলব?'

'একটা কেন, হাজারটা বল।'

'তুমি আমাকে তন্তর মন্তর শেখাবে।'

'কেন লখাই, কী করবি শিখে?'

'তোমরা তো তন্তর মন্তর জাদু টোনা করে কত্ত বড় বড় কাজ করলে। আমি যদি খুব মন দিয়ে শিখি, তাহলে মা'কে ফিরিয়ে আনতে পারব না?'

জাটিয়া জাদু লখাইয়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওরে পাগল, স্বয়ং মহামায়া তোর মায়ের রূপ ধরে তোকে আশীর্বাদ করে গেছেন। এ কী কম কথা বাপ আমার? আমরা এতদিন ধরে শত তন্ত্রমন্ত্র পূজাপাঠ করে যা পাইনি, তা তুই অনায়াসে পেয়েছিস বাপধন, স্বয়ং জগজ্জনীর অহৈতুকী ভালোবাসা। জেনে রাখিস লখাই, এই আমি বলে দিলাম। এত তন্ত্রমন্ত্র পূজাপাঠ এসব করে আমি একটা কথাই লিখেছি, একমাত্র ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড় তন্ত্র, সবচেয়ে বড় জাদু।'



ISBN 978-81-19068-39-5